

সিঁজোফ্রেনিক

ভানু ভাস্কর

সিজোফ্রেনিক

ভানু ভাস্কর

স্বত্ব

ইকরা ইমতেহান (আলভা)

প্রথম প্রকাশ

২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

প্রকাশক

ভানু ভাস্কর

প্রচ্ছদ

ভানু ভাস্কর

মূল্য

১২৩ টাকা

Schizophrenic. A book of prose penned and brought out by **Vanu Vaskor**. Published in September 2018. Price: BDT 123 (INR 111). Contact e-mail ID: vanu.vaskor@gmail.com
Mobile No.: +88 01712 730 735.

আমি যখন এই বইয়ের অসংখ্য ট্রাটি-চ্যুতি-বিচ্যুতির টুটি চেপে ধরেছি, যখন আমার পতঙ্গের চেয়েও ক্ষুদ্রতাকে অহমের চাদর থেকে খুলতে চেয়েছি, অতপর তাদেরকে আহলাদ দিয়ে বাড়তে দিয়েছি, অতপর যখন আমার অতি সাধারণ এবং অতি অবিন্যস্ত জ্ঞানকে সজ্জবদ্ধ শব্দের চাদরে মুড়িয়ে দিয়েছি, তখন এই বইটিকে আমার উতসর্গ করতে ইচ্ছে হলো।

আমি একটি বদ্ধ উন্মাদচিন্তাজাত বই যার করকমলে পেশ করে আমার সিমাহিন তুচ্ছতা থেকে এতটুকু পরিদ্রান পেতে চাই, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সৈয়দ সামছুর রহমান, আমার অপার শ্রদ্ধেয় হেডসার। আমি শৃঙ্খলমুক্ত বাঘ দেখিনি, আমি হেডসারকে দেখেছি, আমার বাঘ দেখা হয়েছে, আমার বাঘ দেখার সাধ মিটেছে। তিনি আমাকে বিশৃঙ্খল জগতকে সুনিয়ন্ত্রিত করার শিক্ষা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ এই শিক্ষাব্রতি মানুষটিকে সম্মানিত করুন।

তিনি অনেক দূরে থাকেন আজ, তবু কাছে, অতএব তার কাছে এবং সুধিজনের মধ্যে যারা সত্যিকারের বিবেচক বলে পরিগণিত, তাদের সবার কাছে ক্ষমা চাওয়া হলো আমার অতিক্ষুদ্র এবং অপরিমাপজোগ্য জ্ঞানের পুজি, আর আমার সব কিছুতেই চরমতম অক্ষমতার দায় আমার একান্ত নিজের বলে মেনে নেয়ার মধ্যেই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর কাছে আমার মুক্তির একমাত্র পথ।

/*হেডস্যার হলেন আমার জীবনে দেখা একমাত্র খাচামুক্ত বাঘ। অন্য সবার প্রতি আদপেও তিনি তা অথচ আমার প্রতি সর্বদা স্নেহাসক্ত, দয়াদ্র। আমি তার বাইসাইকেলে উঠতে পারার মত একেবারেই অজোগ্য তবে সম্ভবত একমাত্র অধিকারি।*/

//আমি এই পৃষ্ঠার লেখার ঢঙ চুরি করার জন্য ইবনে খালদুনের বিচারালয়ের কাঠগড়ায় উঠতে পারবো না। কিন্তু স্বিকার করছি যে আমার ওঠা উচিত। ধরা খাওয়ার আগে চৌর্যবৃত্তি বড় বিদ্যা, কিন্তু নিজে ধরা দিলেও কি তার বিচার হবে না? আমার হওয়া উচিত। কারন আমি ইবনে খালদুনের ঢঙ চুরি করেছি। এটা মধ্যপ্রাচ্যীয় ঢঙও বটে। ফলে আমার বারবার বিচার হওয়া উচিত।//

রোগকথন

ভূমিকম্প হয়ে যাওয়ার আগেই ভূমিকা লেখা উচিত। ভূমিকম্প আসছে, ভূমিকম্প আসবে, চারিদিকে তার ইশারা, তাই যত তাড়াতাড়ি লেখা যায় ততই মঙ্গল। ভূমিকম্পের সিগনালে সিল-গালা আটা, তাই এই সতর্কতা। নইলে এই বইয়ের ভূমি অর্থাৎ জমিন অর্থাৎ পৃষ্ঠাগুলো গলিত ও পচিত, অর্থাৎ প্রত্যাখ্যাত হবে। কিন্তু ভূমিকা করার এত কি প্রয়োজন, কিছু একটা লিখলেই তো হয়! কিন্তু যা বলার তা যদি সহজ করে বলা যেতো তবে বলতে পারতাম যে আমি সুস্থ। যা কিছু সহজ, অসুস্থের জন্য তা নয়। এ কথা যেদিন বুঝতে পেরেছি ঠিক সেদিন থেকেই রোগটা জেকে বসেছে। তাই কি লিখতে কি লিখেছি সেটা পরিতাজ্য হলেও দায় এড়াবার পথ রয়েছে এর মধ্যেই। রোগির জন্য সাত খুন না হলেও এক খুন তো মাফ হবে! বাঘা বাঘা চোরের জন্য সাত খুন মাফ, আম আদমির জন্য এক খুন হলেই পোয়া বারো। হারামজাদা রিক্সাওয়ালা ভাড়া যাতে বেশি নিয়ে একদিন আশরাফ-ব্রাহ্মন-অভিজাত-কুলিন অর্থাৎ সমাজের উচুমহলের কাতারে উঠে যেতে না পারে তার জন্য মোড়ে মোড়ে ভাড়া টাঙিয়ে দেয়া হলে বেটা বেদপ কচু শাকের বদলে যে একটু পুচ্ছ পচা পুটি মাছ খাচ্ছিলো, তার আর উপায় থাকলো না বলে আবার যেটুকু খুজতে বউ আর মেয়েটাকে বিলে-খানায় দৌড়তে হলো, কিন্তু বাঘা চোরেরা রাস্তায় বুক ফুলায়ে শা করে গাড়ি নিয়ে চলে গেলো, মঞ্চ দাড়িয়ে বড়ো বড়ো করে কথা বললো, আর ভক্তের সে কি হাততালি! এই দেখে রোগ আমার বেড়ে যাবে বুঝতে পেরে চোখ বন্ধ করে থাকি। কিন্তু রোগ তবুও কাথার তল দিয়ে উকি মেরে বলে ‘ওরে আমি অরিন্দম হইবো, আমারে বাহির করো!’ আমি বলি, আনো খড়গ। কিন্তু ওই অবধিই। আমি বুঝতে পারি, বাঙালি ওই কাথার তল দিয়ে মাথা বের করে এতটুকু অবধিই আসতে পেরেছে। নইলে যাহা বলিবার তাহা বলিনাই কেন, যাহা করিবার তাহা করিনাই কেন, যাহা পারিবার তাহা পারিনাই কেন?

এতগুলো ‘কেন’ এর উত্তর দিতে গেলে বাঙালির আরও কয়েক শতাব্দি পার করতে হবে এটা দিব্যি বুঝতে পারছি। পরিবর্তনের অঙ্গিকার নিয়ে যুদ্ধটা বাধিয়েছিলাম বলে ‘দেশ দেশ’ করতে পারছি দেশকে শিকেয় তুলে, তাও আমাদের লজ্জা হয় না বলেই ধরে নিচ্ছি আমরা বাঙালি জাতি বলেই সয়ে নিয়েছি সব। আমাদের ধর্ম আছে, দেশ আছে, অতিভক্তি আছে, চৌর্যবৃত্তি আছে, নস্টামি আছে, অভাব আছে, ক্ষুধা আছে, এই অনেকগুলো ‘আছে’ - এর মধ্যে একটা জিনিস শুধু নেই, সে হলো পরিবর্তন, আর আমার আছে রোগ। কি জানি এ সব এই রোগের খেসারতই কি না! কি দেখতে আমি কি দেখেছি কি জানি! তখন মঞ্চ থেকে বানি ভেসে আসছে, বলছে, ‘সব ঠিক আছে! তবে তোমার দেখাও যা না দেখলেও তাই, কি আর করবে, দেখতে থাকো!’ আমি দেখতে থাকি। আমি ইচ্ছে করেছিলাম একটা বড়ো গল্প লিখবো। কিন্তু ও আমার দ্বারা হবেনা সে বুঝতে পেরেই দির্ঘযাত্রায় ইতি টেনেছি। আমি যা দেখি তা দৃশ্যমান অর্থে সঠিক নয়, যা লিখি তা বেকরনে, অর্থে, ভাবে এবঙ আরও অনেক কিছুতেই গ্রহণীয় নয়, যা বলি তা সমাজ ছাড়া অর্থাৎ বিতাড়িত। তুমি বড্ড পেচাও মিয়া, এই জন্য তো লেখা চলে না! আমি বলি, লেখার কি পা আছে যে চলবে, নাকি চাকা আছে যে ঘুরবে, ঘুরে ঘুরে চলবে? তুমি যে পেচাও তা বুঝতে পারছো? আমি আবার বললাম যে, ইন্ডোরেজতোষন কিম্বা পশ্চিমতোসন করিলেই ভদ্র, আর বিপরিতে খাড়া হইলেই বেদপ আর টেরিস্ট, আর আমি লিখিলেই

‘রাগিড ক্লোড’ অর্থাৎ তেনা! এ তো এক মহা কনসেপ্ট! কিন্তু আমি বুঝিয়া শুনিয়াই মান্না দে’র গানখানি গাহিয়াছি – আমি তোমারই দিকটা নিলাম। জীবন নিলাম হয়ে যায় যাক, লেখা তেনা তেনা হয়ে যায় যাক, কিন্তু ওই বেয়াদবদের পক্ষই আমার পক্ষ। যারা খাড়া হতে জানে। যারা প্রতিবাদের অর্থ জানে। নিরপেক্ষরা মিথ্যেবাদি, আমি তাই জোর দিয়ে বলছি যে আমিও পক্ষ পাইলাম! ভু-ভারতে প্রথম বেয়াদবিটা শিখিয়েছিলেন ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। উপমহাদেশে শেষ বেয়াদবিটা করিলেন নজরুল। এরা যখন একা একাই সমাজের বিপক্ষে দাড়িয়ে গেলেন অন্য সকলে তখন নেঙটি খাড়া করিয়া তোষন করিতে ছুটিয়াছিলেন। গোলামি করতে না চাইলে মনিবেরা ‘মন দিলানা দিলানা’ বলিয়া প্রানধন কাড়িয়া লইতে আসিবে, আর এর প্রতিরক্ষা করিতে গেলেই বেয়াদব! টেরিস্ট! কি অদ্ভুত বেপার!

কি কহিতে কি কহিয়াছি, আর যে এত গুরুচন্দালি করিতেছি, তা কিন্তু ইচ্ছে করিয়া-ই! আমাদের জীবন-মরন তো সব খিচুড়ি হয়ে গেছে, বাক্যে গুরুচন্দালি তাই একটু আসিলে আসুক! কিন্তু এখন আর এই মৃত্যুময় দানবীয় সত্তার বেপারে কথা নয়, এরা নিশ্চয় আজ ও আগামির ইতিহাসে প্রত্যাখ্যাত হবে। এবণ্ড সেটা হবে মানুষের, জনমানুষের বিজয়ের সুত্র উল্লাসে। শুধু প্রার্থনা করি, হে জীবন ততদিন অপেক্ষা করো। আমি শুধু ডাক দিয়ে আগামির সন্তানদের বলে যেতে পারি, শুনে রাখো হে আজ ও আগামির সন্তানেরা, এই ক্ষুধাময় দ্রাবিড়ের ব-দিপের ইতিহাস শোনো। আরও শুনে রাখো, তোমাদের ধিক্কার হতে যদি নামদার শোষকেরা রক্ষা পায়, তবে তুমি আর তোমরাও একদিন মুছে যাবে নস্টোদের মত। তোমাদের হাতে যেনো জলে দিপ আগুনের লেলিহান শিখা, খরতাপ রুদ্ধের বৈশাখি ঝড়ে যদি তুমি পরিবেই হত জয়টিকা, তবে ইতিহাস তোমারই। আমার এই মাতাল লেখার মত রোগাগ্রস্ত হবে না তখন তোমার সমস্ত কীর্তি, বরঙ তা জলে উঠবে সবাইকে আশার আলো দেখানোর প্রচণ্ড প্রত্যয়ে। আমি জীবনকে আবার বলিলাম, ততদিন অপেক্ষা করো হে জীবন।

এই ভূমিকায় যা লিখেছি তার সঙ্গে পরবর্তি লেখাগুলোর কোনও মিল যদি খুজে পাওয়া গেলে তবে সে পাঠকের জ্ঞান-গম্মি। না পেলে আমার রোগটার জয়। সাদা শান্তির প্রতিক হয়ে দেখা যায়, সে আকাশে ওড়ে কবুতর রূপে। কিন্তু আবার সাদা রঙের কাফনে মোড়া ভুতেরা ঠিক এর বিপরিত, অর্থাৎ বাশতলার অন্ধকারে কি যেনো সাদা সাদা দেখা জিনিসেরা অন্তরের অশান্তির অনেক অনেক কারন। শুধু কি তাই? কাফনে জড়ানো কল্পনার সাদা ভুতটা ঘাড়েও চাপে, গলাও টেপে। সেই টেপাটিপিতে মৃত্যুও হয় কারও কারও! তার মানে কল্পনার সাদা রঙের ভুতটা দস্তুরমত কাল্পনিক ও পরাক্রম হলেও কার্যক্রমে বাস্তব! কল্পনা কত শক্তিশালি বোঝা গেলো। কিন্তু বিভ্রান্তিটা রঙ নিয়ে। একে সাদা তো কোনও রঙই নয় তাই আবার শান্তি ও অশান্তি, এই দুটো রূপের রূপক হিসেবে স্বয়ং আবির্ভূত! তাই অন্ধকার রাতের কল্পনার ভুতের গায়ে সাদা কাফন চড়ালে বিষয়ের দৃশ্যটা কেন যে এতো গা-শিরশির করা হয়ে ওঠে, আর সাদাও হয়ে ওঠে কলঙ্কময়, যা প্রমানিতও বটে, বিভ্রান্তিটা এখানেই। রোগে ভোগা শব্দেরা নিষিক্ত হয়ে যদি আরও একটু কলঙ্কময় হয় তবে কি তা খুব বেশি হয়ে যায়?

ভানু ভাস্কর

২৯ মে ২০১৬, থাইল্যান্ড

আবার,

দির্ঘ-ই কার দিয়ে টান দিয়ে বাঙলায় ক'জন কথা বলেন? তাহলে এর প্রয়োজন কি? দিলাম তুলে। এ এখন বিশ্রাম ঘরে। দির্ঘ-উ কারের বেলায়ও ওই একই বাত। ঋ-কে তুলে দেয়া যেতো, কিন্তু ঋ-কার নিয়ে হয়ত আরও কিছু দিন ভাবতে হবে আমাদের। তাই ঋ এই বইয়ের এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবে হয়ত। না বেড়ালে তো হলোই। ঐ - এর বেলায়ও একই কথা। মাঝে মাঝে একে সম্মাননা দিতে হচ্ছে। যেমন, 'ঐকিক/ঐহিক/ঐতিহাসিক' ইত্যাদি। এদেরকে 'ওইকিক/ওইহিক/ওইতিহাসিক' - এভাবে লিখলে চোখের দারুন অসুবিধা হচ্ছে। তাই এই সিদ্ধান্ত। সময় চাই আরও হে প্রিয় বাঙলা ভাষা। ও এর বিধান এই একই সূত্র মেনে চলবে আরও কিছুদিন।

'ইয়ো' অর্থাৎ 'ঐ' মিয়া ভেগেছে। মিয়া ভাগেনি। এটা কিন্তু প্রপঞ্চ!

মুর্ধন্যতে যে 'স' উচ্চারণ করি আমরা, তার সঙ্গে 'ঠ' এর যোগ হলে যে যুক্তবর্ণ তৈরি হয়, তাকে পরিশীলিত করতে গিয়ে বিস্তর ধাক্কা সহ্য করতে হচ্ছে, হজম করতে হচ্ছে। কারন, তাকে বাদ দিয়ে দন্ত 'স'-কে নিয়ে 'ঠ'-এর মিলন ঘটানো যাচ্ছে না। পেথম পেথম অবশ্য এই ধাক্কা সহ্য কইরে নিতি হবে। এই বইতে মুর্ধন্য তে যে 'ন' উচ্চারণ করি, তাকে বিদেয় কইরে দিছি, তাকে বলেছি - ভাই, বহুকাল বাঙলারে সেবা দিলে, এখন একটু বিশ্রাম লও। বিশ্রাম দেবার ইচ্ছে ওই একই অঙ্গ থেকে উচ্চারিত 'স' কেও। তালব্য 'স' এর ক্ষেত্রেও বাঙলায় আলাদা কোনও উচ্চারণ নেই। আমরা সবগুলো 'স' এর উচ্চারণই দন্ত 'স' এর মত করি। কিন্তু সব বেটারে এহনই ঘোটি ধইরে বিদায় কইরে দিলি যদি সব বেটারা এক সঙ্গে ক্ষেইপে ওঠে? তাই এই সাবধানতা।

বাঙলাতে 'য' এর আলাদা উচ্চারণ নেই। 'য' ও 'জ'-কে আমরা একই কেতায় উচ্চারণ করি। হিন্দিতে যুবরাজ শব্দকে ইউবরাজ উচ্চারণ করে তারা 'য' - এর মান রেখেছে। বাঙলায়ও এমন করতে হলে কেউ না কেউ ঠেঙিয়ে সোজা করে দেবে যেমন, ইউবোলীগ বা ইউবোদল ইত্যাদি। অর্থাৎ 'য' এর সঙ্কটজাত উচ্চারণের প্রতি অবিচার যখন করছিই আমরা, তাহলে তাকে রেখেছি কেন? কিন্তু আপাতত বাদ দেয়াও কঠিন। কারন বাঙলায় 'য'-ফলার ব্যবহার প্রচুর। মানে কতা, একে এখনই বিশ্রাম নিতে বলা নিতান্ত অপরাধ। অনুস্বারকে চিরমুক্ত দেবো যখন ভাবছি, তখন মনের মধ্যে মেলা জায়গায় তাকে উঠিয়ে দিয়ে 'ঙ' - কে বসিয়ে দেখলাম যে, চোখে খুব ধন্ধ লাগে। তা পেথম পেথম এরাম সবারই লাগে, সব কিছুতেই লাগে।

পাতলুন-জুতো-টাই পরা মানুষেরা হজের পোষাক পরলে কিছু মুহূর্তের জন্য অস্বস্তি লাগে। মন্দিরের পুরোত কিঙবা মসজিদের হুজুরকে পাতলুন-টাই-কোট মায় মুন্ডুতে হ্যাট আর একজোড়া বকলেসওয়ালা জুতো পরিয়ে হাটিয়ে দিন। কেমন লাগে দেখতে? সয়ে যায়, কালে সবই সয়ে যায়। বাঙলার নিজস্বতাও একদিন এমন করে সয়ে যাবে।

সুচিপত্র

আ ডেডলি লেটার
আ লেটার টু আন আমোরাস
এনফেন
কচুরিপানা
গানে মোর ইন্দ্রধনু
ডগলফ
ডায়েরি অব আ সিজোফ্রেনিক
তুতুর মৃত্যু
দির্ঘযাত্রা
দ্যাট হুইচ ক্যান হ্যাপেন শ্যাল হ্যাপেন
নৈতিকতা
ফানুস
মদ্য মম ভয়সায় ওঙ... নমো!
যেমন ইচ্ছের সাত
স্বপ্নের জ্যা- শব্দ
সিজোফ্রেনিক
সুতার বিলের উপাখ্যান

সিজোফ্রেনিক

(বিকেল ৪ টা ১৯ মিনিট, ৮/১০/২০১৫)

খুদা *পলিগ্যামি* জায়েজ করেছেন। *কনজুমারিজম* নামের ইশ্বর জেকে বসেছে যেই, কনজুমারদের আখের তখন পকেটের পেট কত মোটা তার উপরে চলে গেছে। অর্থাৎ খাবার নির্বাচনে মানুষ ক্ষমতাভেদে এখন স্বাধীন। উতকৃষ্ট খাবারের গন্ধ চেনে মানুষ। অপকৃষ্টতা পশুর জন্য কোনও বেপার নয়। অবশ্য অপকৃষ্ট খাবার থেকে খুটে খুটে যদি জুটে যায় এক-আধ বেলা, বাঙালি ভাবে, মন্দ কি! বুটি কুড়াতে দিন বাঙালিকে, দেখবেন মনে হবে এরা বুঝি হাজার বছর না খেয়ে ছিলো। সেদিন সিঙ্গাপুরের এক মসজিদে এক ইমানদার মুসল্লি কয়েক বস্তা আপেল দিয়ে গেলেন। *সাদাকায়* সোয়াব মিলে প্রচুর, দুনিয়ার বেবসায়ও লক্ষ্মির বর অর্থাৎ লাভালাভে যে অনেক কড়ি মেলেনা তাও কিন্তু নয়, অর্থাৎ খুদা একবার সন্তুষ্ট হয়ে গেলেই তো কেব্লাফতে! এই মসজিদে চাইনিজ, মালয়, পাকিস্তানি, ভারতীয় এবং বিশেষ করে বাঙলাদেশি মুসল্লিরা নামাজ আদায় করে থাকেন। দুনিয়ার সাম্যের একমাত্র দিন ইসলামে উচু নিচুর কোনও স্থান নেই, পাত্তা নেই। তবে কিতাবটা না বুঝে যতকিঞ্চিৎ পড়া, আর বাকিটা শিকেয় তুলে রাখার ফলে ভেদজ্ঞানটা যে জন্মাবে তার কোনও লক্ষন বিচার করা গেলো না। অতএব দানের আপেলে যে সবার ভাগ আছে এটা পবিত্র ধর্মগ্রন্থের বিধান, কিন্তু বাঙালি মুসল্লির আচারে এমন কোনও দৃশ্য অনুচিত-এটাই যেনো যুগ যুগের নিদান। ক'জন সহস্র বছরের মুখ বুঝুক্ষু, গবেট, হা'ঘরে বাঙালি এমনভাবে সেই আপেলের উপরে ঝাপিয়ে পড়লো দেখে মনে হয় এই বুঝি আদি মানব আদমের আপেল - নিষিদ্ধে ঝোক পূর্ণ! আদম এক আপেল খেয়েই অনুতাপে কেন্দ্রে জারেজার, বাঙালি মুসলিমের কপালে যে কি আছে! মসজিদে স্বজাতির অন্যান্য ভায়ের অধিকার কেড়ে নেয়া ক'জন বাঙালি মুসল্লির হাতে যে দুই-তিনটা পলিথিনের বেগ পূর্ণ হওয়া 'সাদাকা'র আপেল, তার সম্পর্কে বিধান কি? এ অন্ধ সাধারণ ঐকিক নিয়মে সমাধান করা সম্ভব নয়। খালেদ হোসেইনি নামের একজন আফগান-আমেরিকান লেখক তার বিখ্যাত *দ্য কাইট রানার* বইতে লিখেছেন, চৌর্যবৃত্তি হলো সব পাপের আধার, অন্য পাপেরা চৌর্যবৃত্তিরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। তিনি আরও বললেন, কেউ যখন কাউকে খুন করে, সে আসলে পৃথিবী থেকে একটা জীবন চুরি করে, চুরি করে কারও বাবার অথবা মায়ের কাছ থেকে তার সন্তানের জীবন, কিম্বা স্বামির কাছ থেকে তার স্ত্রীর জীবন, সন্তানের কাছ থেকে তার বাবা বা মায়ের জীবন, কিম্বা এ রকম আরও শতশত সাম্পর্কিক উদাহরন। কেউ যখন একটা মিথ্যে বলে, সে আসলে কারও কাছ থেকে সত্যের উপর তার অধিকারটা চুরি করে নেয়। ভাবছি বাঙালি এই মুসল্লিদের কথা। বুটি কুড়ানোরও নিয়ম-কানুন আছে। সে কানুন পবিত্র কিতাবে লেখা থাকলেও কিম্বা না থাকলেও নিজের বিবেকের পাতায় অবশ্যই লিখে দেয়া আছে। বুটির সামানা, সে যা-ই হোক, হোক সে যুদ্ধের মাল, কিম্বা মসজিদে *সাদাকার* আপেল কিম্বা শুভ বিবাহের জন্য নারি।

অতএব ওই *পলিগ্যামি* খবর রটে যেতেই দিকে দিকে জেনে জেনে মনো-দৈহিক রসায়নের অতৃপ্তি তখন ক্ষুরধার। বৈদ্যের টনিকের মত। অবশ্য ইউরোপ আমেরিকার অনেকের ভোগের পেয়ালায় গড়ে ত্রিশ চল্লিশজন এমন কি একশো জনের নাম ও জল যোগ হলেও তা তেমন কোনও মহাভারত অশুদ্ধ হওয়ার বেপার নয়। মাসলম্যান অর্থাৎ ততপর মুসলমানেরা দু-চারটা বিয়ে করলেই কেব্লাফতে! *হার্ড* পত্রিকা কিম্বা *ইন্টারনেটের সফট* ভার্শনের ভার্চুয়াল কাগজগুলো বাজিমাতে! আবার *ভোগ* শব্দেও জালা আছে বিস্তর। জালাতে আসবেন মানবাধিকার সঙ্স্থার অতি স্মার্ট *মিস* - রা। এই শব্দের মধ্যে গোড়ামির গন্ধ আছে। দাবি তাদের। ভুক্ত হও, অপরাধ মালুম মে আনতা নেহি, লেकिन, শব্দোচ্চারণ করো'না খবরদার, হাই কোর্ট দেখিয়ে ছাড়বো! কানারে অবশ্য হাইকোর্ট দেখালে কি,

বা না দেখালে! আর যার দু'কান খোয়া গেছে তার ডান কি আর বাম কি! পৃথিবিতে ডান আর বাম এখন মিলেমিশে একাকার। সবাই ভোগের পেয়ালা উপচে পড়ার আগেই চাটছে, চেটে চেটে নিজের অন্তরের উগরে ওঠা খায়েসকে উপচে ফেলছে। জগতে আসহাবুল মাশয়ামা আর আসহাবুল মায়মানা এখন তাই তান্ত্রিক কিছু নাম শুধু, পরজগতেই শুধু বাম ডান মুখ্য হয়ে উঠবে। ধর্ম বলছে, পরজগত কাছেই, আমরা বলছি দূরে, এ ত দেখি জালা! তাই ভোগের উপায় আছে জালা জুড়াতে।

বেশভুষা আর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও মুসলিমের অনেক হ্যাপা রয়েছে। যেমন দাড়ি। দাড়ি যদি দেখতে ছাগলের দাড়ির মত হয়, আর তিনি যদি মুসলিম হন, তবে কিন্তু তার কপালে শনি! বৃহস্পতি শুধু যিনি এ বিষয়ে লিখবেন তার। সেবার (কোনবার সেটা জানিনা) দেশের নামকরা একজন লেখক, শুধু লেখক বললে তার মর্যাদাকে বিলকুল খাটো করে দেখানো হয়, বিরাট জ্ঞানিগুণ ও শ্রদ্ধাভাজন, বিশেষ করে উঠতি বয়সিদের কাছে তিনি সুপার্বম্যান! ইনি তার ভক্তরা যে'রম হয় আর কি, অর্থাৎ উঠতি বয়সি, সেই বয়সি একটি চরিত্র সৃষ্টি করে তাকে দিয়ে তার বাপের ছাগলের মত দাড়ির বর্ণনা দেয়ালেন। ফলাফল, হিট এবঙ বেস্টসেলার একটি বই পেলো তার ভক্তকুল – তরুণ পাঠকেরা। কে যেনো কবে বলেছেন, ইনি এক চিমটি দেশপ্রেমের সঙ্গে দুই চামচ মুক্তিযুদ্ধ যোগ করে দেন বলে আদা চা-টা মারাত্মক ভোগ্য হয়ে ওঠে। চাটতে এবঙ চাটা খেতে খেতে অভ্যেস হয়ে গেলে বাঙালির যা হয় আর কি।

আমি বেস্টসেলার পড়িনা। তাতে অবশ্য বাজারের কিস্যু এসে যায় না। আমার মত আম ও নিচু স্তরের পাঠকের বাজার কিছু না কইরে! সে যাক, বেস্টসেলারকে আমার সাম্রাজ্যবাদি খাবার মনে হয়। এখন মোড়কে পুরা খাবার খাওয়ার যুগ, ঘরে বসে পরিবারের সঙ্গে একসঙ্গে খেতে খেতে মনে হয় ঝি ধরে গেছে, তাই নতুন পদ্ধতি এসেছে। আমি তবু ঘরে খেতে পছন্দ করি, আর পুরোনো বইয়ের দোকানে গিয়ে তলা থেকে বই খুজি। তলানিতে পড়ে যাওয়া মানুষের এর চেয়ে আর কি করার আছে? কিন্তু আমি আরও একটা কাজ করি। সেটা গনতান্ত্রিক দেশে বসেও করার উপায় আছে। এমনকি একনায়কের দেশে বসেও। কিন্তু খবরদার সেটা প্রকাশ করতে যাবেন না। আমি প্রকাশ করছি, কারন আমি কুচ পরোয়া। খুদা ছাড়া কাউরেই ... ইয়ে মানে!

আমার বন্ধু বলেন, কিন্তু কি একটা কাজ করেন বলছিলেন?

- ও হ্যা, আমি মনের মধ্যে বেস্টসেলার বইগুলোর ছবি আঁকি।

বন্ধু তো অবাক! তিনি বলেন, ছবি আঁকেন, যাদেরকে এতো ঘৃণা, তাদেরই ছবি কিনা...

- হ্যা, তাদের ছবিই আঁকি আমি। আমি শত্রুকে কাছে রাখি। সেই ছবি আঁকতে অবশ্য আমি বেশি সময় নেইনা। এদের পেছনে বেশি সময় নস্টো করার কোনও মানে হয় না।

বন্ধু বলেন, কত সময় নেন?

- বড়োজোর দু-চার সেকেন্ড। মনে মনে ছবি আঁকতে এত বেশি সময় লাগে না। 'কুন' বললেই তো হয়ে যায়।

■ তবে? বাকি সময়?

- হুম, বাকি সময়ে আমি আরও কিছু কাজ করি। ছবি আঁকা হয়ে গেলে আমি তখন ওই ছবিগুলোকে জীবন্ত করি। মানুষের রূপদান করি। মস্তিস্কের জৈব-রাসায়নিক ক্রিয়ায় এইসব সৃষ্টির খেলা চলতে থাকে। এখানে কোনও রাস্ট্র নেই, কোনও সঙ্ঘবিধান নেই, নেই কোনও শক্তিমানের করে দেয়া কড়া নিয়মের বেড়াজাল। ফলে ওই রাস্ট্রে আমিই একমাত্র ক্ষমতাবান।

বন্ধু বলেন, এই রাস্ট্র শব্দে আমার আপত্তি আছে।

- অর্থাৎ রাস্ট্রের বৈশিষ্ট্যের অনেকগুলো অনুপস্থিত, এই জন্য?

■ ঠিক বলেছেন।

- আমাদের রাজা-প্রজা, আর সম্পদ-সম্পত্তির সঙ্গে ভোক্তার সম্পর্ক বিচার করে দেখবেন একটু, তখন আর খারাপ লাগবে না, আশা করি আপত্তিও থাকবে না।
আচ্ছা মানলাম, এখন বলেন, আপনার চিন্তা-রাজ্যের ইতিবৃত্ত, আমার বন্ধু উতসাহের সঙ্গে বললেন।

- ঘটনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমি মানুষ হয়ে ওঠা ওই বেস্টসেলারগুলোকে চড়িয়ে দাত ফেলতে থাকি একে একে। আমি বাপু খুনোখুনি পছন্দ করিনা। তাই মনের মধ্যে জিবন্ত হয়ে ওঠা মানুষগুলোকেও খুন করিনা আমি। তা বড়ো মারাত্মক ও বিভতস দেখায়। অবতারদেরকে এইভাবে আমি শাস্তি দেই। এটা আমাকে রাগ ও মেজাজ দমন করতে সাহায্য করে।
■ আপনার মনের অবস্থা বুঝতে পারলেও খটকা যাচ্ছে না আমার। আচ্ছা আপনি যে চড়িয়ে দাত ফেলেন, আপনি কি ওদের দেখতে পান?
- আমার ব্রেইন যদি ওদের রেজিস্টার করতে পারে ঠিকমত, তবে দেখতে না পাওয়ার কি আছে! হ্যাঁ, ইয়ে মানে দেখিই তো! কেন কি হয়েছে?
বন্ধু এবার বললেন, না মানে বলছিলাম কি, একবার যদি ডক্তরের কাছে...

রাগমোচনের উপায় হিসেবে বহুবিবাহ উপভোগকে উসকে দিয়েছে কি না জানি না, তবে ভোগের লালার মনের পেয়ালা থেকে উপচে পড়ার আগে খুদা কি বলেছেন সেটা দেখে আসাটা জরুরি। শ্যাম দেশে এক মসজিদের খতিব খুতবা শেষ করে এলেন। তার সঙ্গে পরিচয় হলো।
তিনি বললেন, তাতে কি, এখানে বিয়েটা করো, ভাষাটা দ্রুত শিখে যাবে!
আমি মনে মনে বলি, শুধু ভাষা শেখার জন্য বিয়ে! বলে কি! তবে বিষয়ে দেখছি নভেলটি আছে!
খতিব ইঙরেজিতে খুব ভালো।
ভাবছি দেখে তিনি বললেন, আরে এত ভাবাবাবির কি আছে, ধর্মে চার বিয়ে পর্যন্ত...
আমি বলি, হুজুর মাফি মাঙে। সে তো আমার জানা আছে, কিন্তু...

■ কিন্তু আবার কি?
আমি এখন কি করে তাকে ‘একে রামে রক্ষে নেই, তায় আবার সুগ্রিব দোসর’ – এই প্রবাদের উপযুক্ত ইঙরেজি করে শোনাই!
পারিনি একটা যুতমত ইঙরেজি অনুবাদ করতে। পারা যাবেও না। কস্মিনকালেও না। বাক্যের এ’রম তেজ আর গভিরতা শুধু বাঙলাতেই সম্ভব।
ইঙরেজিতে ‘ডেমোলিশ’ বললে আমার কেন জানি মনে হয় কালো ঠোটে সস্তা লাল লিপস্টিক লাগিয়ে কলতলায় পানি নিতে আসা ষোড়সির কপালে আঙুলের টোকা দেয়া (একটু বেশি শোনাতে শোনাক)। যে টোকা দেয় সে যেনো শিষ দিতে দিতে আসছে, অর্থাৎ বখাটে! কি অপরাধ ষোড়সির?
■ পানি নিবি নে, কিন্তু চুল খসে তোর মুখ ঢাকলো কেন?
অর্থাৎ বিনা অপরাধে রাজ্য ধঙস। এ এস্তার দেখতে পাচ্ছি। এ বিষয়ে বিস্তর বলা প্রয়োজনহীন।
সে যা হোক, এখন এর বাঙলা অনুবাদ যদি করি ‘গুড়িয়ে দাও’ একবার ভাবুন তো! থার্মোমিটার হাতের কাছাকাছি কোথাও থাকলে বোগলে চালান করে দেখুন। এই হলো বাঙলা ভাষা। ভগবানের বুকো লাথি মারা সম্পর্কিত যেসব অনুবাদ ইঙরেজিতে হয়েছে তাতে মনে হয় ভগবানের সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে। ইয়ার্কির সময় আছে নাকি? মার লাথি!

বাঙলায় ঔদ্ধত্য, আমি বলি বিদ্রোহ, এর প্রকাশের কোনও সিমা-পরিসিমা নেই। কিন্তু বিদ্রোহিরা এখন সব মেনি বিড়াল কিম্বা বড়োজোর খেঁকি কুকুর হয়ে গেছে। খুলনায় একে বলে খেঁকি কুত্তো। এখন যারা চিতকার করবেন তাদের নেঙটি আর খাড়া হয় না, তারা এমনকি এই খেঁকি কুত্তো হতে পারছে না। এরা সবাই ফুটো বেলুনের মত চুপসে গেছে। আরে ফাকা আওয়াজ দিতে তো কেউ নিষেধ করেনি। সেটুকুও না থাকলে ঘাড়ের উপরে সাম্রাজ্যবাদের জিন-ভুতে আছর করলে দোষ কার? একটা গল্প মনে পড়ে গেলো। কোনও রেফারেন্স নেই। অনেকের মুখে এ গল্প শুনেছি -

একটা পথ। সেই পথের ধারে থাকতো এক বদমেজাজি সাপ। যে-ই সে পথে যেতো দুস্টু সাপে তারে কামড়ে দিতো। দেখছি তো ভিষন জালা! কি করা? সবাই গেলো সাধুবাবার কাছে।

সাধু এসে সাপকে ধমকে গেলেন - এমন কাজ ফের যদি করেছিস তো ব্রহ্মার শাপ দেবো তোকে।

বহুদিন পরে সাধুবাবা সেই রাস্তা দিয়ে যান। দেখেন মোটাতাজা দুস্টু সেই সাপ হাড়জিরজিরে কঙ্কালসার হয়ে গেছে। নড়বে, এমন শক্তিও যেনো আর অবশিষ্ট নেই।

সাধুবাবা জিজ্ঞেস করলেন, হা রে! তোর এ হাল যে! কি হয়েছে তোর? সাপ বলে, আমি আপনার আদেশ শিরোধার্য করে ওদেরকে কামড়ানো বন্ধ করলে ওরা সবাই মিলে আমাকে মারধর শুরু করেছে বাবা! দেখুন কি হাল!

সাধুবাবা বলেন, ওরে হাদারাম, আমি কামড়াতে বারন করেছি, ফোসফাস করতে তো বারন করিনি!

বাঙলাই ভারতবর্ষকে রাস্তা চিনিয়েছে। যদি কেউ ভবিষ্যতেও দেখায়, এই বাঙলাই আবার পথ দেখাবে। উপমহাদেশে বাঙলাটা আসলেই মুখ্য ফ্যাক্টর। সে ভাষা বলুন কিম্বা দেশ, বঙ্গ মানেই বিশেষ কিছু। বাঙলার নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে হটিয়েই তো সাম্রাজ্যবাদিরা ভারতবর্ষে স্থান পোক্ত করে নিয়েছিলো। আবার ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যা কিছু স্বরূপ তা এই বাঙলাতেই দেখা গেছে। সশস্ত্র আন্দোলন বলতে যা বোঝায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে, তা বাঙলা থেকেই শুরু হয়েছিলো। নেতাজিকে স্মরণ করলেই বিষয়টা পরিস্কার হয়ে যাবে। তিতুমির, সূর্যসেনও ছিলেন জাদরেল সশস্ত্র বাঙালি বিদ্রোহি, সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে এদের পরিচয় সন্ত্রাসি হিসেবে। সাতচল্লিশের ভাগের কথাও যদি গোনায আনি তাহলেও এই বাঙলা। ছেচল্লিশে দেশভাগে যাবো কি না তা নিয়ে যে সাধারণ নির্বাচন হলো তাতে বাঙালিরা মুন্সিয়ানা না দেখালেই বুঝি বা পারতো। কিন্তু দেখালো, খুব ভালো করেই দেখালো এবণ্ড পাকিস্তান নামের একটা অদ্ভুত দেশের জন্ম হলো। অর্থাৎ বাঙলা তাবত ভারতবর্ষের জন্যই এমনই একটা ডাকসাইটে ধারনার নাম। বাঙলাতে একটা বিষয়েই আমার যত কস্টো - লোকসঙ্গিত বাদ দিলে হাতে গোনা সামান্য কিছু গান পাওয়া যাবে, যা ভবিষ্যতের কোনও অবসর সন্ধ্যায় গাইবার কিম্বা স্মরণের যোগ্য। লোকসঙ্গিত, নজরুল আর রবিন্দ্রনাথের গানকে বাদ দিলে বাঙলায় গানের শরন নেই। উচ্চাঙ্গের আলাপও বাঙলায় আমার কাছে মনে হয় মুখরা রমনির বেহুদা ঝগড়া। এ চেষ্টা না করা উচিত। হিন্দি ও উর্দুতে গানের যে প্রশান্ত সাগর, তার কাছে বাঙলা কেন যেনো খানা-খন্দ হয়ে গেছে।

আমাদেরও উপসাগর আছে বটে, কিন্তু সেখানে মনমাঝির গানের সঙ্খ্যার চেয়ে মাছ চোরের সঙ্খ্যা বেশি।

গানের বর্তমান এই ঠেলা দেখেই মনে হয় সলিল চৌধুরি পৃথিবির গাড়িটা থামাতে বলেছিলেন - এই রোকো। উনি যা দিয়ে চলে গেছেন তার মূল্য শোধ করে, বাঙলা গানের জগতে বিরল। তার টিকেটও কাটা ছিলো বহু দূরের। দূরে চলে গেছেন। গিয়ে বেচে গেছেন। কিন্তু আমাগো টিকেট কে কাইটে দেবে? কি যে শুনছি, শুনে শুনে কানটাই শালা নস্টো হয়ে গেলো। কে যেনো সেদিন বলছিলেন, কথাটা এমন মনে ধরেছে আমার, এই মনে ধরার তোড়ে কে বলেছিলেন সেটা বেমালুম ভুলে গেছি। তিনি যে-ই হোন না কেন অত্যন্ত খাটি একটা কথা বলেছেন। তিনি বললেন, তিনি বেন্ড সঙ্গিতের বিপক্ষে নন। কিন্তু বেন্ড সঙ্গিত আমাদের গান শোনার কানটাকে নস্টো করে দিয়েছে। এই কান এখন ঠিক করি এমন ডক্তর নেই। আর ডক্তরেরাও শালা মাল। এন্টিবায়োটিক গুলিয়ে খাইয়ে দেবে। কান সারতে নাক যাবে। নাক সারতে জিহবা।

আমার বন্ধু বলেন, জিহবা গেলে তহন গানের নামে এহন যে তড়পানো, এডাও বন্ধ হইয়ে যাবেনে যে!

- তাই বলে ভাইরাল ফিভারেও এন্টিবায়োটিক?

■ তো?

- যুদ্ধটা হোক না আগে। কে মরে দেখা যাক। গানের বেলায়ও সেই কথা। যুদ্ধ লেগে গেছে। কে যে জিতবে!

‘সুজন কান্ডারি... ..’ বলে আব্দুল লাতিফ সার যেদিন হাক দিলেন, সেদিন মনে হয়েছিলো আমার চেয়ে আঠারো-কুড়ি বছরের জেষ্ঠ এই পরম বন্ধুর গলা খুদার আশির্বাদে অলঙ্কৃত নয়, কিন্তু মন ও রুচি বাঙলার লোকগানের প্রতি উতসর্গিকৃত। ওই এক জায়গায় আমাদের খুব গর্ব বাঙলা গানে। কিন্তু এই গর্বও খর্ব হয়ে যাচ্ছে মেলা কারনে। অবশ্য কলকাতায় প্রচুর বাঙলা গান আছে যেগুলো বাঙলা ভাষার অস্তিত্ত্ব বিলিন না হয়ে যাওয়া অবধি মানুষের মুখে ও মনের সঙ্গেই সঙ্গতিবিধান করবে প্রায় অবধারিতভাবেই, অর্থাৎ টিকে যাবে। কলকাতার গান আমাদেরই গান। বাঙলা গান বলেই আমাদের, কাটাতারের বেড়া দিয়ে গানের সুরকে আটকে জানকে আরও কস্টো দিতে চাই না। আমি এ সব কাটাতার ফাটাতার মানি না। আমি মনে ও মননে এখনও দেশভাগের আগে বাস করি। তবে কাটাতারের বাস্তবতা কিন্তু আমার এইসব ফালতু আবেগের ধার ধারে না। তাই আমিও একদিন দাদাদের, অর্থাৎ বিএসএফ জওয়ানদের হাতে ধরা পড়ি। আমাকে কেম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। ধরা পড়া অন্যান্য যুবকেরা যে পরিমান ও ওজনের বেতের বাড়ি খেয়েছে, তা দেখেই আমার মুর্ছা যাওয়া উচিত ছিলো। ব্রিটিশদের কাছে এখানেই আমি শুধু ঋনি। আমি বিএসএফ অফিসারের সঙ্গে আঙুরেজিতে কথা বলার ট্রিক করি। অর্থাৎ প্রথমে এই ধারনাটা দেয়া যে, আমি স্কুলে দু’কলম পড়েছি, এবণ্ড নেহাত দায়ে পড়ে পাসপোর্ট ছাড়া অন্য দেশে ঢুকেছি, স্বভাব দোষে আসিনি এখানে, অন্তত বনগাওয়ার সিনেমা হলে সস্তায় টলি বা বলিউডি সিনেমা দেখার খায়েশে তো অবশ্যই নয়। অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গেই সে যাত্রায় বেচে গিয়েছিলাম। অর্থাৎ বেতের বাড়িটা খেলে আমার সারাজীবন আফসোসের সিমা থাকতো না। মেরিন একাডেমিতে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিঙ এর ভাইভা পরিক্ষায় মান্না দে’র গান শুনিয়া পাশ করেছিলাম, এখানে তেমন কিছু করতে হয়নি। শুনানোর ইচ্ছে ছিল বিস্তর, কিন্তু

পরিস্থিতি বিদ্রোহ করেছিলো। এ যাত্রায় গানের বদলে ফিরিঙ্গি ভাষা আমাকে বৈতরনি পার করালো।

হুম, বাংলাদেশের কিছু গান, হোক তা হাতে গোনা, তাও বাঙলা সঙ্কৃতির টিকে থাকাকে সঙ্গ দেবে আজীবন।

আমার বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করেছেন, বাকি গানের কি হবে তাহলে?

আমি তখন বলি, আমার মনের মধ্যে ছবি আঁকি সেগুলোর, তারপর তাদেরকে প্রান দেই, তাদেরকে অমানুষ করে তুলি। না বেশি সময় নেই না। তারপর ইচ্ছেমত হারামজাদাগুলোর চড়িয়ে দাত ফেলি।

আমাদেরকে বেস্টন করে রেখেছে ধর্ম। ধর্ম হলো যাকে বলে খাসা একটা বেড়া। সে বেড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে মানা। বেড়া ডিঙালে অপরাধ এটা সবাই মানে, কিন্তু দোষ হয় শুধু ধর্মের। খুদা স্বাধীনতা দিয়েছেন পরাধীন করে রেখে। বেপারটা খারাপ না। বরঙ এটা-ই সুন্দর। আমাদের আনন্দবর্ধনের খেয়াল করেই সুযোগ করে দিয়েছেন যিনি, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা। পশ্চিমা ব্যবস্থাপনার আধুনিক মুখোশের সত্যতাকে যারা উসকে দিয়েছে ধর্ম ব্যবস্থার বিপরিতে, তারা জেনে বুঝেই সেটা করেছে। পশ্চিমা সততা স্বরপ্রধান, অর্থাৎ বানিসর্বস্ব। কিন্তু ধর্মকে ব্যবহার করার বিষয়াবলি নির্ভর করেছে যিনি ব্যবহার করছেন তার মতির উপর। দুর্মতির দোষ ধর্মের উপর চাপালে নৈতিক বা দৈহিক কিম্বা মানসিক কোনও অবস্থার সঙ্গেই সত্যের সঙ্যোগ ঘটানো যায়না। কেউ মানুষ কিম্বা না মানুষ, পৃথিবির প্রতিটি মানুষই কামুক। পশ্চিমা আধুনিকদের দেখলে সেটা বোঝা যায়, তারা ঘর বা'রের পরোয়া করে না। খুদা যা দিয়েছেন তা মানলে অন্তত এত আধুনিক হওয়া থেকে রেহাই পাওয়া যায়! কিন্তু সাধু সাবধান! সুবিচারের যোগ্য অর্থ জেনে বুঝে তবেই!

কিন্তু আমাদের সঙ্কৃতি আমাদের আবেষ্টন করে রাখতে পারেনি। আমাদের নিজেদের বসানো ইট দিয়ে গাথা স্থাপনাও খড়কুটোর মত উড়ে যাচ্ছে। আমরা আটকাতে পারছি না। আমরা স্বাধীনতাকে যাচ্ছেতাই করে ছেড়েছি। স্বাধীনতা নিজেই এর প্রতিশোধ নিচ্ছে। শুধু অন্যের দোষ দিলে নিজেকেই শুধু খাটো করা হয় তা শুধু নয়, ভবিষ্যতের স্বপ্নগুলোরও মৃত্যুর পথের ইশারা থাকে তাতে। আমরা সেই পথেই হাটছি।

লতিফ সার তারপরও আশাবাদি সবকিছুতে। তিনি যে কি করে এতো আশা করেন, আমি ভাবি আর অবাক হই। তিনি দৃঢ়সঙ্কল্প নন, দৃঢ়চিত্তেরও কি তিনি, সে জানি না, কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসি। তার মত ধৈর্যশীল মানুষ বিরল। মানুষ কি করে এতো অপমান সহ্য করে আমি তার কাছ থেকে শিখেছি। আমরা গুটিকতক মানুষ তার কাছে যাই গোখুলির রাঙা পথের আনন্দ পাবো বলে। পৃথিবির দিগন্ত যখন অতিমাত্রায় স্বচ্ছ হয়ে আসে, জানবেন ঝড়ের পূর্বাভাস। আমাদের জীবনে সামনের আতঙ্কের অনুভূতিকে বুঝতে পারা অসম্ভব জেনেও আশার দড়িকে ধরে রাখার প্রয়োজন, এই কথা যিনি বলেন, তার কাছে ঝড় কি, কি ঘর, কি বা'র! আমি তার কাছে যাই, তার কারন আমি অসুস্থ। আমি অসুস্থ অনেক দিক থেকেই। তার কাছে গেলে আমি হাসি, এবঙ সুস্থ হই। খান মহিউদ্দিন বাহারও এই কথা বলেন, খালেদ হোসেইনও বলেন। ভালোমানুষদের কথা মিথ্যে হয় না। ভালোরা মিথ্যে কথা বলেন না। এই ত্রয়ি হলেন আধুনিক যুগে ভালোমানুষদের উদাহরন। এদের মত মানুষদের কাছে পেলে বন্ধুর প্রয়োজন হয় না। আমি চিরকাল বন্ধুহীন। কিন্তু এখন বন্ধু না হলেও চলে আমার। ভালোমানুষের সঙ্গ পাওয়া পরম ভাগ্যের বেপার। যারা ভাগ্যবান শুধু তাদের কপালে জোটে। সম্ভবত আমি তেমন একজন। বালজাক বলেছিলেন, যে যত বেশি দোষ খোজে, সে তত কম ভালোবাসে। এরা মানুষের দোষ কম খোজেন। তাই এরা নিপাট ভালোমানুষ।

কিন্তু আমরা ভালো হতে ভুলে গেছি। কিন্তু ভালো নাম নিয়ে। শ্যাম দেশের ইমামও জানেন, চারটা বিয়ে করে যে, সেও জানে ‘জাস্ট’ হওয়া এতো সোজা না। সত্যি কি জানে? কিন্তু তবুও তিনি ওকালতি করেন। মানুষ তবুও করে। অর্থ ও নির্দেশের প্রতি আসল জ্ঞানটা না ঝলিয়ে নিয়ে-ই করে। নিজের প্রতি ‘জাস্ট’ হতে হলে নিজেকে একটু কষ্টে দিতেই হবে। আরামে গা ভাসিয়ে দিলে ‘জাস্ট’-এর অর্থ বদলে যায়। এই বদলে যাওয়া অর্থ নিয়েই ধর্ম চলছে।
কিন্তু দোষ নন্দ ঘোষের।

মদ্য মম ভয়সায় ওঙ... নমো!

(বিকেল ৫ টা ৩৭ মিনিট, ৪/১০/২০১৫)

আমি নন্দঘোষকে নিয়ে একটা লেকচার দেবো বলে ভাবছি, তখন আমার বন্ধু এসে উপস্থিত। কাছে এসে কথা বলতেই বুঝে গেলাম আজ গন্ডোগোল পাকাবেন উনি। গাল থেকে সে’রম গন্ধ বের হচ্ছিলো। না, না হ্যালিটোসিস নয়, মদের গন্ধ! অর্থাৎ উনি ধরাকে সরা ভেবেই অবতীর্ণ হয়েছেন আজ। কি বলতে কি বলবেন সেটা যখন ভাবছি তখন তিনি তার প্রথম বাক্য উচ্চারণ করলেন - আমার চোখ অকৃত্রিম, অর্থাৎ আমার চরিত্র কৃত্রিম।

আমি তখন ভাবছি, আমি একে বাড়তে দেবোনা আজ, তাহলে সারা রাত মাটি হবে। এই ভেবে আমি তার সঙ্গে যোগ করি, অর্থাৎ কৃত্রিমতা-ই তোমার জীবন! এ নিয়েই কাটিয়ে দিলে? আচ্ছা যাও, গিয়ে অকৃত্রিম ঘুম দাও, সকালে দেখবে যে ফুরফুর করছে।

কিন্তু সে শোনার পাত্র নয় বলেই কি, না শোনার মত বা বুঝে শোনার মত অবস্থায় নেই বলে সে বলে চলে, হ্যা ঠিক, খুব ঠিক। কিন্তু নিজেকে প্রদর্শন করেছি খাটি হিসেবে।

অর্থাৎ যাবার কথা সে আমলে না নিয়ে এখানে আমার রাত মাটি করার জন্য যা বলতে হবে সে খেয়াল দেখছি ঠিকই আছে।

আমি বলি, আমি কেন, সবাই সে রকম জানেও।

বন্ধু ছাড়বার পাত্র নন। মদে তার মস্তিস্কের কতখানি বিকৃতি ঘটিয়েছে বুঝতে পারিনা। তিনি বলতে থাকেন, প্রসঙ্গটা আমার বালক বেলার। তখন ভেতরে ইতর পশুদের আনাগোনা শুরু হয়নি। কিন্তু একজনকে ভালোবেসে ফেললাম, সেই বয়সেই। তখন ফুলের ঘায়ে মুর্ছা যাবার মতন তুলতুলে আমার মন। তারও। কিন্তু ফুলে পতঙ্গ ছিলো। সেই পতঙ্গের একটা আমার হারেমের মধ্যে ঢুকে গিয়ে বিস্তার লাভ করেছে। এখন আমার অন্তর বিকশিত, কিন্তু পতঙ্গ দ্বারা, মনুষ্যত্ব দ্বারা নয়।

তোমার কথা তো আজ মনে হচ্ছে দূর গ্রহের? নইলে কাছেপিঠে মিশরের হিয়েরোগ্লিফিক্সের মত। খুলে বল, আমি যোগ করি। আমি বুঝতে পারি আজ রেহাই পাওয়া মুশকিল হবে।

বন্ধু বলতে থাকে, আমার যখন চৌদ্দ-পনেরো হলো, তখন আমার মুখের ভাষা কেড়ে নিয়েছিলো সমাজ। ওই বয়সে কথা ফুটে ওঠার মত সময় ও সাহস কোনওটাই আমার ছিলো না। ফলে আমি তাকে পালকিতে চড়তে দেখলাম।

ওই বয়সে? বলো কি?

হুম, তার দেহের ভাষা প্রকাশ হতে লেগেছিলো খুব দ্রুত, সমুদ্রের ঢেউয়ের মত। তত দ্রুত কিন্তু আমার মনের ভাষা বিকশিত হতে পারেনি। বরঙ দেরি হচ্ছিলো। কিন্তু সমাজের দেরি সইলো না। ফলে যখন

আমার সমস্ত আবেগ জড়িয়ে ছিলো তার প্রতি, তখন তার আবেগহীন শরিরকে উতসর্গ করতে হয় আরেকজনের কাছে। তিনি তার স্বামি হলেন।

- স্বামিজির বয়স কত বলে মনে হয়েছিলো তোমার?
- ওটা নাকি তার দ্বিতীয়বারের মত দারগ্রহন!
- অর্থাৎ ধর্ম আবার জাস্টিফিকেশনের পাল্লায় পড়েছে! খুদা! বিপদ!

আমার বন্ধু বলেন, তখন আবেগের কি বুঝি আমি? মনের পরিনতির আগেই তার পরিনয় দেখতে হয়েছিলো। ফলে চক্ষু দিয়ে, আর শরির দিয়ে ইচ্ছেমত যোগসাধন করছি। অর্থাৎ দুনিয়ার কৃত্রিম বস্তু আমাকে আর কিছুতেই একা থাকতে দেয় না। আমার নিজের চরিত্রের কৃত্রিম না হয়ে উপায় আছে?

- তা ভালো বলেছেন, একেবারে খাটি কথা বলে ফেলেছেন।
- তারপর একদিন আমি খবরের কাগজের দিকে চোখ বুলিয়েছি। একটা খবরে আমার দৃষ্টি ও মন আকর্ষণ করলো। আমি ভাবলাম, একে আমার চাই।
- কাকে?
- অর্থাৎ খবরের কাগজের ক্রিয়াকান্ডে একজনের কথা খুব মনে হচ্ছিলো জানেন? আর খুদা এমনই উত্তম বিবেচক যে তাকে একেবারে আমার সামনে এনে শেষ অবধি দাড় করালেন।
- অর্থাৎ ভালোবাসাটা খাটি ছিলো আপনার? বহু পরে হোলেও আপনার বিজয় নিশ্চিত মনে হচ্ছে আমার কাছে। খুলে বলুন তো! আমার এখন ঘটনার তেস্টা পেয়ে গেছে।
- খবরের কাগজ পড়ে মনে মনে ভাবলাম, একেই আমার চাই। যুগ পালেটছে, কিন্তু মন এখনও আদিম রয়ে গেছে বলে আমার নিজের যে আক্ষেপ, তার অবসান ঘটাবো। এ সমাজে অন্তত একজন তো ঘটাবে। খুজলে অলিগলিতে আরও পাওয়া যাবে হয়ত, আশা করি। কিন্তু আমি যা করবো সেটা আমার মনের সায় আছে বলেই।
- খবরের কাগজের ঘটনাটা তিনি শেষ করেছিলেন বলে তাকে বললাম, শ্রদ্ধার বশে?
- না, না। সে কি কথা! ভালোবেসে!
- ধর্মিতা দেশকে আমরা কি ভালোবেসেছি? কি উপহার দিয়েছি তাকে এই তেতাল্লিশ বছরে? আর নাম না জানা কাউকে একেবারে অমন করে ভালোবাসা যায় সে কথা তো জানতাম না!

আমার বন্ধু বলেন, কিন্তু আমার ওই এক কথা। আমি তখন ভাবলাম, বরঙ ধর্মিতাকে বিয়ে করবো, কিন্তু বেভিচারিনিকে নয়।

আমি বলি, কিন্তু আদালত তো ধর্মিতাকে বেভিচারিনি বানিয়ে ছাড়বে!

- তা তুমি ঠিকই বলেছ। আচ্ছা ধর্মনে নারির যেটুকু খোলে, আদালতে কি নয় তার চেয়েও বেশি?
- কেন এ কথা বলছেন?
- বলছি না, ভাবছি। ভাবছি আদালতের কি শাস্তি হওয়া প্রয়োজন তাই।
- সব কিছুর জন্য শাস্তি খুজতে যাওয়া বৃথা। আমাদের অত ক্ষমতা থাকতে হয় না।
- কিন্তু বলেছিলাম খুদা সুবিবেচক, সুতরাং ভালোবাসার তিরে যতই বিষ মাখানো থাকুক না কেন, তা আমার কাছেই ফিরে এলো। আমি তাকে আবার পেলাম।
- অর্থাৎ সেই বালকবেলার প্রেমকে জয় করলেন অনেক মূল্যের বিনিময়ে?
- মূল্য দিলেই তবে প্রেমের পরিনাম শুভ হয়।

* * * * *

(রাত ২ টা ৯/১০/২০১৫)

বন্ধুর কাছ হতে অনেক কস্টে ছাড়া পেয়ে আমি চলে আসি। বিরল রাস্তায় শুধু পৃথিবী আর আমি। একা পৃথিবীকে সাথ দেবো বলেই হয়ত হাটতে থাকি। বন্ধুর কথা ভাবছি। ভাবছি মূল্য দিলেই যদি প্রেমের পরিণাম শুভ হবে তবে, ধর্মিতার আজন্ম পাপের বিষয়ে আদালতের ভাষ্যকে কিভাবে আমি এখন গন্য করবো? শুভ না অশুভ? এই সময় আমার মনে হতে থাকে, আদালত আসলে ধর্মিতার জন্য মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করেনি, এটা উপস্থিত সভ্যদের পরমানন্দলাভের একটা বিকৃতাচরন মাত্র। এর পরে আমার আরও মনে হতে থাকে, আমি কোনও মানবাধিকারে বিশ্বাস করিনা। আমি সম্ভবত সরাসরি দেশের মানুষের সামগ্রিক অধিকারে বিশ্বাসি। সেটাকে মানবাধিকার নাম দিয়ে খেলতে আর পরমানন্দের প্রসাদ পেতে আমার ইচ্ছে নেই।

মানবাধিকার শব্দটি একটা ধুয়ো। একেবারে ধোয়া তুলসি পাতার মত। এই ধুয়ো তুলে যারা বাড়তি সামাজিক সুবিধা আদায় করে ‘এলিট’ জীবন-জাপনে অভ্যস্ত, তাদের প্রতি বিষম আচরন, কিম্বা কঠোর বাক্য কোনটা প্রয়োগ সুখকর হবে আমার মনের পক্ষে, তা এখন বুঝতে না পারলেও একটা বিষয় আমি নিশ্চিত অনুভব করি, শক্তির কাছে নিত্যের বেখ্যা চাইতে যাওয়া বোকামি। শক্তি নিত্যকে তৈরি করে। ভাবতে থাকি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় কিভাবে? আদালত তো ন্যাঙটো করে ছাড়বে, তা নিয়েই আমার বন্ধু খুব খুশি। কিন্তু এতে কি অধিকার প্রতিষ্ঠা হয়? হয় না বলেই যখন আমার মনে হতে থাকে, তখন অধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ক চিন্তা আমার মাথায় ঘুরতে থাকে।

আমার পড়ে পাওয়া আধ আনার এক পরিচিত লোক ছিলেন। তিনি তালাকপ্রাপ্তা হয়ে সমাজের উপর খুব ক্ষেপেছিলেন। অর্থাৎ প্রথাবিরোধি হয়ে সমাজের বিরুদ্ধে এক হাত নেবার ইচ্ছে প্রকাশ পাচ্ছিলো আমার কাছে। কিন্তু ধিরে ধিরে গুমর ফাক হতে থাকে। যতই মিশি তার সঙ্গে, দেখি তিনি আবারও ভুল করতে যাচ্ছেন। অর্থাৎ আবার ঘর বাধার ইচ্ছেটা প্রকট হচ্ছে। আমি বুঝতে পারি, অন্তর্জালে আসলে তিনি একজন পাত্র খুজছিলেন। পাত্রা দইয়ের মত নরম, তুচ্ছ ও নামকাওয়াস্ত বন্ধুত্বের সেদিনই যে ইতি হয়েছিল সেটা বলা বাহুল্য। তারে একদিন বলেছিলাম, আসুন, দেশের ইভটিজিঙ কমিয়ে দিই। তিনি বললেন, কিভাবে?

- টিজারকে ধরে, শাহবাগে ঝুলায়ে দেবো। অবশ্য সরকারিভাবে। কারন এটা সম্ভব যখন রাজদন্ড আমার হাতে! আর সে দৃশ্য সব চ্যানেলে লাইভ টেলিকাস্ট হবে। সবাই দেখবে। এই কথা শুনে তিনি অবাক হয়ে আমাকে বলেন, এই না হলে ধার্মিক। এমন কাজ ধার্মিকের পক্ষেই করা সম্ভব! এ বর্বরতা, জাহিলিয়া...

- বটে! অর্থাৎ আপনাকে কেউ যদি ধর্ষন করে, তবে তার কেমন বিচার আপনি দাবি করবেন? আমি নিশ্চিত তার মৃত্যুদন্ড চাইবো আদালতের কাছে, তার দৃঢ় উত্তর।

- কিন্তু আদালত তো আপনাকে ন্যাঙটো করে ছাড়বে সবার সামনে, একবার, দুইবার কিম্বা আরও কয়েকবার!

তখন তিনি চুপ করে থাকেন, আর প্রসঙ্গ পালটে অন্য কিছু বলার ধাক্কা করেন। মানবাধিকার কর্মীদের মত।

তখন ভাবি, আমার কয়েকটা সাক্ষাতকার নেয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। নইলে রাস্ট্র মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে কেমন করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া কঠিন হয়ে যাচ্ছে। রাস্ট্র ও আইন জনগনের জন্য। ফলে যাচ্ছেতাই করা ঠিক হবে না। ভুক্তভোগীদের মতামতের গুরুত্ব দিতে হবে। অর্থাৎ কোনওকালে জনগন যেনো দাবি না করতে পারে যে রাস্ট্র তাদের মতামতের বেপারে উদাসিন।

এর কয়েকদিনের মধ্যেই আমি বেশ কিছু সাক্ষাতকার নিয়ে ফেলি, অবশ্যই ছদ্মবেশে। আমার চিন্তার জগতে রাজদন্ড আমার ঘাড়ে, বাইরে ইচ্ছেমাত্ৰিক ঘুরে বেড়ানোর ঝামেলা আছে আমার। প্রথম সাক্ষাতকার নিই যিনি ধৰ্মনের শিকার হয়েছিলেন সতেরো বছর বয়সে। ইনি আমার বন্ধুর বর্তমান স্ত্রি। অর্থাৎ বহুদিন পরে বন্ধু তার ছোটবেলাকার প্রেমকে ফিরে পাওয়ার যে গল্প আগেই বলেছি তার অন্যতম চরিত্র ইনি। তার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে –

- কি করছে?
- দেখতেই তো পাচ্ছে!
- অর্থাৎ সময় নিয়ে খেলা?
- জানো তো, তোমার সময়ে তুমি একে সঠিক মূল্যায়ন করতে পারবে না, কেউ পারে না। তাকে নিয়ে খেলার কিছু নেই। বরঙ উল্টোটা বলো।
- তবে, এই যে বেচে থাকা, এটার মূল্যায়নও কি করা যায় না?
- বেচে থাকা তো সময়ের সমাকলন – ইন্টিগ্রেশন। তাকে তুমি মাপবে কি দিয়ে?
- কেন সমাজের অধপতনের কি তাহলে কোনও মাপকাঠি নেই, যে তাকে নিয়ে যুগকে বিচার করবো?
- অধপতন কিন্তু পতন নয়!
- অর্থাৎ সমাজ যখন নিজেই একটা প্লটের সাক্ষি, তখনও তাকে একটা নির্দিষ্ট পেটানো অর্থাৎ ছাচে ফেলে দিয়ে বলা সম্ভব নয় যে, এই হলো আমাদের যুগের আসল চেহারা?
- সমাজ বলে কিছু নেই। যা কিছু ট্রানজিটিভ, তাকে তুমি কোনও ভাবেই কোনও কিছু দিয়ে অ্যাট্রিবিউট করতে পারো না। বরঙ বলতে পারি, বেচে আছি এটা-ই হলো এই শতকের জন্য আমার কাছে সবচেয়ে বিরাট ঘটনা। শুধু আমি নই, সবার বেচে থাকার কথা বলছি। বেচে থাকার আসলে কোনও উপাদান নেই এখন। শারিরবৃত্তিয় নড়নচড়নের নাম যদি বেচে থাকা হয়, আর বিষ মিশ্রিত অক্সিজেনকে যদি জালানি বলো তবে অন্য কথা।
- তাহলে এই থাকার মানে কি, তোমার কি মনে হয়?
- মানুষ কাজ করে খাওয়ার জন্য। এখানে আর কোনও কাজ নেই। শুধু খাওয়া। কেউ সন্ধে হলে শেপ্সেন খায়, কেউ চা-বাগানের সস্তা মদ। এই দুই ব্যক্তির মধ্যে বোধের আসলে কতটুকু পার্থক্য বলতে পারো? এরা যে যার জীবন নিয়ে সমান গুরুত্ব বোধ করে। তাহলে কে শ্রেষ্ঠ? আভিজাত্য কিম্বা হিনজাত্য, যা-ই তুমি বলো না কেন, আখেরে সব এক। কিন্তু নকলনবিসি করে দুটোকে ফারাক করা হয়েছে হিন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য। এটা শক্তিমত্তার খেলা। আর কিছু নয়। এই খেলা খেলেই মানুষ বেচে থাকে, সময় পার করে। যাকে তুমি বেচে থাকা বলো, তা হচ্ছে আকাজ্জার সবচেয়ে গভীরতম দিক, মানুষ কিছু উপলক্ষ তৈরি করে সেই আকাজ্জাকে চরিতার্থ করে।
- কি উপলক্ষ?
- সত্য কে জানার অপচেষ্টা।
- খুলে না বললে বুঝতে খুব সমস্যা হচ্ছে আমার।
- পৃথিবিতে মানুষই একমাত্র জীব, যে যা কিছু স্পর্শ করে তা কলুষিত হয়। অন্য সব প্রাণির ক্ষেত্রে এটা প্রকৃতিঘটিত।
- অর্থাৎ মানুষের বেলায় আরোপিত?
- তাই তো জেনে এসেছি। খুদা হয়ত আমার এ কথা শুনে হাসেন। কিন্তু জীবন সম্পর্কে এই হলো আমার পবিত্র ধারণা।

- কিন্তু চেতনার গভিরে তুমি যাকে অনুভব করছো, তা কি তোমার এই ধারণাকে জাস্টিফাই করে?

■ কেন করবে না? জীবনের অর্থ কি, এই প্রশ্ন যদি তুমি আমাকে করো, তবে আমি বলবো, তুমি যা নিয়ে কথা বলছ, অথবা যা ভাবছো, তা-ই জীবন। এখানে ভাবনাটা আসল, আর কর্মটা ভাবনা থেকে দূর। ফলে কি করি সেটা বিষয় না, বিষয়ের সঙ্গে জীবনের সম্বন্ধ নেই। তুমি ভাবছো এবঙ কিছু করছো, ধরে বসেই রয়েছে। এই হলো জীবন। কারও জীবন থেমে গেছে। ওটা-ই হবে তার জীবনের সঙ্কল্প। হুম, আমরা যখন শক্তিমত্ত হই, আর সেই শক্তি আরোপ করি অন্যের উপরে, তখন তাদের স্বাভাবিক জীবনের যে সচ্ছন্দ প্রবাহ, সেটা অন্য পথে চলে যায়। অর্থাৎ জীবনের যা কিছু মানে হবার কথা, তা বদলে যায়। এখানে তুমি আবার বলবে, মানে তোমাকে বলতেই হবে যে, ওটা-ই হলো তাদের জীবন। কিন্তু এখানে সঙ্ঘর্ষটা শুরু হয়। অন্যায়ভাবে শক্তি আরোপ করলে ছন্দ নষ্ট হয়। এটা কনফ্লিক্ট। আমি তো এভাবেই ভাবতে চাই।

- ভাবতে চাও, না ভাবানো হলো তোমাকে?

আমার বন্ধু বিরক্ত হন না, কিন্তু আমাকে বলেন, আচ্ছা ছাড়ো। জগতের অনেকগুলো ঘটনা মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করবে। করতে দাও।

(৯/১০/২০১৫ রাত ১০ টা ২৩ মিনিট)

বন্ধুর স্ত্রি আমার বন্ধু। পরম বন্ধু। পরম দন্ড দিয়ে মাপার কোনও উপায় থাকলে বলে দিতে পারতাম যে এই সমাজে তার ও আমার সম্পর্কের বিষয় কতখানি গভির। তো, সেই সমাজের মেদযুক্ত শরিরে চাবুক চালাতে পারছি না কেন, এই ভাবছি, আর তখন এও ভাবছি যে, এটা অসহায়ত্ব না, এড়িয়ে যাওয়া! কিন্তু যখন এ উপলব্ধি হতে সৃষ্ট মনস্তাপ এড়ানো, তখনও আমার হাতে মদের পেয়ালা। অর্থাৎ আমার মত ভন্ড এ জগতে বিরল। আমার আর সাধুদের মধ্যে নিভৃতবাসের পার্থক্য হলো, প্রকৃত সাধুরা সপ্ত আসমান জয় করে আরশের কাছাকাছি হন, আর আমি নস্টামি করি। তাতে আমার সমুহ পরাজয় ঘটে। আর সমাজের একটু একটু গচ্ছা দিতে দিতে রসাতলে যাবার জন্য নিভৃত কাজ করে যাই। আমার কীর্তি, অর্থাৎ কু-কীর্তি হলো অগ্নিকুন্ডে নতুন করে আগুন জালানো এবঙ সব নষ্টো করে দেয়া, অপরটি হলো অশরিরি প্রেমের আগুনকে নেভানোর আনন্দ। আমার আনন্দ ক্ষনিকের, আর সাধুদের ওটা পরমার্থ, অর্থাৎ অনাদিকালের। ফলে কেউ যদি আমার মতামত জানতে চান, তবে প্রথমেই বলবো, আমার সঙ্গ ত্যাগ করুন।

আমার মনোযোগ কোথায় যে কেন্দ্রীভূত হয়, তা আমার নিজেরই জানা নেই। আমি নিজেই জানি না, আমি আসলে কি করতে চাচ্ছি। তালাবন্ধ অবস্থায় আমার মনের ধারণা কেমন ছিলো সেটা জানি না, তবে তালা খুলে দিয়ে খুদা আমার কঠিন পরিক্ষা নিচ্ছেন। আমার হার নিশ্চিত। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে সে'রম অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু হেরে গেলে আখেরে তো মহা বিপদ। মানে পুলসিরাতটা যেমন করেই হোক পার হবার বেবস্থা না করতে পারলে এ-ই হলো গিয়ে আসল সর্বনাশ। কিন্তু কেমন করে সেটা পারা যাবে এ নিয়ে যখন আমার মাথা বিগড়ে যাবার মতন অবস্থা, এমন সময় আমার একটা গান মনে আসে। গানটা আমারই লেখা –

আমার বন্ধ ঘরের জানলা খুলেছি এ,
খুদা আমায় অনেক কিছু দিয়ে,

অনেক নিয়ে যায়।
এখন আমি কি আর করি
কি আর হয় উপায়!

অর্থাৎ মনের মধ্যে দুর্ভাগ্যেরা সুরসুর করে ঢুকে গেলে সেই চাপ সহিতে না পেরে মন নিজেই উড়াল দিয়েছে। মিছেমিছি খুদার দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমার অবস্থা বর্ণনাতিত। এ সময় আমার বন্ধু আসেন। আমি জানালা দিয়ে তাকে দেখতে পাই। কাছে এলে বুঝি আজ তিনি মাদকাসক্ত হননি। মুখ দুর্গন্ধহীন।

বন্ধু এসেই কোনও ভনিতা না করেই বললেন, জীবনে যত পাপ করেছ তা তোমার জীবনের শক্তিকে তুমি চিনতে পারোনি বলেই করেছ। এর থেকে বের হয়ে আসার উপায় আছে।

কিন্তু আমি তত গভীর জলের মাছ নই। ভেদজ্ঞান আমার নিতান্ত নেই বললে কম বলা হবে না। এটা বন্ধুর কথার উপরে আমার মন্তব্য।

বন্ধুর স্ত্রী বলেন, যারা দুর্বোধ শব্দের অর্থ বের করেন তাদের কথা ভেবে দেখো। তারা এটা করেন কেমন করে? তারা অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু কিন্তু সঙ্কেতকে বেছে নেন, মেলা বুদ্ধির ধার ধারেন না। মদের বেলায়ও তাই। নিজেকে হারিয়ে নিজেকে খোজার চেষ্টা। এ সব ভনিতা ছাড়া।

(১৮/১০/২০১৫, ভোর ৪ টা)

এদিন আমার হাতে শুধু কোমল পানিয়ার গিলাস। অন্য সবার হাতে মদ। মদ আমাকে টানে। মদকে আমি ভালোবাসি, মদ আমি ঘৃণা করি। কিন্তু তবুও আমাকে টানে। মদ আমি ছুড়ে ফেলি, আবার টানি। অর্থাৎ আমি আসলে জানি না আমি কি করি। আমি মন্দের ভালো, না ভালোর মন্দ, তা নিয়ে সঙ্কশয় বাড়ছে। গুড আর বেড এর মধ্যে জীবন দুলছে। অজস্র প্রশ্ন এ জীবনে, উত্তর নেই। মানুষে মানুষে বিশ্বাস ও কর্মের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও সবাই যে মাতাল, এই বিশ্বাস আমার সুদৃঢ় হতে থাকে। অর্থাৎ আমি যেনো ক্রমেই এক ঘোরের মধ্যে চলে যেতে থাকি। এমন সময় মিস্টার চুদেত সঙ্কর্ন আমার কোমল পানিয়ার গিলাসে হুইস্কি ঢেলে দিলেন। চুদেত আমাকে কথা দিয়েছেন তাকে প্রতিদিন ইংরেজি শেখানোর বদলে আমাকে এক বোতল মদ দেবেন। কন্ট্রাক্ট মন্দ নয়। অন্তত মূল্যের বিচারে। আমি শুধু হেসেছিলাম সেদিন। মৌনতা কি সব সময় সম্মতির লক্ষণ হয়? হলে মিস্টার চুদেত আমার হাসিকে তার চুক্তি মেনে নেবার ইশারা ভেবে থাকলে তাকে দোষ দেয়া যায় না। ফলে আজ আমার হাতে কোমল পানিয়ার গিলাসে তার বোতল থেকে ক'ফোটা মদ পড়লে তার পক্ষে থেকে সেটা খুব স্বাভাবিক দেখায়। পার্টির 'ইটিকেট' বলে কথা! কিন্তু মদের মত দুর্গন্ধওয়ালা পানিয় গিলে মানুষ কি সুখ পেতে চায় সেটা আমি বুঝিনি। আজও বুঝিনা। আমি মাতাল হয়ে দেখেছি। কোনও আনন্দ পাইনি। সেদিন গান গাওয়ার পরে এক বোতল স্কচ পেলাম। আরেক বোতল বিয়ার। আমি বাসায় আসি। ফ্রিজে ঠান্ডা হতে থাকে বিষ। আমাকে টানে, আমি ফ্রিজ খুলি, দেখি, আবার দরজা বন্ধ করি। কিন্তু আমার মনের দরজার ধারে শয়তান দাড়িয়ে থাকে। সে দরজা বন্ধ হয় না। আমাকে টানে, আমাকে টানে না। আমাকে কাছে ডাকে, আমি আবার দূরে চলে আসি। আমার নিজের মধ্যে এই দিহা ও দন্দের খেলা চলতে থাকে। অর্থাৎ নিজের সঙ্গে যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে কে হারবে, এখনই সেটা বলা আমার পক্ষে ক্রমে কঠিন হয়ে যাচ্ছে। আমি নিশ্চিতভাবেই খুব দৃঢ় চরিত্রের নই। আমার পক্ষে হাল ছেড়ে গডলিকা প্রবাহের সঙ্গে মিশে যাওয়া সম্ভব। আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, আমি আমাকে খুঁজে পাবো তো? নাকি হারিয়ে যাবো, তলিয়ে যাবো?

একদিন একাকিত্ব পেয়ে বসেছিলো আমাকে। আমি তখন রাজধানি ছেড়ে পাহাড়ি শহরে গিয়েছি। হল ছেড়ে, টেবিল টেনিস ছেড়ে, বেডমিন্টন ছেড়ে, আর আমার একান্ত বান্ধবিকে ছেড়ে হঠাত নতুন এক শহরে, যেখানে আমার পরিচিত নেই কেউ। আমি একা। আমার একান্ত বান্ধবিকে ছাড়তে হয়েছিল নিতান্ত বাধ্য হয়ে। নইলে সেদিন ট্রেনে হয়ত আমার সঙ্গে সেও সঙ্গি হতো। সেদিন হয়ত অবিবাহিত তকমাটা ঘুচে যেতো। কারন বিয়ে করবে বলে মামাবাড়ি ছেড়ে আমার হলে উঠে গিয়েছিলো প্রায়। আর একটু হলে তো হলেই থাকতে দিতে হতো! আমার তো অন্য কোনও ঘর ছিলো না! কিন্তু বান্ধবিকে হারাতে হলো। মানে আমি নিজের ইচ্ছেতেই হারিয়েছি তাকে। হারিয়েছি, বেশ করেছি। হারিয়ে তার জীবন ভরে দিয়েছি।

দুঃখ, কষ্টো, বেথা, শোক, সঙ্কশয়, এ রকম না-বোধক হৃদয়বৃত্তির রসায়নে জর্জরিত হয়ে ট্রেনে যখন উঠলাম, রাসেলের সঙ্গে দেখা হলো। সে একটি আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিতে কেমিকেল ইঞ্জিনিয়ার। আমরা একই হলে ছিলাম বেশ কিছুদিন। রাসেল আমাকে একটা সিগারেট দিয়ে বললো, ধরাও।

- ধরাবো? কিন্তু আগে তো কোনওদিন ঠোটে অবধি ছোয়াইনি রাসেল!

■ আরে তাতে কি? আগে কোনওদিন সেক্স করোনি বলে কি কোনওকালে করবে না?

- না, তা না। বাট...

■ আরে ধরিয়েই দেখো না!

আমি ধরিয়েছিলাম। সিগারেট টেনেছিলাম। টানতে টানতে মনে করার চেষ্টা করতাম, আরে, আমি তো একা, আমার বান্ধবিকে হারিয়েছি, তাকে আর পাবোনা, কি লাভ এই জীবনকে ভালোবেসে!

এই কথা আজ ভাবলে হাসি পায়। আমি অনেককে দেখেছি এইভাবে বিড়বিড় করতে। অর্থাৎ ছেকা খেয়ে, সিগারেট ফুকে, আর বলে, শিট! জীবনে কি পালাম! আর আমি নিজের উপরে ওটা জোর করতে চেয়েছিলাম। দেখলাম যে, ধ্যাত! এ তো নিজের সঙ্গে ফাকি দেয়া হচ্ছে। কোনও ভাব-টাবও আসে না, কিস্যু না, দূর ছাই।

অর্থাৎ সামান্য কিছুদিন। কিন্তু না, সিগারেট হেরে গেছে। আমার শুধু মনে হয়েছে, এর চেয়ে আজুইরে খাবার আর হতে পারে না। এর চেয়ে অর্থহীন আর কিছু হতে পারে না। অর্থাৎ একাকিত্ব কাটানোর জন্য সকলে সিগারেট নামের যে বন্ধুর কথা উল্লেখ করেন, তা মিথ্যে করেই করেন। আমার সে রকম ধারণা। আমি একা থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে যে বিরক্ত হয়ে যাই না, তা কিন্তু না। কিন্তু একটু একটু গান গাইতে জানার ফলে আমার কাছে ওই একাকিত্বেরও পরাজয় হয়েছে। সঙ্গিত আমার সম্ভবত একমাত্র বন্ধু। আমি বন্ধু হতে পারিনি কারও সত্য, কিন্তু আমার সে প্রয়োজনটাও আজ ক্ষিন হয়েছে। এ নিয়ে আমার বিস্তারিত আফসোস আছে, অন্তত একজন সত্যিকারের বন্ধু আমার প্রয়োজন ছিলো। না, বন্ধু বলতে আমি, ঘোরার, আড্ডা দেয়ার, মাঝে মাঝে দেখা হওয়ার কাউকে বোঝাতে চাই না। বন্ধু শব্দটা আমার কাছে অনেক লোভের, হুম অনেক চাওয়ারও বটে! কিন্তু সে যখন হলো না, তখন গান গাওয়া, অর্থাৎ সঙ্গিতকে মনের মধ্যে মানুষের রূপে কল্পনা করে কাছে রাখার বাসনায় আমি তার বন্ধু হই। আমার আফসোস এখন অনেক কম।

আচ্ছা যা হোক, আমার এখন মনে হয়, মদের ক্ষেত্রেও বিষয়টা সিগারেটের মত। অর্থহীন। কিন্তু মদের মধ্যে, সিগারেটের মধ্যে কি যেনো একটা আছে, যেটা টানে। আমাকেও টানে। বন্ধুদের সিগারেট খেতে দেখলেও আমারও মনে হয়, খাইনা একটা! কি আর এমন তাতে!

অর্থাৎ বেড়া ডিঙানো হলো মানুষের জন্মগত স্বভাব। মানুষকে যা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়, মানুষের তাতেই যেনো সিমাহীন আগ্রহ। কিন্তু খুদা এমনি এমনি বিরত থাকতে বলেননি। এর মধ্যে অনেক কারন রয়েছে। মন্দের মধ্যে সুখ হলো মরিচিকা। সে সুখ ক্ষনস্থায়ি। এটা আসলে ক্ষতির গুরু। কিন্তু চলে সুখের নামে!

(১৬/৪/২০১৬)

কিন্তু আসক্তি এমন চিঁজ, ছাড়া খুব সহজ নয়। যারা পারেন তারা মহাপুরুষ। অর্থাৎ বেলতলায় যারা বছবার গিয়েছেন, তারা শেষ বেলায় এসে বলছেন, না আর নয়, যদি মাথা ফাটে! অর্থাৎ জহন্নমের ভয়! অন্যায় করতে করতে পেকে ঝুনো হয়ে গেছে এমন সব লোকেই তো বয়সকালে বেশ ধরে। আল্লা-ওয়ালা হয়ে যায়। হুম, হিদায়াত সত্যিকার অর্থে পেয়ে গেলে সেটা অন্য বেপার। কিন্তু হিদায়াত পাবার বিষয়টা বেশভূষায় লুকিয়ে থাকে না, থাকে অন্তরের নিয়তে। সে নিয়ত বোঝার উপায় নেই। তাই মদের গন্ধ নাকে এলে, বা বিড়ির ধোয়া উড়ে গেলে দেহকে অনেক কস্টে না সরিয়ে রাখলেও, মন কিন্তু ছুটে যেতে চায়, বেরিয়ে যেতে চায়। উহ! আর একবার! একটিবার! আহ!

এই হলো ইমানের দ্বৈত সত্তা। তাই ‘ছেড়ে দিয়েছি’ বললেই যেমন একে ছেড়ে দেয়া বোঝায় না, ‘আমি চিরতরে দূরে চলে যাবো’, বললেও থাকে টান। অনেকে সেই টানে যায় কাছে। আমিও গিয়েছিলাম। এই নিয়েই কথা হচ্ছে।

জগত যখন পানির অভাবে পড়েছে প্রচুর, তখন কিছু মানুষ পানি নিয়ে খেলছে। লাখ লাখ লিটার পানি ছিটিয়ে মানুষ ভেজাচ্ছে। গলা ভেজেনা পানিতে কিন্তু দেহ ভিজে যায়। কি খেল দেখাইলিরে সূনা! এ পানি নদীর না খানাখন্দের সেটা জানা নেই, ফলে শরিরে লাগলে কি প্রতিক্রিয়া হয় সেটা ভাবাচ্ছে। শরির গোল্লায় যাক, আসক্তিটা পানির নয় অন্য কিছুর, ফলে শরিরের চিন্তা বাদ দিয়ে সেখানে পৌঁছতে হলো। গিয়ে দেখি, সে মোটে এলাহি কান্ড! হুম এলাহি বটে! ইলাহি এখানে জলের চেয়ে মদ সস্তা করে দিয়েছেন। নইলে যে পরিমান জল গায়ে পড়ছে এখন, তার চেয়ে ঢের বেশি গিলছে কি করে! আমি আমার এক সিনিয়র বন্ধুকে বলেছিলাম, বাশে যতই তেল লাগানো হোক না কেন, ঠিকই দু-চারজন উঠে যাবে। কিন্তু এখানে দেখছি সবাই-ই উঠছে, আসলে উড়ছে। সবাই মহাপতঙ্গের মত উড়ছে। মদ বেশি পড়ে গেলে কি হয় তা জানা ছিলো। আজ একবার দেখলাম নিজের চোখে। তখন ভাবতে থাকি, খুদা তোদের জন্যই মদটারে হারাম করেছেন। নইলে একটু-আধটু চেখে কি আমারও দেখিবার সাধ নাহি জাগে? খুদা-ই তো বলেছেন, এতে কিছু উপকার আছে বটে! কিন্তু তার নমুনা যদি এই হয় তবে তার জন্য খুদার দোষ নেই। তিনি সাবধান করেছেন। আমরা শুনি।

ফানুস

(রাত ১০ টা ৫৫ মিনিট, ২৫/১১/২০১৫)

প্রথমে ভেবেছি দিওয়ালি হচ্ছে। মোহাম্মদকে রেখে ‘আলি আলি’ কিম্বা ‘ইয়ালি ইয়ালি’ করে হেয়ালি করার মিছিলে যেমন লোক সমাগম কম হয় না, তাই ভেবেছিলাম দিওয়ালি সনাতনর ঘর থেকে মুক্তি পেয়ে আজ বৌদ্ধের ঘরে ঠাই পেলো কি না। সনাতনরা বুদ্ধকে আকার দিয়েছে, তাতে বৌদ্ধরা বেজায় খুশি। অনেক বৌদ্ধদের ঘরে সনাতনদের দেবকুলশিরোমনি গানেশাও মূর্তিমান হয়ে উঠেছেন। অবশ্য কে যে আসলে চুড়ায় অবস্থান করেন সেটা সনাতন ধর্মে বোঝা বেশ কঠিন, মুসলিম নাম ধারণ করে নিজ নিজ অধিষ্ঠিত পিরকে যারা সবার উপরে স্থান দেয়, মাঝে মধ্যে মনে হয়

পিরই ভগবান, ভগবানই পির, এ বেপারটাও অনেকটা সে রকম। উপমহাদেশীয় মুসলিমেরা সনাতনদের সঙ্গে একটা বিষয়ে পাল্লা দিয়ে জিতে না গেলেও বলা যায় তারা সার্থক। দিওয়ালির মত করেই তারা শবে বরাতের রাতে মোমবাতি জালাতে শুরু করলো। বেপারটা এখন প্রচুর আমোদে চলতে থাকে শহরে, এমন কি গ্রামেও! শবে বরাত যে আসলে কি সেটা বোঝা গেলো না, কিন্তু রুটি বানিয়ে খাওয়ার পেছাই আকারের এক বিব্রতকর অনুষ্ঠানের আমদানি করেও দরিদ্র মুসলিমেরা যখন নিজেদের ভাগ্যের চাকায় তেমন গতি আনতে পারলো না তখন মনে মনে ভাবতে থাকি, আসলে ওটা অর্থাৎ কপাল হলো উপর-অলার হাতে, রুটি আর মোমবাতি হলো ধর্মের ধুয়ো। কিন্তু যারা এ কুকর্ম করেছিলো, তারা বলতে হবে সার্থক। তারা বেশ ভালোভাবেই আমাদের রক্তে মজ্জায় ধর্মের অপ-বিজ ঢুকিয়ে দিয়ে পেরেছে। শতাব্দি পরে শতাব্দি চলে গেছে, কিন্তু আলো আসেনি। *একদার অন্ধকারে ধর্ম এনে দিয়েছিলো আলো* কই সে আলো?

আজ বৌদ্ধদের বাড়ি বাড়ি অর্থাৎ উঠানে, দেয়ালে, টেরেসে মোমবাতি জালানো দেখে আমার এ রকম না ভাবার কোনও কারন ছিলো না। তখন আবার ভাবছিলাম ঘরে ঘরে আন্দোলন গড়ে তুলেছে না কি এরা? প্রচুর বোমাবাজির শব্দ পাওয়া যাচ্ছিলো। এই যখন ঘনঘটা, তখন মৃত্যু কাধে নিয়ে বের হয়ে দেখলাম, আতশের কারবার চলছে। ঘরে ঘরে বাজি ফুটছে। লাঠির মাথায় গোলা আকারের বাজি থাকে। এর ন্যায়ে আগুন ধরিয়ে দিতে পারলেই হয়েছে, লাফ দিয়ে আকাশে উঠে যায়। তারপর বিচিত্র রঙ চড়িয়ে, নানা কায়দার আওয়াজ ছড়িয়ে বিস্ফারিত হয়ে যায় টাউস বাজিটি। বাজিমাতে! বিগ বেঙ-এর মত। অতিক্ষুদ্র বিন্দু থেকে বিস্ফারন, তারপর মহাবিশ্বের ‘এলিমেন্ট’গুলোর জন্ম, এবঙ জন্ম থেকেই সম্প্রসারণ। পবিত্র কুরআনে এই সম্প্রসারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলছেন – আমরা এই নভোমন্ডল আমি সৃষ্টি করেছি এবঙ একে সম্প্রসারিত করেছি। বিজ্ঞান টেলিস্কোপের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজগতের সম্প্রসারিত হওয়ার কথাটা প্রমাণ করেছে। সময় থেমে থাকতে পারে কি না তাই ভাববার সময় আমার মনে হলো যে হ্যাঁ, তা পারে। ঘটনা যদি থেমে যায় সময়ও থেমে যাবে। কোনও কিছু না ঘটলে সময়ের ধারণা পাওয়া যায় না। ফলে বিগ বেঙ এর আগে আমাদের চেনা-জানা বিশ্বের ‘কনসেপ্ট’ না জানার ফলে আমরা শুধু কল্পনা করতে পারি যে সময়টা ওইখান থেকেই শুরু হয়েছে। ঘটনা ঘটছে, সময় স্রোতের মত বয়ে যাচ্ছে। বাজি ফাটার আগের মুহূর্তের কথা ভাবতে গিয়ে এই আজগুবি চিন্তা মাথায় এসে আমার লেখার প্রসঙ্গ পালটে দিতে চাচ্ছে। শাহনুর থাকলে আমাকে নিশ্চয় বলতো, মুসলিমেরা বিজ্ঞান যখনই কিছু আবিষ্কার করে তখন বলে, এ তো আমাদের কুরআনেই লেখা আছে! এই কথা বলে সে বেটপ রকমের হাসি হাসতো। ভাগ্যিস ছেলেটা এখন আমার কাছে নেই। সে মক্কায় গেছে। আমেরিকা মূলুক হলো আমাদের শাহনুরের মক্কা।

হুম, বিজ্ঞানসাধনা থেকে মুসলিম সমাজ অনেক দূরে সরে এসেছে বলে আজকের এই অপবাদগুলোর বিপক্ষে কড়া জবাবও দেয়া যাচ্ছে না। কিন্তু কুরআন তো বিজ্ঞান কিম্বা ইতিহাসের বই না যে সেখানে ভরে ভরে সবকিছুর বৈজ্ঞানিক বেখ্যা দেয়া থাকবে! কুরআন যেমন মহাকাশ কিম্বা আরও অনেক কিষয় সম্পর্কে অনেক রকম কথা-বার্তা বলে তারপর বলছে যে, এর মধ্যে জ্ঞান মানুষদের জন্য আছে নিদর্শন। মুসলিমরা সে জ্ঞান আহরন না করে কুরআনকে শিকেয় তুলে রেখে দিয়েছে। ভাবছে, এই হলো গিয়ে কুরআনের প্রকৃত সম্মান। ফোটা! ভেগে যা মুর্থ ধর্মধর্জিদের এই আজগুবি ধারণা! কিন্তু ধারণাগুলোর সম্মিলনের রূপই হলো এই - প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙান্তরে যাবে, আর জ্বালিয়ে ছাড়বে। সে যাক। মোমবাতি জালানোর কথা আগেই বলা হয়ে গেছে। এ কি ‘দিওয়ালি’, না ‘আলি আলি’ তখনও কিছু বুঝিনি। কিন্তু ঘোর ভাঙলো। বুঝলাম যা ভেবেছি তা নয়। এ হলো বেবসা।

■ অ্যা! তা কেমন করে হয়?

- হুম। তা হয় বটে। বলছি।

আসলে ঢালাওভাবে একে বেবসা বললে বড়ো অন্যায় করা হয়। কিন্তু বেবসার উর্ধে নয়। সেটা পরের বিষয়। ‘লয় স্ফাটঙ’ বা ‘লয় স্ফাটঙ’ বা ‘লয় স্ফাথঙ’ যাই আমি বলি না কেন সঠিক উচ্চারণটা লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যেমন ‘মা’ শব্দটাকেই ধরুন। না, এটা বাঙলায় মা-এর মত নয়। মা বললে ভাববেন না কেউ আমার কাছে আদর পেতে চাচ্ছে। টোনাল ভাষায় টোনের স্কেলের ভেদে শব্দের মানে হয়। ‘মা’ শব্দকে আমরা ইংরেজি এম এ এ – এভাবে বানান করবো। এখন আপনার যদি সুরের কিছু জ্ঞান থাকে তাহলে সুবিধা হবে বোঝাতে। এখন আপনি হারমোনিয়ামের মুদারার সা, রে, গা, অর্থাৎ মোটামুটি এই ধরনের একটা বোতাম চেপে ধরলে যে কম্পাঙ্কের শব্দ বের হবে, ‘মা’ – শব্দকে এক সেকেন্ডের মত সময় ধরে ওভাবে উচ্চারণ করুন, অর্থাৎ ফ্লাট উচ্চারণ। কোনও ওঠানামা নেই। এ ক্ষেত্রে ‘মা’ – এর অর্থ হবে আসা – টু কাম। এটাকে মিডিয়াম টোন বলে। এবার ‘মা’ – কে আর একটু উপরের দিকে গিয়ে ওই ফ্লাট অর্থাৎ সরলরৈখিকভাবে উচ্চারণ করুন। তখন শব্দটির অর্থ হবে ঘোড়া। এটা হলো হাই টোন। এখন যদি মা – কে মিডিয়াম টোনের কাছাকাছি অবস্থান থেকে উচ্চারণ শুরু করে একটু নিচে নেমে আবার উপরে হাই টোন পর্যন্ত চলে যান, অর্থাৎ সাগরের জলের ঢেউয়ের অপেক্ষাকৃত নিচু অবস্থান থেকে ঢেউয়ের মাথা পর্যন্ত, তবে মা- এর অর্থ হবে কুকুর। এটা রাইজিঙ টোন। যাক তবু ভাগ্য যে, ‘মা’ শব্দটা দিয়ে ছাগলের ডাকের মত এ ভাষায় অমন গমকের খেল নেই। কি ভেঙ্কি দেখালি রে মা!

এ ছাড়াও নিচু স্বরের টোন (লো টোন), পতনশিল (ফলিং) টোন আছে। কিন্তু সব টোনেই যে সব শব্দের অর্থ থাকতে হবে তেমন কোনও কথা নেই। যেমন ‘মা’ শব্দে লো এবঙ ফলিং টোনে কোনও অর্থ হয় না। কিন্তু সাধু সাবধান! ঘোড়ার গাড়ির কথা বললে দেখবেন যেনো শ্রোতা শ্লেজ গাড়ি না সমঝে। ভয় দেখালাম। এরা হাসতে জানে। আমাদের মত রাগ করে না। শিথিয়ে দেয় হাসিমুখে।

শব্দটা শুধু লিখে এর অর্থ বলে দেয়া খুবই কঠিন। সে যা হোক, শব্দের উচ্চারণের ক্লাস করাতে বসিনি, ওটা আমার কাজ নয়। আমি বাঙলা-ই ঠিকঠাক উচ্চারণ করতে হিমশিম খাই।

‘লয় স্ফাটঙ’ এর অর্থ হলো ঝুড়ি পানিতে ভাসিয়ে দেয়া। নদীর পানি হলে ভালো হয়। তাই ভরা পূর্ণিমার সন্ধ্যা থেকে শুরু হওয়া এই বার্ষিক অনুষ্ঠানে ঝুড়ি ভর্তি করে ফুল বা এই জাতীয় কিছু পানিতে ভাসিয়ে দেয়, দেবি দুর্গাকে ত্যাগ করে দেয়ার মতই বেপার-সেপার। কিন্তু না, এর সঙ্গে ওইটার কোনও সম্পর্ক নেই। আর নদি না হয়ে খাল, নালা, পুকুর, খানা কিছু একটা হলেই হলো। অর্থাৎ ভাসিয়ে দেবো- এই পন – সে যেখানেই হোক।

পিঙ নদিতে এই ফুল ভরা ঝুড়ি ভাসাতেই দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে লোক ছুটে আসে। কিসের টানে আসে বোঝা যায় না। কিন্তু আসে। হাজার হাজার সাদা চামড়াওয়ালা পর্যটকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান আলাদা মর্যাদা পায় কি না জানা যায়নি, জানতে পারিনি, কিন্তু দেশের ভান্ডে যে প্রচুর পয়সা জমে, সে আর অবাক করার কি। অর্থাৎ যে বেবসার কথা বলেছিলাম সেটা সিদ্ধিপ্রাপ্ত।

হাজার হাজার ফানুস উড়তে থাকলে অবশ্য সেটা দেখতে মন্দ নয়। নতুনত্ব আছে। আমাদের কাছে। আমি ওই টানেই গিয়েছিলাম। নতুন কিছু দেখবো। সারা শহরেই ফানুস উড়ছে তিনদিন ধরে। লয় স্ফাটঙকে মাঝে মাঝে ফানুস ওড়বার অনুষ্ঠান বলে ভ্রম হতে পারে। তার সঙ্গে ফুটতে থাকে গগনবিদারি বাজি। তা তিমিরবিদারিও। পিঙ নদিতে ঝুড়ি বিসর্জন দেখতে আমি যাইনি। ফানুস ওড়বার জন্য বিশেষায়িত একটা জায়গায় গিয়েছিলাম। গিয়েই পড়লাম বিপদে। টিকেট নেই। এক বছর আগেই

ইন্টারনেটে পশ্চিমা পর্যটকেরা সব টিকেট খরিদ করে নিয়েছেন। আমার মত প্রাচ্যের নাদানের জন্য এ সব প্রোগ্রাম নয়। কিন্তু বাঙালি বলে কথা। উপায় খুজতে লাগলাম। গেটের ছেলেরা অবশ্য অনেকবার হাতজোড় করে ‘সরি সরি’ করেছেন এর আগে। আমাদের দেশে হলে গেটে কি ব্যবহার করতো ভাবছিলাম, ঘাড় ধাক্কা খেয়েছি কি না মনে করছিলাম। আমার আশাপাশের কতজন যে বাঙলাদেশে কোনও টিকেটের গেটে ঘাড় ধাক্কা, লাঠি, লাথি খেয়েছেন ইয়ত্তা নেই। সে যা হোক। আমি উপায় খুজতে শুরু করি। অর্থাৎ গেট ছাড়া অন্য কোনও পথে ঢোকান ব্যবস্থা। হুম, ইউরেকা – পেয়ে গিয়েছি। পাশে জঙ্গল, সেখানে আধার, আর তারের কাটা। আমাকে আর পায় কে! সঙ্গিকে ধরে পার করে দিলাম, বার্মার শান অঙ্গরাজ্য থেকে আসা যুবক-যুবতির দলও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। জঙ্গল পেরিয়ে দঙ্গল ভেতরে প্রবেশ করে। পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াই ভারতে যাওয়ার কথা কোথাও হয়ত বলেছি। আসলে বুঝতে গিয়েছিলাম যে, আসলে কি হয়, পরিস্থিতিটা আসলে কি।

আচ্ছা যা হোক। ভেতরে প্রবেশ করে দেখি বিরাট কান্ড চলছে। প্রথমে মনে হলো সভা চলছে। ছ্যা, এই দেখতে এত কস্টো! কিন্তু না, পরে মনে হলো ধ্যান ট্যান কিছু একটা হবে এখানে, মেডিটেশন। তাও ভালো। কিন্তু কি হলো কিছুই বুঝতে না পেরে ঘুরতে থাকি।

সন্ধেয় গানবাদ্য হয়ে গেছে। ট্রেডিশনাল গান আমার ভালো লাগে। যন্ত্রশিল্পিরা বসে ছিলেন এক পাশে। ঢেকি স্বর্গে গেলেও নাকি ধান ভানে। আমিও ধাক্কা করি কারও সঙ্গে গানের বেপারে একটু যদি কোনওভাবে সঙ্গত করতে পারি। স্যাঙাতের এ ছাড়া আর কি উপায়। আমার সঙ্গিও আর এক ঢেকি। খাওয়ার ধাক্কা তার। খায় না কিছুই, কিন্তু চাহিদা অসিম। এ খাবো, ও খাবো।

আমি মাথা নুইয়ে শিল্পীদের কদর করি। তারাও আমাকে অভিনন্দন জানান। সখ্য হয়। তারপর গান শুনাই - ভ্রমর কইও গিয়া, সুরেও বানির মালা দিয়ে ইত্যাদি।

একজন যন্ত্রশিল্পির শিক্ষক বলেন, তোমাদের গানে প্রচুর ওঠানামা।

আমি মনে মনে বলি, ওঠানামার দেখেছো কি, মুখে বলি, হুম, তোমাদের গান তো পানির মত স্বচ্ছ। আমাদের শাস্ত্রিয় গান একটু জটিল প্রকৃতির। কিন্তু এর রস যে পেয়েছে তার কাছে অন্য সব কিছু ম্যাড়মেড়ে লাগে।

লোকগানের এই শিক্ষক আমাকে বলেন, আমাদের আগে পাচটা টোন ছিলো, এখন সাতটা টোন।

- হুম, তাই তো, ওঠানামা কম। শান্ত স্নিগ্ধ জলের মতন। মন্দ কি। আমাদের শ্রুতি বাইশটা, তা থেকে বারোটা নিয়ে আমরা সপ্তক বেধেছি।

হারমোনিয়াম ওরা চেনে না, আমি কি-বোর্ডের উদাহরণ দেই। ভৈরো আর আশাবরি ঠাট শোনাই তাদের। ওরা অবাক হয়! আমি মনে মনে ভাবি, আরে আমি তো উচ্চাঙ্গ শিখিনি এ বেলায়, আমি হলাম গিয়ে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গিত বোঝা ও পারাদের মধ্যে যারা আমার মতন, অর্থাৎ কিছুই জানে না, তাদের মধ্যে থেকে ডাস্টবিনের পচা খাবারের যেমন স্বাদ, আমি হলাম তাই। পন্ডিত আর ওস্তাদ দেখানি তো, তাই আমাকে দেখে অবাক হচ্ছে।

আমি সুরমন্ডলির মত দেখতে চিন দেশিয় একটা বাদ্যযন্ত্রে হাত লাগাই। সুর তুলতে পারি – পাচটা স্বরে বাধা। ট্যাঙ-টুঙ-টুঙ করতে অসুবিধা হয় না আমার। কিন্তু ওরা শুনে টুঙ হয়ে যায়। মানে, আমি হলে তাই হতাম। ওরা মানুষকে অবমূল্যায়ন করে না। আমরা করি। বাঙালিরা।

হাজার বিশেক লোকের ধ্যান চলছে, পশ্চিমা সাদা চামড়ার বিদেশি আছে ভুরি ভুরি। ওদের জন্যই হয়ত এই অনুষ্ঠান শৌর্যে চমতকার, বির্যে বলবান। ধ্যান শেষ হলে আমিও উঠে সেদিকে যাই। এখন ফানুস উড়বে। বিশ হাজার মানুষের হাত থেকে ফানুস যখন আকাশের দিকে চলবে দেখতে কেমন হবে

তা ভাবতে হবে। আমি দেখেছি। অসম্ভব সুন্দর। চারিদিকে বন, মাঝে বিরাট ফাকা মাঠ, সেখানে জনমানুষের দঙ্গলে কোনও চেচামেচি নেই, বিশৃঙ্খলা নেই, রাগারাগি নেই, পুলিশের দাবড়ানি নেই (যদিও দাবোড় খাওয়ার মত কাজ করা দু-একজন আছে সেখানে!)। ফানুস উড়েছে।

কত টাকার ফানুস? আজ রাতে এই শহরে কত টাকার বাজি ফুটলো? কত টাকার খাবার নস্টো হলো? ইচ্ছেমত খাওয়ার অটেল খাবারের পাশে ছিলাম কিছুক্ষন। কত খাবার! কত বাজি, কত ফানুস, কত টাকার খেলা? হায়, মানুষ আনন্দের জন্য কত দূর থেকে ছুটে এসেছে এখানে, ইউরোপ থেকে, দক্ষিণের অস্ট্রেলিয়া থেকে, আমেরিকা থেকে। শুধু আনন্দ। কি আনন্দ, কি আনন্দ! ভাবছিলাম, আজ এই যে ভরা পূর্ণিমার রাত। কতবড়ো চাদ! আর কত বড়ো বড়ো মানুষেরা ফুটির জন্য টাকা ঢালছে এ রাতে, কিন্তু বাচার জন্য আজ রাতে এ পৃথিবিতে সব মানুষের হাতে কি খাবার কেনার জন্য টাকা আছে? না, নেই। যখন লিখছি তখনও বাইরে বাজির শব্দ হচ্ছে। একটা একটা বাজির দামে এক একটা দরিদ্র এশিয়ান আর আফ্রিকান পরিবারের রাতের খাবার হয়ে যায়। পিঙ নদিতে, কিম্বা খালে-ডোবায় বিসর্জিত হওয়া ফুল সাজানো ঝুড়ির দামে একটি শিশুর বিকল্প দুধের ব্যবস্থা হয়। মায়ের ক্ষুধার্ত বুকে দুধ নেই। কত মায়ের বুকে ক্ষুধার্ত শিশুটির জন্য দুধ নেই আজ রাতে? কত সে সঙ্খ্যা? শির্ন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার লেপ্টে যাওয়া পেটে আজ রাতে কতজনের খাবার নেই? সেই সঙ্খ্যাটা কে বলে দেবে? জানি কেউ বলে দেবে না। সবাই ধ্যানগ্রস্ত, সবাই আনন্দে উল্লসিত, সবাই পৃথিবির চাকচিক্যকে চেনে। অন্ধকার পৃথিবির পুতিগন্ধের খবর এদের কারও জানা নেই। জানার কথা নয়। সেদিন আঙ্কেল সঙ কে বলেছিলাম বাঙলাদেশ নামে একটা দেশ আছে, সেখানে এতো মানুষ প্রতিদিন না খেয়ে থাকে, ভারত নামে একটা দেশ আছে, সে দেশটি পৃথিবির সবচেয়ে বৃহত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দেশ, আফ্রিকা নামে একটি মহাদেশ আছে, ওদের কথা কিস্যু বলার নেই। আঙ্কেল সঙ - এর চোখে আকাশে।

তিনি বলেন, ও মাই গড!

তিনি জানেন না। আসলে কেউ কিস্যু জানেনা। সবাই ভাবে সবাই সুখে আছে।

অজুত-লক্ষ-কোটি ফানুস ছাপিয়ে আমার মুখের সামনে ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর চেহারাগুলো ভাসতে থাকে আজ রাতে।

গানে মোর ইন্দ্রধনু

(রাত ১১ টা ৫৭ মিনিট, ২৯/১০/২০১৫)

আমাকে গানে পায়। আমি গান গাই, কিন্তু গানে আমাকে পায় বলেই গাই। ‘পায়’ বলতে আমি বুঝিয়ে থাকি যে, আমি গাওয়ার জন্য পাগল হয়ে যাই। আমার গানের আমিই শ্রোতা। মাঝে মধ্যে শ্রোতা যে একেবারে জোটে না তা কিন্তু নয়। কিন্তু যখন যা হবার তখন তা না হলে আমার কিছু করার নেই। নিরিবিলি রাস্তায় হেটে হেটে চলার সময় দু-একটা কুকুর পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় আমার দিকে তাকায়। সে আমার গান শুনে, না আমাকে অন্য গ্রহের কেউ ভাবে, সেটা বোঝা যায় না। আর আমার

গান শোনে নিরিবিলি রাস্তার দু'ধারে থাকা সবুজ বৃক্ষের দল। আচার্য বসু প্রমোন করেছিলেন যে বৃক্ষের প্রান আছে, অতএব তারা শুনতে পায় এ কথা এখনও প্রমোন হয়েছে কিনা আমার জানা না থাকলেও আমি মনে মনে ভাবতে থাকি এরা আমার গান শুনতে পাচ্ছে। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। আমার ভাষা ক্ষুরধার হলে সে অনুভূতির কিছুটা আচ এখানে লাগানো যেতো। কিন্তু সবাইকে নিরাশ করতে হলো। আমার গানে রাস্তার কুকুর, পথপাশের বৃক্ষ, পথের ধুলোরা নিরাশ হলো। কারন আমার মনে স্বস্তি নেই। গান শুনিয়ে যখন ভাবছি যে কিছু একটা শুনিয়েছি, তখন মনে হয় আরে! গান তো ভালো গাইনি! মানে আমার নিজের কানে যা বাজতে থাকে তা ম্যাডমেডে লাগে।

আমি গান ভালোবাসি বলে গাই।

■ সে তো যারা গান করে সবাই বলে, অর্থাৎ ভালোবাসে বলে গায়।

এ কথা আমার বন্ধুর। কিন্তু আমি বন্ধুর কথায় একমত হতে পারিনা।

আমি জিজ্ঞেস করি, যারা গান গেয়ে পয়সা নেয় তারাও?

■ কেন নয়? টেলিভিশনের অনুষ্ঠানে তো সে রকমই শুনতে পাই আমরা। ওরা বলবেন যে, এই গানই আমার প্রান! এই গানই আমার জীবন-মরন... ফলে এ কথা বলা যায় যে তারা ভালোবেসে গান করেন।

- ভালোবেসে অর্থাৎ যত্ন করে?

■ হ্যা, তা তো বটেই!

- আচ্ছা পেশাদার শিল্পীদের গান গেয়ে টাকা আয় করার পথ না থাকলেও কি তারা এইভাবে, অর্থাৎ ভালোবাসার কথা বলতে পারতেন?

■ খুলে বল।

আমি বলি, এই গান যাদের জীবন ও মরন, সেই গান যদি তাদের দামি গাড়ি, সুরম্য বাড়ি, অর্থাৎ অনেক টাকা করার পথ বাতলে না দিতো তবে তা এতটা ভালোবাসার পাত্র হতো কি না।

এ কথা শুনে আমার বন্ধু কান চুলকায়।

আমি বলি, শোন, ও সব ভালোবাসা-টাসা হলো ধুয়ো। সব হলো পয়সার খেল। পয়সা দেয় তাই গান করে, একটু যত্ন করেই করে। বাজারে কদর ফুরিয়ে গেলে আর পয়সা পাবে না, তাই যত্নের প্রশ্ন আসে। আপাতত এইটুকুই হলো ভালোবাসা। এর নামই হয় ভালোবাসা।

■ অর্থাৎ তুমি বলতে চাও, পেশাদার শিল্পিরা গানকে ভালোবাসে না?

- আমি এতো পাথর নই যে বলে দেব, এই দুনিয়ায় পেশাদারিত্বের মধ্যে ভালোবাসা নেই। সত্যি বলতে কি পেশাদারিত্বের মধ্যে ভালোবাসা না থাকলে সার্থক পেশাদার হওয়া যায়না। অর্থাৎ ওই নির্দিষ্ট পেশা, অর্থাৎ কাজকে ভালোবাসা। পেশাদার শিল্পিরা গান গাওয়ায়কে কাজই ভাবে। কারন ওটা তাদের পেশা। আর গানের প্রতি যে ভালোবাসা, সঙ্গিত ধারকের হৃদয়ে যে অনুরনন সৃষ্টি করে তাকে নতুন করে প্রতিদিন বাচায়, আর বাচতে শেখায়, সেটার কোনও তুলনা হয়না। পেশাদারের জীবন বাচায় গান বেচা টাকা। আমাদের মননকে রাঙিয়ে তোলে অর্থাৎ বাচায় গানের সুর।

বন্ধু বলেন, আচ্ছা তুমি যদি আজ পেশাদার সঙ্গিত শিল্পি হতে, তবে কি গানকে ভালোবাসতে না?

আমি কৌতুক করি, সেটা পেশাদার না হয়ে কেমন করে বলি!

আমার মধ্যে পেশাদার শিল্পি হওয়ার কোনও লক্ষণ ও সুযোগ দেখতে পাচ্ছি না। আমি সুযোগ চেয়েছি, একজন অলসের পক্ষে নিতান্ত যতটুকু চেষ্টা না করলেই নয়, ততটুকু চেষ্টা আমিও করেছি। কিন্তু সেটা পেশাদার শিল্পি হওয়ার জন্য নয় হয়ত। কিন্তু সেটা অবশ্যই গান গাওয়া, এবণ্ড অন্যকে সেটা শোনানোর জন্য বটে। এর নাম পেশাদারিত্ব কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু আমি ফসকে গেছি। আমার জীবনের একটা মস্ত সমস্যা হলো আমি চামচামি করতে পারিনা। অর্থাৎ ধপাস করে কারও পায়ে

পড়তে আমার দিধা খুব, আপত্তি আরও বেশি। ফলে সঙ্গিত যাদের কাছে গিত হওয়ার পরে আমি সেন্সরে পাশ করবো, তারা আগেই আমার প্রতি বিরাজভাজন হন। আমার কপাল। ফলে ব্যর্থ হয়ে ঘরে ফিরি, আর ঘরময় পায়চারি করে গান গাই। সারা ঘর আমার গানে গুমগুম করে ওঠে। ঘরের দেয়াল, বাথরুমের দরজা, জানালার কাচ, সবকিছু আমার গান শুনতে থাকে, তখন আমার কেন জানি মনে হয়, এরা জিবন্ত। আমি তখন এদেরকে মানুষ করে তুলি। এরা তখন মানুষের সমুদ্রে পরিনত হয়ে যায়। আমার মনে হয় আমি লক্ষ কোটি দর্শকের সামনে গান গাচ্ছি। আমার বেদনা উপশম হয়।

(৬/ ১/ ২০১৬)

এই যখন অবস্থা, তখন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একদিন দেখা। দেখা অর্থ একেবারে সাক্ষাত। যমের ঘর থেকে ফিরে উনি কেমন করে সাক্ষাত করতে এলেন তার উত্তর হচ্ছে - স্বপ্ন। না, রবিন্দ্রনাথের মত প্লানচেটে বিশ্বাসি আমি নই। ওইসব উদ্ভটে আমার ইচ্ছে নেই। থোড়া তামুক মাঝে মধ্যে ইচ্ছে হলেও প্লানচেটে মতি হয় না আমার। অতএব স্বপ্নই ভরসা। তো হেমন্ত কুমারকে দেখার সুযোগ হয়ে গেলো। উনি উদয় হবার আগে অবশ্য বড়ো রকম তাড়া খেয়েছি গান গাইতে গিয়ে। সঙ্গিত পরিচালক বললেন, আরে কি ম্যাও ম্যাও করো, বি বোল্ড, আরও আবেগ চাই, আরও আরও। আমি যেনো দেখতে পেলাম ‘আকেলে হাম আকেলে তুম’ সিনেমার নায়ক আমির খানের গান রেকর্ড করার সেই দৃশ্য। ভেজাল সঙ্গিত পরিচালকের কিছুতেই আমিরের গান পছন্দ হচ্ছিলো না। সেই লোক আমিরের আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলা শুরু করে দিলে আমির রেগে মেগে স্টুডিও থেকে বের হয়ে আসেন। অবশ্য এই সিনেমার সত্যিকারের সঙ্গিত পরিচালকের প্রায় সব হিটো গানই অন্য গান থেকে চুরি করা। বাঘা চোর যাকে বলে। সেটা অন্য প্রসঙ্গ। আমার স্বপ্নের সঙ্গিত পরিচালক আবেগ দেখাচ্ছেন হাত নেড়ে নেড়ে। মনে হচ্ছে ভুড়িটা তরঙায়িত হচ্ছে উর্মিমালার মত, হাতে ভিমের গদা, চোখে রক্তরাগ – আবেগ বলে কথা!

আমি তখন ভয়ে ভয়ে আবেগ ঢালতে গিয়ে সুর বেসুরো করে ফেলি, সিনেমার আমির খানের মত। বিছানায় মুদ্রত্যাগের মত সুরের আবেগের স্রোতের তোড়ে আমার কপাল ভিজে যায়, কিন্তু মওলা খুশি হন না। তার যে কি চাই, সে আমি ততক্ষণে বুঝে যাই। স্বপ্নে বোঝা কঠিন নয়। স্বপ্নে উপলক্ষ থাকে। আমার এই স্বপ্নেও তা আছে। আমার পরের সিরিয়ালে যার গাইতে হবে তিনি সুন্দরি ও যুবতি। পোশাকে পরিচ্ছদে, আর মুখের চামড়ার জন্য তিনি যত সময় ব্যয় করেন বলে আমার মনে হলো, সে সময়ের কিছু অংশ রেওয়াজে ব্যয় করলে দেশের জন্য বড্ড কাজ হতো। কিন্তু না, ইনি দেহ দোলাবেন এ কথা বুঝতে পারছি। অর্থাৎ শরির দিয়ে শুধু নৃত্য নয়, গানও বটে! সঙ্গিত পরিচালক এনার অপেক্ষা করছেন। আমার কপাল ভিজবে না তো চন্ডি ভিজবে?

আমি এই তন্ময় সুন্দরির সঙ্গে গান নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করি। অবশ্য তিনি যতটা না সুন্দরি, তত বেশি আহলাদিত, যত না গুনি, তার চেয়ে ঢের বেশি গুনপনাপ্রদর্শিনি। এর ভাবনা অনেক উপরে। অর্থাৎ এখনই আপনাকে কহেন তারকা। পরে যে কি হবে আল্লা মালুম।

অতএব কপালকে সঙ্গি করে সঙ্গিতগৃহ ত্যাগ।

তখন দেখি আমি কোথায় যেনো বসে আছি। আর আমার সামনে হেমন্ত কুমার - হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। আমাদের বাঙলা গান ও ভারতবর্ষের প্রানের হিন্দি গানের মহান কালাকার।

উনি আমাকে প্রথমেই বললেন, মন খারাপ করো’না বাছা। তোমার অ-সুখের কারন আমি জানি। আচ্ছা গাও তো দেখি পৃথিবির গান আকাশ কি মনে রাখে। আমি গাই। আবেগে আমার শরিরের রোম শিহরিত হয়।

সেই আবেগেই বলে ফেলি, সার, কিন্তু এই গানে তো মেলা রকম ভুল ধরলেন উনি। অর্থাৎ আমার গায়কি! আমার নাকি এই গান গাওয়া হয়নি, তাই বিস্তর ভুল ধরলেন উনি। উনি বললেন, যার যেমন কাজ তাকে তা করতে দাও বাছা। আমি নিশ্চিত, এখানে হেমন্তজির বদলে অন্য কেউ অর্থাৎ আমাদের হালের ধজাধারি ধড়িবাজ গায়কদের কেউ হলে আমাকে বলতেন, আরে গানের ও কি জানে! না, আমার গান কেউ মনে রাখেনি। কিন্তু আকাশ মনে রেখেছে। পৃথিবির কোনও শব্দই হারায় না। সুন্দর গানের শব্দ আরও। অসুন্দর গানের শব্দ আরও। দ্বিতীয়টির কপালে বিচার আছে। কেন এদের জন্ম হলো এ নিয়ে বিচার বসবে। হারাবে না। কিছুই হারাবে না। পালাতে পারা যাবে না। কিছুই পালাতে পারবে না। ধরা খেয়ে যাবে একদিন।

আমার এক বান্ধবি অনেক বড়ো শিল্পি। উনি আমার জন্য যথেষ্ট করতে চেয়েছেন। কিন্তু যা হোক, একজন জাত অলসের পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব, সে চেষ্টা আমি যে করেছি, তা আগেই বলে রেখেছি। তো, সেই সুত্র ধরে তিনি একজনের কাছে আমাকে পাঠালেন। তিনিও তার সময়কার বেশ জনপ্রিয় গায়ক। সবাইকে শিল্পি বলতে আমার প্রচুর আপত্তি। তিনি নিশ্চয় যথেষ্ট বড়ো গায়ক। স্যাটেলাইট টিভির যুগে গান এখন তরতর করে খই ফোটোর মত বের হয় টিভির বাক্স থেকে। এখন তো আবার আর বাক্সের যুগ নেই। অতি আধুনিক টিভি তৈরি হচ্ছে দুনিয়ায়। সেই টিভিতে যে-সেইকে-ই দেখতে পাচ্ছি গান গাইছে। আমিও বা পিছে পড়ে থাকি কেন? অতএব তার কাছে যাওয়া। এক সময়ের এই জনপ্রিয় গায়ক অপরিচিত গায়কদের নিয়ে একটি টিভি চ্যানেলে অনুষ্ঠান করতেন। অনেক আশায় আমার বান্ধবির রেফারেন্স সহকারে তার কাছে গেলাম। কিন্তু *পৃথিবির গান আকাশ কি মনে রাখে...*, এই মহান গানটিকে তিনি যেভাবে গাইতে শেখালেন আমাকে, আমার মনে মনে বললাম, হে হেমন্ত! হে অজস্র সুরের ও গানের মহান সঙ্গীতকার হেমন্ত কুমার, হে মায়াবি কণ্ঠের জাদুকর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কেন সে রাতে তুমি আমাকে গলা টিপে হত্যা করলে না? কেন শুধু এসে মিছেমিছি আমাকে সান্তনা আর স্নেহ দিয়ে চলে গিয়েছিলে! ম্যাকবেথ ঘুমকে হত্যা করেছিলো, তুমি আমার সুরকে হত্যা করে দিলে না কেন হে কালাকার?

(২৫/৩/২০১৬, সিঙ্গাপুর)

ভাষা না বুঝেও হাত তালি দিলো কেন ওরা? কেন আবার আরও ক'খানা ঝেড়ে দিতে বললো, মানে গাইতে বললো? কি বুঝে তারা আমাকে অনুরোধ করেছে জানিনা, স্থানীয় লোকগানের এই দলে যন্ত্রপাতির অভাব নেই। পুরোনো যন্ত্রপাতির সঙ্গে সঙ্গত করে একেবারে আধুনিক সব বাদ্যযন্ত্র। ফলে অনুসঙ্গটা অন্যরকম। গান শেষ হলে বৃদ্ধ পান্ডা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরেন। পরের দিন আবার যেনো অবধারিত ভাবেই গাইতে যাই এই নিশ্চয়তা আদায় করে নেন উনি!

বাহ!

এই হলো আমার গানের পুরস্কার।

জীবনে বেশ ক'খানা বস্তুময় পুরস্কার পেয়েছিলাম। অর্থাৎ ধরা ছোয়া যায় এমন পুরস্কার – বই, খাতা, কলম, স্কেল, রবার, থালা, বাটি, গিলাস, জগ, মগ, দসু্য, হানাদার, ষন্ড, লন্ড ভন্ড ধ্যাততেরি কি কইতে কি কই, মেডেল, ট্রফি, টাকা, আর এক গাদা *স্বিকৃতির সনদপত্র*! একবার তো কেমন করে জানি দেশের এক প্রধানমন্ত্রির কাছ থেকেও একখানা পুরস্কার পেয়ে গেলাম – সোনায ধোয়া পানিতে রূপোর বাঙলাদেশ চ্যাম্পিয়ন মেডেল – অর্থাৎ কিনা সোনার মেডেল! আমার চ্যাম্পিয়নশিপও ওই সোনা ধোয়া জলের মত। অর্থাৎ ভেতরে খড়খড়ি। কিন্তু আমি আজও বিশ্বাস করি, মানুষের ভালোবাসার চেয়ে বড়ো

পুরস্কার হতে পারে না। কিন্তু প্রকৃত ভালোবাসা কেন জানি দূরে চলে গেছে, অনেক দূরে, বহু দূরে। মানুষ ভালোবাসে মুখে মুখে।

তবে সবকিছু ছাপিয়ে একটি পুরস্কারের কথা আমার লিখতে ইচ্ছে করছে। তখন আমি ক্লাস নাইনে উঠেছি। টেলেন্টপুলে রুত্তি পেয়ে নাইনে উঠেই হাফিজ সারের তোপের মুখে। উনি অফের খুব ভালো শিক্ষক। বেতের বাড়ি দেবার জন্যও সারের খুব নাম। কি জানি, এখন কি আগের মত পেদাতে পারেন সার?

■ পেটালে মামলা হয়ে যাবে না! বলো কি!

- তা ঠিক, আইন হয়েছে বুঝি? কিন্তু না পেটালে কি ছাত্র শাসন হয়? হওয়া সম্ভব?

■ রড এখন স্পেয়ার্ড। ফলে ছাত্ররা স্পয়েন্ড। আচ্ছা বলে যাও।

ক্লাসে জ্যামিতির একটা *এক্সট্রা* ধরিয়ে দিলেন সার। পরের দিন জমা করতে হবে। এই সঙ্গে সার বললেন, যে বা যারা পারবে, তার বা তাদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে।

গান গেয়ে পুরস্কার পেতে পেতে বদঅভ্যেস হয়ে গিয়েছিলো। এই লোভেই কি না জানি না রাতে বাড়িতে বেশ চেষ্টা করে *এক্সট্রা*টা করে ফেললাম।

পরের দিন।

সরদার হাফিজ উদ্দিন, অর্থাৎ হাফিজ সারের ক্লাস। তিনি *অ্যাসাইনমেন্ট* চাইলেন।

হোমওয়ার্ক ডান? হাও মেনি?

ক্লাসে শুধু আমিই পেরেছিলাম সেই *ওয়ার্ক*ক ডান করতে। এবার কিন্তু পুরো ক্লাস সারকে স্মরণ করিয়ে দিলো পুরস্কারের কথা। সার বললেন, ঠিক। আমাকে সামনে ডাকা হলো। সার এবার পুরস্কার ঘোষণা করছেন –

আমি খুব খুশি হয়েছি জানো। তুমিই আজকের ক্লাসে সবচেয়ে ভালো ছাত্র! এই হলো তোমার পুরস্কার। একজন মানুষের সঙগ্রহে এর চেয়ে আর কটা ভালো পুরস্কার থাকতে পারে? বলা বাহুল্য এটিই হলো আমার জীবনের সবচেয়ে বড়ো পুরস্কার। বাকি সব পুরস্কার এর কাছে নসি।

পুরস্কার আরও একদিন পেয়েছিলাম, সেটা একটু অন্যরকম। তখন ‘ইয়ো ইয়ো’ নামের এক খেলার ‘হাইপ’ চলছে। এখন হাইপ-এ ডাইভ দেবার মত তেমন টাইপ না হলেও তখন নিশ্চয় ছিলাম। নইলে কেমন করে আমার হাতেও একটা ‘ইয়ো ইয়ো’ এর সুতো এলো? আমি সুতো দিয়ে মারি টান, আর ভারি চাকতিটা গোটাতে থাকে, আস্তে আস্তে হাতের কাছে চলে আসে, তখন আবার অভিকর্ষজ বলের সাম্রাজ্যবাদ শুরু হয়। অর্থাৎ চাকতিটা সুতো বেয়ে নিচে নামতে থাকে। এভাবেই চলতে থাকে খেলা। জঘন্য! কিন্তু জঘন্য বলে দুনিয়ায় যা কিছু আছে, তাদের কোনওকিছুকেই স্বভাবের নিষ্কিতে মেপে নিতে বাদ রাখেনি মানুষ। আমিও। পেলাই করেছি যা পেয়েছি। সব কিছুতে এত আগ্রহ দেখাতে গিয়ে আমি কখন তলানিতে পড়ে গেছি টের পাইনি। যখন পেয়েছি, তখন আগ্রহের নেশা আমাকে গ্রাস করেছে। আমি এখন আর এ থেকে বের হতে চাই না। টেনিস-বেডমিন্টন-ক্রিকেট-গলফ-দাবা-ফুটবল-বাস্কেটবল-পিঙপঙ-পেতাঙ মায় গোলাছুট, কিম্বা রক-মেলো-রবিন্দ্র-নজরুল-লোক-ভক্তি মিলিয়ে ঝুলিয়ে আমি হয়ে উঠেছি, কি যে হয়ে উঠেছি সেটা এখন আর মুখ্য নয়। কিছুই হতে পারিনি এটাই সত্য হয়ে গেছে। সত্য প্রতিষ্ঠিত।

গান গেয়ে দেশ সেরা হয়ে স্কুলে ফিরে বুক ইয়া বড়ো। ফলে ‘ইয়ো ইয়ো’-এর সুতায় টান মারছিলাম ক্লাসে, ভয়হিন, শঙ্কাশূন্য। সার তখন আসেননি। পাশের ক্লাসে নিরঞ্জন সার সমাজের ক্লাস নিচ্ছিলেন। বলে রাখি, সঙ্গিতে এর বাধ না মানা আগ্রহ। স্কুলের প্রতিযোগিতায় নিরঞ্জন সার হলেন ম্যানেজার। তিনি নিজেও গাইতেন, তার মেয়ে, যে আমার সতির্থ ছিলো, সেও গাইতো প্রতিযোগিতায়। কিন্তু স্কুলের প্রতিযোগিতা মানে প্রথম পুরস্কার গুলো আমার ঘটে, এটা যেনো আমার সময়ে অবধারিত হয়ে ছিলো। আমাদেরকে ইঙরেজি পড়াতেন নজরুল সার। তিনি আমাকে বলতেন, এক কাজ করো, তুমি আগেই

পুরস্কারগুলো নিয়ে নাও না কেন, কি দরকার বিচার করে, ফল তো আমার জানা! মাঝে মাঝে মত হতো চিরকুমার ইঙরেজির এই শিক্ষক আমাকে ভালোবাসতেন আর স্নেহ করতেন তারই কাল্পনিক সন্তানের মত। গান গেয়ে আমার যা কিছু ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর স্বিকৃতি ও পুরস্কার জুটেছে এই ভঙ্গুর জীবনে, নজরুল সারাই হলেন পেছনের আসল কারিগর। কৃতিত্ব আমার কিছুই নয়, সবটুকু আসলে তারই। অবশ্য নজরুল স্যারের সঙ্গে ডাবলু ভাইয়া ও আমার নাম উচ্চারণ না করলে নিতান্ত অন্যায় হবে। একজন আদর্শ শিক্ষক খুব ভালো করে জানেন তার ছাত্রকে কিভাবে অনুপ্রানিত করতে হয়। কিন্তু সেইসব শিক্ষকেরা এখন কই? নস্টামি, অসাধুতা, ফাকিবাজি করে নিজের পেট চালানো যায়, একজন ভালো শিক্ষক হওয়া যায় না। ছাত্রদের ভালোবাসাও কি যায় পাওয়া? স্কুলে এখন কারা শিক্ষা দিচ্ছেন ছেলেদের? তারা কারা? জানি না। সত্যিই জানি না। তবে, তবেটা অন্যদিন বলব, যদি জানতে পারি। তবে অযোগ্যতা, সজনপ্রতি, লেজুড়বৃত্তি, ফাকিবাজি, অপ-রাজনিতির বেহায়াপনা, সুবিধাবাদি - ইত্যাদি শব্দগুলো এখন নাকি আর স্কুলের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্তির পথে বাধা নয়!

আচ্ছা যা হোক।

সমাজের ক্লাসে নিরঞ্জন স্যারের লেকচার চলছিলো। স্কুলে বড়ো হলরুমের মাঝে চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে কয়েকটি ক্লাস ভাগ করা হতো। অনুষ্ঠানের সময় এই বেড়া তুলে ফেলা হতো। ‘ইয়ো ইয়ো’টা হাত থেকে নিচে-উপরে করছিলো তখন। বেড়ায় একটা ছিদ্র দেখতে পেলাম। ভাবলাম ‘ইয়ো ইয়ো’-এর চাকতিটা ছিদ্র দিয়ে গলিয়ে দেবার চেষ্টা করলে কেমন হয়! বড়ো রোমান্টিক হবে নিশ্চয়! এ রকম ফালতু বিবেকহীন রোমানস করেছিলাম আর একবার। এর জন্য যে আফসোস ও দুঃখ এখনও আমার হয়, তা কিছুতেই, কোনও কিছুতেই শেষ হবার নয়। এমন কি এখনও যে প্রায়শ্চিত্ত আমি করে চলেছি, তা দিয়েও সেই বিবেকহীন কাজের কোনও বিনিময়ই হয় না। বন্দুক দিয়ে পাখি শিকার হলো আমার রক্তে। সেই রক্তের খন শোধ করতেই কি না জানি না, পাখি শিকারে বের হোলাম। বন্দুক না, এয়ারগান নিয়ে। আম গাছে টিয়াপাখির দুই সখা-সখি বসে নৃত্য ও আনন্দক্রিড়া করছিলো। ভাবলাম, দেখাচ্ছি মজা! গুলি ছুড়লাম। একটি কুপোকাত হয়ে গেলো, ঝুলে রইলো ডালে। অন্যটির কান্না যদি আর কেউ সেদিন দেখতো তবে বুঝতো প্রিয়জন হারাবার বেদনা কত মর্মান্তিক! আমি বুঝেছিলাম। কিন্তু বুঝে কি হবে! যা হবার তা তো হয়ে গেছে। মৃত পাখিটিকে ফিরিয়ে দেয়া আর কখনওই সম্ভব নয়। আজ নিশ্চিত জোড়ার সেই পাখিটিও বেচে নেই, আজ থেকে তেইশ বছর আগের কথা। কিন্তু হত্যা করার পর যে অনুশোচনায় আজও আমি ভুগে চলেছি, তাকে ভুলে থাকবো এমন দাওয়া আমার জানা নেই। সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আর কোনওদিন পাখি মারবো না, আর কোনওদিন পাখির মাণ্ডশ খাবো না। আমি সেই প্রতিজ্ঞা আজও রক্ষা করে চলেছি, কিন্তু মন থেকে কস্টোটা কে দূর করে দেবে আমাকে? রোমান্টিসিজম ভালো কথা, কিন্তু অন্যের কস্টের ও বেদনার কারন হবার দায়ে যে শাস্তি পাওয়া উচিত সে শাস্তি পেতে হবে। পেতেই হবে। আমি পাচ্ছি।

‘ইয়ো ইয়ো’ চাকতিটি বেড়ার ফুটোর মধ্যে চালিয়ে দিতে কয়েকবারের চেষ্টায় সফল হোলাম। ক্লাসের সবাই ‘হে.....ই’ করে উঠলো। কিন্তু ততক্ষণে নিরঞ্জন স্যারের লেকচার আর কানে আসছে না। কেন আসছে না? কেন নিরঞ্জন সার সমাজ পড়ানো বন্ধ করলেন? বোঝা গেলো যখন কিছু পরে স্কুলের অফিসের দফতরি এলেন আমাকে তলব করতে। সমন জারি হয়ে গেছে। অর্থাৎ সোজা হেডসার সৈয়দ শামছুর রহমানের কক্ষ। হেডসার তো নন, সাক্ষাত জমদুত! তার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে এমন মানুষ নেই। আমার বড়োকাকা খন্দকার মকবুল হোসেনও জাদরেল ইঙরেজি শিক্ষক ছিলেন। তাকেও ছাত্ররা যমের মত সম্মান ও ভয় করতো। আমার বড়োকাকা আমার হেড স্যারের কাছে

মেনি বিড়াল। আমার হেডসার যে বড়োকাকারও শিক্ষক! আমার জীবনে হেড স্যারের মত এই রকম বাঙালি সুপুরুষ আমি দেখিনি। সুপুরুষ বলতে সত্যিকারে যা যা বোঝায়, তিনি ছিলেন বাঘের মত – একেবারে যেনো রয়েল বেঙ্গল টাইগার - শরিরে, চেহারায়ে, মেজাজে, সততায়। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে ডাবল এমএ করা এই মহান মানুষটি কেমন করে এত আদর করতেন আমাকে, এখন ভাবি, সম্মানে আর বিস্ময়ে আমার দু’চোখ ভিজে যায়।

সেবার নাইনে উঠলাম। রেজিস্ট্রেশন করার তারিখ পড়লো। বোর্ডের তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য নাইনে উঠলেই এই কাজ করতে হয় সব ছাত্রকে। সকাল দশটায় স্কুলে পৌঁছনোর কথা ছিলো। আমি ভাবলাম, কি আর এমন, যাই ধিরে সুস্থে। হেলেদুলে হাটতে হাটতে যাচ্ছি, এখানে দাড়াই, ওখানে বসি। বাশবনের কুয়ো পাখিটা কেমন করে ডাকে, সেটা দাড়িয়ে শুনি, পাশের খানার টাকি মাছের বাচ্চাগুলোর দৌড়ানি দেখি বেঘোরে তাকিয়ে, অপার বিস্ময়ে, সুতির বিল দিয়ে উড়ে যাওয়া পাখিদের দলের ‘ভি’ আকারের সারি দেখি, সঙখ্যাটা গুনতে চেষ্টা করি, হারিয়ে ফেলি, আবার গুনি, আবার হাটি। কোনও তাড়া-ই যেনো নেই।

দূর থেকে দেখি কে যেনো একজন সাইকেল চালিয়ে আসছে। রাস্তা দিয়ে কতজনই সাইকেল চালিয়ে যায়। কিন্তু দূরত্ব যত কমতে থাকে আমার দৃষ্টির অনুভূতি মনের ভেতরে গদার পিটুনি দিতে থাকে। ইনি আর কেউ নন, চিরকালের শুভ্র পাঞ্জাবি-পায়জামা পরিহিত স্বয়ং হেডসার সৈয়দ শামছুর রহমান! আমার দেরি দেখে ওই বৃদ্ধ বয়সে তিনি আমাকে তলব করতে নিজে সাইকেলে চড়ে আমার বাড়ির দিকে চলেছিলেন! হেডসারের সাইকেল থামলো। তার সঙ্গে ওইখানে আমার কথা হচ্ছে –

■ দেরি किसর জন্য? (অত্যন্ত হৃষ্কার দিয়ে, এই হৃষ্কারের শব্দ বেখ্যা করার মত কিছু এই পৃথিবিতে নেই।)

আমি চুপ করে মাথা নিচু করে দাড়িয়ে রইলাম।

হেডসার তখন আরও বিপুল গর্জনে বললেন, এহোনো দাড়ায়ে আছে! ওঠ সাইকেলে!

সেই বৃদ্ধ পন্ডিত আমাকে সাইকেলে তুলে নিয়ে স্কুলে গেলেন। তিনি তো স্কুলের অন্য কাউকে পাঠাতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তিনি নিজে কেন গিয়েছিলেন আমাকে নিয়ে যেতে?

আমি এরপর থেকে জীবনে খুব যে ভালো কাজ করেছি তা নয়। কিন্তু আমি জীবনে লেট করিনি। আমি এখন সকাল দশটা বলতে সকাল দশটা-ই বুঝে থাকি, দশটা এক নয়! কাউকে সময় দিলে আমি নিরানন্দের শতাংশ ক্ষেত্রে সঠিক।

আজ বাশের বেড়ার ছিদ্র দিয়ে ‘ইয়ো ইয়ো’ গলানোর অপরাধে আমি তার সামনে দাড়িয়ে। ‘সবুর! বেত কই! এরে পিটেয়ে আজকে মাইরেই ফেলাবো!’

সবুর হলেন আমাদের সবুর দাদা, স্কুলের দফতরি, এই স্কুলের একজন অন্যতম জমিদাতা। আর আমার কাছে এর সবচেয়ে বড়ো পরিচয় হলো ইনি মামুন কাকার বাবা। মামুন কাকা পঞ্চাশ ছুইছুই। আত্মীয়তার সম্পর্ক নিয়ে কিন্তু বলতে গেলে উনি আমার কেউ হন না। কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক দিয়ে আত্মিক বিচার চলে না বলেই মামুন কাকা হলেন আমার অন্যতম একটি আগ্রহের বিষয়, আমাদের সবার চিন্তার মধ্যমনি। অবশ্য তেমনটা হওয়া জরুরি। মামুন কাকার দাবি, আমি নাকি এখন তার বাপ! বয়েসে অনেক ছোটো আমি তার। কিন্তু বয়সের ফারাক আমাদের কাছে আসার পথটাকে রুখতে পারেনি বলেই তার এমন দাবি। মহান আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন মানুষ রূপে কিন্তু তবুও তিনি পৃথিবির কোনও কাজ নিজের হাতে করতে পারেন না, নিজের পায়ে চলতে পারেন না, পানি মুখে তুলে পান করতে পারেন না, একা পেশাব-পায়খানা করতে পারেন না, দাড়াতে পারেন না, বসতে পারেন না, শুতেও পারেন না। লিখতে পারেন না, একা নড়তেও পারেন না। তার শরির সম্পর্কে বর্ণনা দেবার ক্ষমতা আমার নেই। ইনি শুধু চোখ দিয়ে নিজে থেকে পৃথিবিকে দেখতে পারেন অপলক। কাঠের চেয়ারে সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ভাঙা বারান্দায় তাকে বসিয়ে রাখা হয়। সেটা ঠিক বসা না কি, এটা

নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এই বারান্দা হলো তার পৃথিবী। রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়া প্রতিদিনের মানুষ দেখে দেখে এই পৃথিবীর রূপ-রস সঙগ্রহ করেন তিনি। চারিদিক ঘুরে ঘুরে দেখার তার আছে অসিম আকাঙ্ক্ষা। তার শরিরের বিরাট অস্বাভাবিকতা তাকে নড়তে অবধি দিতে চায় না, কিন্তু তার রয়েছে সাগরের মত বিস্তীর্ণ হৃদয়। সেই সাগরে তিনি ভ্রমণ করেন, মানসচক্ষে তিনি চলে যান সুন্দরবনে, ভৈরবের তিরে, ষাটগুম্বজ মসজিদে। ওই চোখই তার ভরসা। ওই চোখই তাকে তৃষ্ণার্ত বানিয়েছে, ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোতে ইচ্ছে যুগিয়েছে, যুগের পর যুগ ভাঙা বারান্দার কাঠের চেয়ারে বসে বসে বিকৃত নিতম্বের পচে গলে যাওয়া চর্মের যন্ত্রনা থেকে মুক্তি পাওয়ার কথা বলে গেছে কানে কানে, চুপি চুপি। মামুন কাকার চুপিসারের পৃথিবির আরও আরও ইচ্ছের কথা জানে শুধু আর একজন। সে আমি। প্রশ্ন জাগে এই দীর্ঘ সময়ে কেমন করে তাকে প্রতিপালিত করা গেলো? মহান আল্লাহ রব, তিনি প্রতিপালন করেন, কিন্তু যে মানুষটি এই কাজ করে গেছেন নিজের জীবনের সমস্ত সাধ আহলাদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তিনি আজ কই? সৃষ্টিকর্তা মা-বাবাকে এমন টিস্যু-কলায় কেন যে সৃষ্টি করেছেন সেটা এক অপার বিস্ময়। এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর নিরবে নিভৃতে একজন মামুনকে পৃথিবির সব কাজ, সব কিছুই যাকে নিজের হাতে করে দিতে হয়েছে তিনি সবুর দাদার স্ত্রী, মামুন কাকার আম্মা। কেমন করে পারলেন তিনি? এই ইতিহাস লেখা কারও পক্ষেই সম্ভব না। মায়ের কাছে কোনও সন্তানই তুচ্ছ নয়, এবঙ মামুন কাকার মায়ের উদাহরনের চেয়ে বড়ো কিছু এই পৃথিবিতে আমার কাছে অন্তত নেই। স্কুলের জমিদাতা সবুর দাদা, স্কুলের দফতরি সবুর দাদা, অর্থাৎ পঞ্চাশ বছরে অসাড় শিশু মামুনকাকার কর্তব্যনিষ্ঠ বাবা সবুর দাদা গত হয়েছেন, পেছনে রেখে গেছেন বিরাট এক পৃথিবী, সেখানে বয়েসে, অসুখে, সেবার কুজো হয়ে যাওয়া একজন মায়ের ঘাড়ে দ্বিগুন দায়িত্ব পড়ে গেছে। কি হবে এই বৃদ্ধার এখন? নিজেই চলতে পারেন না, কেমন করে তিনি শতশত যুগ এমন করে সেবা দিয়ে গেলেন? আর এখন এই বৃদ্ধার নিজেরই সেবা প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। কেমন করে মামুন কাকার প্রতিপালন হবে, দেখভাল হবে কেমন করে হবে এই বৃদ্ধার? মুখের বাকা হাড়ের কারণে কথাও ঠিকমত বের হয় না একজন মামুনের। তবুও সেই মুখে হাসির ফোয়ারা ফুটিয়ে তিনি বলেন, হবেনে একটা ব্যবস্থা, আল্লা আছে না উপরে!

হেডসারের মেজাজ একেবারে প্রথম আসমানের গ্রহ তারা ছাড়িয়ে উঠে গিয়ে তখন মনে হয় চতুর্থ-পঞ্চমে অবস্থান করছে। সব শিক্ষকেরা পাশের কক্ষ থেকে খুবই নিবিস্টমনে পর্যবেক্ষণ ও অপেক্ষা করছেন পরবর্তী ঘটনাগুলোর জন্য। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা তখন বারান্দায় চলে এসেছে ক্লাস ছেড়ে। চারিদিকে থমথমে অবস্থা।

হেড স্যারের পিএ সবুর দাদা বললেন, সার আইজকে কিছু কন না, বুঝতি পারিনি মনে অয়, আর করবে নানে!

সবুর দাদা উপযাজক হয়েও আমাকে বললেন, আর কিন্তু এই সব কইরেনা, বুইঝলে?

কিন্তু ওকালতিতে কাজ হলো না। হেড সার ততক্ষণত ততধিক হুঙ্কার দিয়ে বললেন, সবুর, বেত আনো!

হেড স্যারের হাতে জোড়া বেত। হেড স্যারের চোখ আমার মুখে, আমার মাথা নিচের দিকে। আমার দৃষ্টি মেঝের থেকেও অনেক নিচে। সে কত নিচের পাতালপুরিতে চলে গেছে আমার দৃষ্টি, আর সেখানে কেমন কেমন শাস্তির ব্যবস্থা আছে সেটা ভাবছিলাম মনে হয়। ফলে হেডসারের আরও আরও আগুনের মত উচ্চারিত শব্দে আমার কানে আসছিলো না। আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম। আমার ভেতরে বিচিত্র চিন্তা, কিন্তু সে যে কি, তা তখন আমি আর পার্থক্য করতে জানি না। কখনও কানের ভেতরে বুম বুম আওয়াজ, পিনু সারের ইঙরেজি গ্রামার, ললিত সারের পাটিগনিত, হুজুরের ধর্ম, মিলেমিশে গুলেট

হয়ে যাচ্ছে কানের ভেতরে। এর মধ্যে কে যেনো চালান করে দিয়েছে শ্রদ্ধেয় সিদ্দিক সারের শেখানো অ কু হ কণ্ঠ হতে উ চু য শ তালু... বাঙলাটা তিনি আমাদের শিখিয়েছেন। কিন্তু কণ্ঠ থেকে আমার তখন সব কিছু হারিয়ে গেছে। মনে হয় চিরদিনের জন্য আমি বাকরুদ্ধ হয়ে আছি। আবার কি বাঙলা শেখাতে আরও একজন সিদ্দিক সারকে আমার প্রয়োজন? হয়ত না। তিনি যা শিখিয়েছেন তা সম্বল করেই বাঙলাকে ভালোবেসে যেতে একটুও কস্টো হবে না আর। কিন্তু কোথায় আমি, কোথায় ঐকিক নিয়ম, কোথায় ইঙরেজি, কোথায় বাঙলা, কোথায় আমার ভাষা, আমি ডুবে গেছি অতলে। আমি হারিয়ে গিয়েছি বেয়াদবি আর অনুতাপ ঘেরা এক পাতালপুরিতে। কতক্ষণ সে জানি না। কিন্তু সম্বিত ফিরে পেলাম আমার মাথায় একটি মায়াময়, স্নেহময় হাতের স্পর্শে। সেই হাতখানি আমার হেড সারের।

হুজুর আমাকে নিয়ে গেলেন গান গাওয়াতে। এটা শুনতে যতই বিদঘুটে লাগুক না কেন, কথা সত্য! হুজুরই আমাকে নিয়ে গেলেন। কারন তিনি আমাকে দস্তুরমত ভালোবাসেন। আর আমার কল্যান কামনায় তিনি হলেন হাতিম তাইয়ের মত উদার। আমি তখন ক্লাস এইটে। বরিশালে গান হবে। আমি জেলা থেকে প্রথম হয়েছি বলে আমাকে যেতে হবে। হুজুরের সঙ্গে চললাম বরিশালে। লালনগিতি আর হামদ-নাথ বিশেষ করে নজরুলের লেখা গানগুলো তখন ভালোই গাইতাম। অর্থাৎ সবাই তাই বলে বলে আমাকে মাথায় তুলেছিলো। যা হোক। প্রতিযোগিতার সময় যখন ‘আমি অপার হয়ে বসে আছি...’ বলে টান দিলাম, শ্রদ্ধেয় বিচারকেরা গানের বিচার বাদ দিয়ে নাকি তন্ময় হয়ে শুনছিলেন গান। এ কথা আমাকে তবলাবাদক পরে বলেছিলো। তাহলে আমি পারলাম না কেন? হে হে। আমার তো তিরে এসে তরি ডোবা অভ্যেস। এ আমার জীবনেরই অনুসঙ্গ। আমি নাকি গানের মধ্যে কোথাও একটু তাল কেটে ফেলেছিলাম। আমার গানের ভাগ্যও ওখানে কেটে যায়। কিন্তু এতে করেও আমার হুজুরের উতসাহ কোনওকালে কমেনি। তিনি সব সময়ই আমার শুভাকাঙ্ক্ষি।

আব্দুল জলিল সারকে আমরা কেউ কোনওদিন ‘সার’ নামে ডাকিনি। উনি ধর্ম পড়াতেন, পবিত্র কুরআনের হাফিজ, একজন মওলানা এবঙ ক্লারি। ফলে ইনি হুজুর হবেন না তো কে হবে। কিন্তু গোড়ামি এর মধ্যে নেই। তিনি শুধু হাদিস আর কুরআন পড়েই মুরগির ঠ্যাঙ-এর লোভে অনেক ভন্ড মওলানার মত ইনিয়-বিনিয়, বানিয়ে-ছানিয়ে ওয়াজ করে বেড়ান না, তিনি আরও পড়তেন হাজারো রকমের বই। তিনি ক্লাসে এসে বই নিয়ে আলাপ করতেন। বলতেন এই বই পড়েছো, ওই বই পড়েছো? তিনি বলতেন, পড়তে হবে সব বই, আর নিতে হবে বেছে বেছে। তুমি না পড়লে বুঝবে কেমন করে যে তুমি কোনটা রেখে কোনটা নেবে? আমি ভাগ্যবান অনেকের চেয়ে এই জন্য যে, গান কিম্বা কবিতা কিম্বা অন্যান্য প্রতিযোগিতা করার জন্য আমাদের ছোটবেলায় পুরস্কার হিসেবে ভালো ভালো লেখকদের বই দিতো। আমি গান গেয়ে প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় কম হয়েছি। ফলে নজরুল, রবিন্দ্রনাথ, মুজতবা আলি, ডাঃ লুতফর রহমান, শরতচন্দ্র, বঙ্কিম, জসিম উদ্দিন, শওকত ওসমান, সুকান্ত, সত্যজিত, তলস্তয়, শেক্সপিয়ার, গোর্কি, পুশকিনসহ বাঘা বাঘা লেখকদের অনেক বই আমি স্কুলে থাকতেই পড়ে ফেলেছি। ফলে সাহিত্যের প্রতি আমার দৃষ্টিকোনটা ওই বয়সেই তৈরি হয়েছে। এখন আর ইচ্ছে হলেও সাহিত্যের নামে চানাচুর, কবিতার নামে নগ্নতা, গল্পের নামে উদ্ভট কাহিনিকে ধারে কাছে ভিড়তে দেইনা। হুজুর আমাকে এইভাবে স্কুলজীবনেই শিক্ষা দিয়ে আমার পথটাকে তৈরি করে দিয়েছেন, গড়ে দিয়েছেন বই পড়ার রুচি। এই সেদিন মাত্র আগে উনি এসেছিলেন আমাদের বাড়ি। আমি গিয়ে পায়ে কাছ দেবো। তিনি টেনে তুলে তার বুকের পরে রাখলেন আমাকে। আর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন পরম মমতায় আর আদরে। শিক্ষকদের কাছে আমার স্থানটা এমন। আমি কোনওকালেই জিনিয়াস না, তুখোড় না, সেরা না। কিন্তু সারদের আদর পেতে আমার চেয়ে আর কেউ নেই।

আসলে আমার শিক্ষকেরা ছিলেন অসম্ভব কর্তব্যপরায়ন। এই তো, এই কিছুদিন আগেরই কথা! কিন্তু পেছনে ফেলে এসেছি বলে ভুলে যাওয়ার কোনও মানে হয় না, আমি সব ভুলে যাই এর অর্থ আমি আমার শিক্ষকদের দানকেও ভুলে যাবো এমন ভাবার কোনও কারন নেই। আমার শিক্ষকেরা মানুষের জীবনের প্রকৃত শিক্ষাটা-ই দিতে আপ্রান চেষ্টা করতেন! আমাদের জীবনের অগনিত মুহূর্তগুলো কেটেছে পর্দার আড়ালে থাকা সেইসব মহান মানুষদের আলোর চারিপাশে, গগনচুম্বি আলোর মাঝে ভাসিয়ে দিয়ে যারা আমাদের জীবনের জন্য সুরম্য অট্টালিকা তৈরি করার কাজ করে গেছেন, জীবনের পরতে পরতে বসিয়ে দিয়েছেন নিজ হাতে জ্ঞানের ইট, নিজেদের কাছে কিছুই না রেখে, ছেড়া চপ্ললের শব্দের সঙ্গে তাদের কাছে শুধু রেখে দিয়েছেন উড়ন্ত পথের ধূলা, শতচ্ছিন্ন হোসিয়ারি গেঞ্জিটার ইতিহাসের মতই, আমাদের শিক্ষকদের জীবন নির্বাপিত, আড়ালেই শুধু তা রয়ে গেলো অপরকে প্রকাশের পথটা করে দিয়ে। আমার পিতৃতুল্য শিক্ষকেরা সঙ্গিতের বানির মত শ্বাশত, ও সুরের মতই অসিম। পৃথিবিতে কোনও সুরই হারিয়ে যায় না, তা শুধু দিগ্ভি ছড়ায়, কিছুতেই নির্বাপিত হয় না, হওয়ার নয়। আমার শিক্ষকেরাও তাই। কিছুতেই হারিয়ে যান না আমার মন থেকে। আমার ছোট পৃথিবিতে আমার শিক্ষকেরা-ই নায়ক।

পাখালুঙ থাইল্যান্ড।

২৩ মে, ২০১৬।

শিক্ষকদের এই নিখাদ ভালোবাসা আমাকে আরও গান গাইতে উতসাহিত করে। ফলে গান গাইনি সেভাবে, কিন্তু গান ছাড়িনিও। সেভাবে গাইনি বলতে পেশা হিসেবে গানকে নেবার কথা কখনও ভাবিনি। হুম, এক-দুইটা গানের অ্যালবাম যে বের করার চিন্তা মাথায় কখনও আসেনি তা নয়। অর্থাৎ গান নিয়ে বিস্তর ভাবনার খেলা চলতে থাকে আমার ভেতরে। কিন্তু আমি যতটা ভাবুক, তার চেয়ে বেশি অলস, এই আলসেমি আমার পতনের কারন। তার জন্য দুঃখও কি হয় আমার? হয় না। আমি এক বিকারহীনতা নামক রোগে ভুগছি।

গান গেয়ে এসে ঢুলতে ঢুলতে বিছানায় পড়ি একদিন। সেটা আমার শোয়ার সময় নয়, আর শোয়ার সময় থেকে ঘুমের সময়ের দূরত্ব অনেক দূর, কখনও হয়ত ভোর। একা ঘরে চারিদিকে পৃথিবির নিঃশব্দতা। আচ্ছা পৃথিবি কি কখনও শব্দহীন হয়? না, পৃথিবির শব্দহীন হওয়া সম্ভব নয় জেনেও আমরা মিথ্যে করে বলি – কি পিনপতন নিরবতা! জানালা দিয়ে আকাশ দেখি, তারারা আসে নিজেদের আলোর ডালি সাজিয়ে। সে আলোয় ঘর দেখা যায় না, কিন্তু অনুভূতি আলোকিত হয়ে ওঠে। বারান্দা গলে লাফ দিলেই বন। সেই বনে ডাকে রাতের পাখিরা। ঝিঝি পোকা ও নাম না জানা অনেক মাকড়ের ডাকের বিষন্ন শব্দ ভেসে আসে আমার কানে। কিন্তু অন্ধকার এই কক্ষে আমি যেনো টের পেতে থাকি কে যেনো হাটে। কে সে! আমি ভয়ে কুকড়ে যাই। বাতির সুইচ টিপ দিতে যাবার সময় আমার কেবল মনে হয় সুইচ কি আগের জায়গায় আছে? ঘরে বাতি জলে, আমার ঘুমের সম্ভাবনাও ঘুচে যায়। মুখের উপরে কাপড় দিয়ে চোখে অন্ধকার আনলে যদি ঘুম আসে, তাই এই কাজ করি। তখন আবার চারিদিকে সেই রাজ্যের আধার। তখন আমার মনে হতে থাকে কে যেনো আমার পাশে শুয়ে আছে। হাত চোখের উপরে রেখে আমি অপেক্ষা করি, কে যেনো আমার পা ছুয়ে দিচ্ছে! কে যেনো আমার সারা শরিরে ভুতুড়ে হাতটাকে বুলিয়ে দিচ্ছে।

ভাবনা আমার এত গভিরে পৌছে যায়, আমি যেনো সেই অশরিরি সত্তার উপস্থিতি টের পাই। আমি ভুতে বিশ্বাস করি না। জানি এমন ঘটনা ঘটবে না। আমি আয়াতুল কুরসি পড়ি তবু। সুরা ফালাক আর সুরা নাসও পড়ে ফেলি জিনের আছর থেকে মুক্তি পাবার জন্য। জিনের যদিও বাপেরও সাধ্য নেই আমারে কিছু করে। কিন্তু মনের মধ্যে গেথে থাকা ভুতদের শায়েস্তা করবো এমন উপায় আমার জানা

নেই। তাই মহান আল্লা'র কালাম হলো এই মুহূর্তে মোক্ষ। তাতে মোক্ষলাভ হয় কি না তা জানার আগেই দেখি কোথায় যেনো বসে আছি। রুনা লায়লা এলেন। বললেন, গাও। আমি নদীর মত কত পথ বেয়ে তোমার জীবনে এসেছি – এই গান গাইতে থাকি। তখন দেখি নদীর উপরে সেতু। সেই সেতু দিয়ে রানা ভাইয়া আসছেন রুনা লায়লার জন্য খাবার নিয়ে। আমি বলি, ভাইয়া উনি একা আসেননি, সিধকাঠি সঙ্গে লইয়া এসেছেন – সাবিনা ইয়াসমিনও আছেন।

দুইজন এক সঙ্গে? রানা ভাইয়া প্রশ্ন করে আমাকে।

একসঙ্গে কি না তা জানি না, জানার ক্ষমতা নেই আমার, কিন্তু দেখতে তো পাচ্ছি!

তার মানে প্রকৃত সঙখ্যাটা তোর জানা নেই!

সে আমি কি করে বলবো।

চল আবার বাড়ি যাই।

বাড়ি এসে দেখি শেখ সাদি খান, আর আলাউদ্দিন আলি বারান্দায় বসে আছেন। আলাউদ্দিন আলি 'হে হে হে' করছেন দেখে আমি বললাম, সার ভালো করেছেন। কিন্তু এ কি করছেন?

তখন শেখ সাদি খান বললেন, ওই দূরে দেখো পাহাড়, ওই পাহাড়ে বর্না আছে।

আমি তখন তাকে বলি, আসুন, আমার বারান্দায় আসুন সার, আমি আপনাকে খুব কাছের থেকে পাহাড় দেখাবো। সেই পাহাড়ে বন আছে, বনে কত বৃক্ষ, বৃক্ষেরা পাখিদের সঙ্গে গান গায় সার, আমি শুনেছি। গাছের পাতার শনশন আওয়াজে অনেক ঠাটের সন্ধান আমি পেয়েছি সার। আপনাকে শোনাবো।

রানা ভাইয়া আমাকে বলে, এরা কেন?

আমার মনে হয় বিচার হবে।

কিসের বিচার হবে তোর?

আমি একটা চোর। আমি গান গাইতে গিয়ে চুরি করেছিলাম।

কেন চুরি করিছিলি তুই?

আমাকে কারা যেনো ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলো, তখন আমি গান গেলাম ভুলে। তাই তো হাতে লিখে নিয়েছিলাম।

কিন্তু তাতে তো তোর শেষ রক্ষা হলো না।

আমার যে কখনও শেষ রক্ষা হয় না রানা ভাইয়া! আমার তরি ভাসে গভির জলে, তিরের কাছে এলেই ডোবে।

কথা শেষ হতে হতে সাবিনা ইয়াসমিন আসেন। আমি তাকে প্রশ্ন করি, আপনি সেদিন ফল বেরোবার পরে রাগ করে চলে গেলেন কেন? কই, আমার সঙ্গে গাইলেন তো ভালো। তারপর আমার গানে মন্তব্যও করেছেন ভালো। কিন্তু তাতেও আমার রক্ষা হলো না দেখে রাগ করে চলে না গিয়ে প্রতিবাদ কেন করলেন না? আর আজ কেন বিচার করতে এসেছেন তবে?

চলো, তোমাকে আমার গান শোনাই। এই বলে তিনি সুন্দর সুবর্ণ তারুণ্য লাবন্য গানটি গাইতে থাকেন। পেছনে রুনা লায়লা এসে দাড়িয়ে ছিলেন, তিনিও গলা মেলান। কি অপূর্ব কন্ঠ এদের!

আমি রুনা লায়লাকে বলি, আমার কথা ছাড়ুন, আমি তো পচা জলের কচুগাছের নুইয়ে পড়া দুর্গন্ধময় ডাটির চেয়েও নগন্য। কিন্তু দেশ আপনাকে কি দিয়েছে? আপনি কার জন্য এই দেশে ফিরে এসেছিলেন? আর, আপনি কি পেয়েছেন? যা দেবার ছিলো, তা আপনাকে দেইনি আমরা, যা পাবার ছিলো তা থেকে হয়েছে বঞ্চিত। এতেও আপনি কেমন করে হাসেন?

রুনা লায়লার চোখে অশ্রু দেখে সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, বুঝে চলো আর একটা গান গাই।

আলাউদ্দিন আলি বলেন, আচ্ছা কি করে বলিবো আমি গানটা গাইবে সাবিনা?

তখন রানা ভাইয়া খাবার নিয়ে আসেন। যা গরম তখন! এর মধ্যে গরম খাবার এরা কেমন করে খাবেন? তখন বারান্দায় বসে তালপাখাটা নিয়ে বাতাস করতে থাকি আমি। বাইরে তখন যেনো অনেক জোরে বাতাস বইতে শুরু করে।

আমার তখন কেবল মনে হয় কে যেনো এসেছে। আমার কপালে ভুতুড়ে চুলের স্পর্শে আমি জেগে উঠি ভিষন ভয়ে। দেখি, বৈদ্যুতিক পাখার বাতাসে মাথার লম্বা চুলগুলো আমার কপালে খেলা করছে। বাতাসে তখন কিসের যেনো আওয়াজ। না ঝড় নয়, কোন স্কেলের শব্দ বের হচ্ছে সেটা খেয়াল করছিলাম। দেখি পাইন গাছের পাতার আওয়াজ সপ্তকের সা থেকে কোমল রে-তে যাচ্ছে আর আসছে। ভোর হলো, এখন ভৈরবি রাগের সময়। ফজরের নামাজ শেষে এই রাগ গাইতেন আমার বড়োকাকা। আজ পাইন বৃক্ষের পাতার ধনিতে পৃথিবির সমস্ত সুর যেনো একাকার হয়ে মিশে যাচ্ছে আমার কল্পনার সঙ্গিতে। সেই রাগের সঙ্গে জড়িয়ে অমর হয়ে গেছে বড়োকাকার গম্ভীর আওয়াজ। পৃথিবিতে কিছু কিছু বেপার থাকে, অর্থাৎ থাকতে হয়, যা কিছুতেই ভোলা যায়না। কিছু সুর, কিছু গান, কিছু মানুষ। নশ্বর জীবনের তুচ্ছতাকে এরাই তো অর্থময় করে তোলে!

২৬/৫/২০১৬,

থাইল্যান্ড

পাচ বছর বয়সে আমার জন্য যখন আলাদা করে হারমোনিয়াম কেনা হলো তার আগেই আমি একটা গান লিখে ফেলেছি, অর্থাৎ লিখতে পারার আগেই রচনা। সে গানটির সুরকারও আমি, ওই বয়সেই। কোন বয়সে? হুম, মাত্র তিন বছর বয়সে? গানটির কথা ছিলো এ রকম –

মেঘের উপরে আল্লা আছে, আল্লা'র কাছে বন্দুক আছে, তা তো কেউ জানো না...

আল্লাহর কাছে কেমন বন্দুক আছে সেটা না জানতে পারলেও বাড়ির বন্দুকের গুলির শব্দ আমার কানে এসেছিলো। সেই গুলিতে নির্বিচারে শিতের পাখিদের শিকার হয়ে বাড়িতে আসা আছে, যাওয়া নেই, খাওয়া আছে দয়াহিন, অতিব আনন্দে। ভাগ্যিস দো'নালা বন্দুকটা চুরি হয়ে গিয়েছিলো, নইলে যজ্ঞে আরও কি যোগ হতো বলতে পারি না। কিন্তু গুলির শব্দের চেয়ে গানের সুরকে বেশি পছন্দ করে ফেললাম বলেই কি না আমার বাবা আমার জন্য হারমোনিয়াম কিনে নিয়ে এলেন। বাড়িতে তখন অতি পুরোনো, অতি সুইস জার্মান রিডের হারমোনিয়ামে চাচার ফাটিয়ে রেওয়াজ করতেন। ওখানে পাত্তা পাওয়া সম্ভব ছিলো না ওই বয়সে। কিন্তু চাচার আমাকে নিরাশও করেননি – তারা আমাকে টেলে দিয়েছেন সত্যিকারের গানের সুর। ছোটবেলা থেকেই যাদের গান শুনে বড়ো হয়েছি, তারা যে সব শিল্পীদের গান করতেন বাড়ির আসরে, রেওয়াজে, কিম্বা বাইরের প্রোগ্রামে, তাদের সে সব গানকেই আসলে গান বলে। ফলে সত্যিকারের গানকে আমি উপলব্ধি করতে শিখেছি একেবারে সেই শিশুকালে। আমাদের বাড়িতে ছিলো উচ্চাঙ্গ সঙ্গিতের আবহ, আমার বড়োকাকা ও মনিকাকা হলেন জাত নজরুল সঙ্গিত শিল্পি। বড়োকাকা খন্দকার মকবুল হোসেন খুলনা বেতারের একেবারে গোড়ার দিকের শিল্পি। মনিকাকা খন্দকার এনায়েত হোসেন হলেন পর্দার আড়ালে থাকতে চাওয়া উচ্চাঙ্গ সঙ্গিতের একজন পাকা ওস্তাদ এবং বেতার ও টেলিভিশনের একজন নজরুল সঙ্গিত শিল্পি। কিন্তু মনিকাকার নাম 'মনিকাকা' কেমন করে হলো অর্থাৎ 'কাকা' শব্দের আগে 'মনি' কেমন করে জুড়লো তা আমি আজও আবিষ্কার করতে পারিনি। তার ডাকনাম এনা। ফলে মনি শব্দটা কেমন করে তার সম্বোধন হয়ে গেলো

জানি না। অবশ্য দেখতে ভারি সুন্দর হওয়ার কারনে বুঝি আদর করে সবাই তাকে মনি বলে ডাকতো। কি জানি।

আর ছোটোচাচাও বিশেষ করে আধুনিক গান করতেন। অন্যান্য চাচার সবাই একটু আধটু গান করতেন, সবারই গানের গলা ছিলো সৃষ্টিকর্তার অনেক অনেক অনুগ্রহে বিশেষায়িত। এমন কি আমার আব্বাও গান করতেন বেশ ভালই। মাল্লা দে'র অমর সব গান তো আব্বার কাছেই প্রথমে শুনে পরিচিত হই! এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আর একজন অত্যন্ত গুনি মানুষ, আমার ফুফা শেখ শামছুর রহমান। একেবারে নিরপেক্ষভাবে যদি বলি, তবে বলবো যে, বাংলাদেশে আব্বাস উদ্দিন এবং আব্দুল আলিমের পরে পল্লি এবং লোকগানের এমন সুরেলা কণ্ঠ যদি কারও থাকে তো তিনি আমার ফুফা। আব্বাস উদ্দিন আর আব্দুল আলিমের গান আমি শুনি নি সরাসরি, কিন্তু আমি আমার ফুফার গান শুনেছি। আমার তৃষ্ণা মিটেছে। ইনিও বাংলাদেশ বেতারের পল্লিগিতির একজন প্রথমদিকের শিল্পি। আর আমার ফুফার কয়জন ছেলেমেয়ে হলো অত্যন্ত গুনি কণ্ঠের অধিকারি – এরা সবাই নজরুল এবং ফরুদ অঙ্গের গান করে থাকেন। এই যে একটা আবহ, এই বাতাবরনে উদাস হয়ে, বুদ হয়ে, ভো হয়ে সেই ছোটোবেলা থেকেই শুনে আসছি নজরুল সঙ্গিত, গুলাম আলি, মেহেদি হাসান, মাল্লা দে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জগন্নাথ মিত্র, সতিনাথ মুখোপাধ্যায়, রুনা-সন্ধ্যা-আশা-লতা-আরতি-হৈমন্তী এবং আরও অজস্র সব সত্যিকারের কণ্ঠশিল্পীদের গেয়ে যাওয়া অমর সব গান।

শুনে শুনেই একদিন গান ভালোবেসে ফেললাম। তারপর অল্প-বিস্তর তালিম। আমি বাথরুমে গাওয়া শিল্পীদের চেয়ে খুব যে বেশি ভালো মানের সেটা কিন্তু নয়। তবে সত্যিকারের সঙ্গিতের বৃত্তে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার কারনে আমার কানটা অবশ্য তৈরি হয়েছে। ভালো শিল্পি না হতে পারি, ভালো গানের শ্রোতা হয়েছি, এ-ই বা কম কিসে?

এখন যখন কল্পনায় গান গাই, তখন মনে হয় সামনে বসে নিশ্চুপ শুনছে হাজার হাজার শ্রোতা, মাঝে মাঝে এত গভীর সে ভাবনা যে, আমার কেন যেনো মনে হতে থাকে সত্যিই তো, সামনে তো মানুষ! আমি শত সহস্র মানুষের চোখ দেখে তখন চিনতে পারি এরা কারা। আমি যখন কল্পনায় আমার গানের শ্রোতা দেখি, আমি দেখি এরা আমারই গ্রামের মানুষ, আমি যখন কবিতা আবৃত্তি করি একা ঘরে, আমি শ্রোতা হিসেবে ওই গ্রামের মানুষকেই দেখি এখনও, যে গ্রামে ছোটোবেলায় আমার গানের হাতেখড়ি হয়েছে, যে গ্রামের প্রতিটা অনুষ্ঠানে আমার বাবা-চাচার ছিলেন মধ্যমনি, সেই গ্রামের মানুষগুলোকেই আমার মানসক্ষে ভেসে উঠতে দেখি আমার গানের আজন্মকালের শ্রোতা হিসেবে। কিন্তু আমার নিজের গ্রামের মানুষের সঙ্গে যে আমার খুব ভাব বা ব্যক্তিক ও আত্মিক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে সে রকম কিন্তু কিছু নয়! ক্রিকেটের ম্যাচের একজন অপরিহার্য অল রাউন্ডার হয়ে, আর গোটা-কয়েক বান্ধবি কিম্বা এই সম্পর্ক ছাপিয়ে আরও গভীরতর সম্পর্কে জড়িয়ে যাওয়ায় গ্রামের এ মাঠ-ও মাঠ আর এ-মাথা ও-মাথা করা ছাড়া গ্রামের তেমন কারও সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হয়নি।

আমি বন্ধুহীন মানুষ। তিনকূলে আমার ইয়ার-দোস্ত নেই, কিন্তু ক্রিকেট ম্যাচে আমি অবধারিত খেলোয়াড়, এবং রোমান্টিক সম্পর্কেও তাই। সেই জন্য বিশেষ করে দ্বিতীয় কারনে গ্রামের মানুষের আমার সম্পর্কে ধারণা না-বোধক, অতি সঙ্গত কারনেই। কিন্তু কেউ কখনও আমাকে প্রতিরোধ করেনি, অথবা সাহস করেনি, অথবা আমিও কি পাল্লা দিয়েছিলাম কাউকে, তা আজ বলতে পারি না। এমনি করেই গ্রামের মানুষের সঙ্গে আমার দূরত্ব বেড়ে গেলো, সেটা কখনও ঘোচেনি। আজ ভাবি, আমিই হয়ত তাদের কাছে টানিনি, কিম্বা টানতে চাইনি। কিন্তু অবচেতনের সেই জায়গাটা আজও কেন তাহলে ঘুরে ঘুরে আবর্তিত হয় ওই মানুষগুলোর জন্যই? কেন মানুষ ভাবলেই ওই গ্রামের মানুষগুলোকেই

প্রথমে দেখি, কেন তাদের এত আপন ভাবি, মনে হয় আত্মার সঙ্গে মিশে থাকার যারা, সে প্রথমত ওরা-ই, কেন তাদের জন্যই হাসি, তাদের সঙ্গেই কথা বলি, তাদের সঙ্গেই আড়ি, আবার তাদের সঙ্গেই সখ্য? কেন তাদের জন্যই কাদি এবং তাদেরকেই গান শোনাই, কেন তাদেরকেই সবার প্রথমে রবিন্দ্রনাথ-নজরুল-জিবনানন্দ-জসিমউদ্দিন-রুদ্র পড়ে শোনাই? বড়ো অদ্ভুত বেপার!

সুতার বিলের উপাখ্যান

মাজেদ ফকির যখন এই কথা कहিলেন যে, *বিশ্ব সংসারে এনারা যেদিন এলেন, সেদিন যদি নিচুকুলোডবদের আশরাফ হতি ইসসে হতো, তারা তাদের দেমাগ বদলাতো। কিন্তু তা হইবার নয়। রক্তের ঋন। কিন্তু দেমাগটা যে ঠিক কিসির সেড়া বুঝা গেলো না, আমাদের কেউ কেউ তখন পরবাসে, পরপারেও। কেউ কেউ গ্রাম ছেড়ে, ঘর ছেড়ে জিবিকা করে অন্যখানে। অন্য জীবনের সাধ নিতে আমাদের মত অনেকেরই হয়তো ভরসা নেই, মতিও নেই। কিন্তু বেচে থাকার একটা দায় আছে, ফজরের পরে যেমন আছে কড়ি করবার আদেশ। নইলে আসমান হতে বৃষ্টি এলেও তাতে বানের জলে ডুবে মরে যাবার সম্ভাবনা আছে কি নেই বরসায় বান না এলে টের পাবো কেমন করে? কিন্তু অনেকের মত আমরাও পেলাম।*

ফকির আরও নাকি বলিলেন, বাবাজিরা এইসেছিলো ছেনি-দড়ি হাতে লয়ে। তাতে বগুশের নামে যে হরিহর আত্মা সঙ্গে লেগে ছিলো, তা শুধু নামের সঙ্গেই বেইজ্জতি করতিছিলো। কিন্তু নাম রয়ে গেলো। তারা মুলুক দেখে নাই, কিন্তু মুলুকের গন্ধ পেয়েছিলো। পেয়েছিলো বলেই ঘরের চাল হতে নামিলো।

অনেকের মতই আমরাও তখন মনে মনে বলি, তাতেই বুঝি তাদের পরিচয় খসলো!

রাজেদ আলি খান এলেন তখন, সবাই উইঠে দাড়ালে তিনি বললেন, বইসো। আশরাফ হয় কর্মে। ছেনি শিকেয় তুইলে খুয়ে শুধু নাম নিলিই কি হইবে? কিছু কামও কত্তি হইবে।

মাজেদ ফকির বললেন, বাবা রে, কিসের যে তোগে এতো অহঙ্কার! এই চাদর টানিস না বাপ! মারা পড়বি খুদার হাতে। তবে তোগো গায়ে নাম যখন পইড়ে গেছে, একটা কথা কতি পারি যে, এহন চেনা মুশকিল হইছে যে খাটি সোনা কে, আর খাদ কিসি!

মতলেব মিয়া, অর্থাৎ মাজেদ ফকিরের জান কা ইয়ার বললেন, এহন নাম দেইখেই আর বলা যাবেনানে যে কিডা কোন জাতের, ওয়েছো!

মাজেদ ফকির হাসতে থাকেন। এই উদ্যম হাসির শব্দে গুরু এলেন। ভেবেছিলেন হয়ত খানা-পিনার আয়োজন হয়েছে কোথাও। এতে গুরুর পরিচয় খসেনি। কারন, তারে আড়াল করে রেখেছিলো আলেয়া। সুতার বিলের কিনার থেকে যেদিন ভুতের উপদ্রব শুরু হলো, তিনি মওকা পেয়ে গুরু নাম

নিলেন। কামের ভুত ঘাড়ে চড়ে, নফসের ঘাড় ভাঙে, গুরু জল আরও উসকে দেন। অতএব সেই থেকে সম্মান।

তবে পরিচয় খসবে। অতিতে এর নাম আদপে ছিলো গরু। অর্থাৎ বলদ। তখন গ-এর সঙ্গে বাঙলা ভাষায় কার-এর প্রচলন ছিলো না বলে গরু-বলদে সব একাকার হয়ে গিয়েছিলো। গ এখন কার পাইয়াছে। হ্রস্ব-উ কার। অর্থাৎ কুল্লে বেঞ্জনবর্ণমালায় যেই কার-এর প্রচলন শুরু হলো, অমনি গ-এর পাছায় হ্রস্ব-উ কার-এর গন্ধ জুড়ে যায়। সেই থেকে বলদ হলেন গুরু। খবিশের রাজপ্রাসাদ যেমন, দারবান যেমন কেদারায় বসতে পেলেই শুতে চায়, গুরুরও তেমনি *অহম মম* তপ। তবে বলদ কেমন করে *বুল* হয়ে যায় সে গল্পও প্রাসঙ্গিক। আর বদলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় চরিত্র, বদলে যায় আচরন, বদলে যায় চিরাচরিত ইতিহাস। নিজের মিথ্যে পরিচয়ে কিসের আনন্দ, সে অনেক গবেসনা করেও জানা যায়নি।

অনেকের মত আমরা তখন থাকি তফাতে। কিন্তু গুরুর অহমের গন্ধটা নাকে নাকে, নাক কুচকে যায়। তবে অহমটা যে ঠিক কিসের সেটা বোঝা গেলো না। কিন্তু লোকমুখে অনেক কথা শোনা যায়। মানুষ রসিয়ে রসিয়ে মিথ্যে কথা বলতে ভালোবাসে। গুরুকে নিয়েও তাই অনেক কথা। নইলে গুরু কিসের!

ফকির সাহেব আবারও বলেন, আমার শরিলের দিকি দেহো। এরে কয় পেটা শরিল। একজন জাতও পরিশ্রমি মানসির শরিল। তুমরা এরে কও সিলিম বোডি। তুমরা ছিলিমে মুখও লাগাও না, তাল গাছেও ওটো না, তালি কি আর এরাম হইবে?

কে একজন বলে উঠলো, তে, আফনি কিন্তু আইজকে মেলা বক বক করতিছেন কাকা!

- এহন আমি মুখ খুলি, কারন, আমাদের এই পুন্যভূমিতে এহন সব কিছু খোলাসা হয়। তোমাগো জমানায় এহন যেমন তইথ্য নিয়ে মেলা আলোচনা সেমিনার হসসে, তারপর তুমরা কসসো যে এহন হইলো তইথ্যের অবাধ প্রবাহের যুগ, আমাগো এহানেও এহন সব খুলা। আমাগো আমলনামার সব ভিডিও আমরা দেখতি পাই। এহানে আমাইগে মুখ কোনও কতা কয় না, মুখে টেপ মারা, আমাগো অঙ্গে কতা কয়। এহন তোমাগো লইগে আছি বইলে মুখ চালাতি পাতিছি। কিন্তু তুমি তো এহানে আমার অনেক আগেই তশরিফ লিয়েছিলে জাহেদ! তোমার ভাষার ছিри এরাম তো শুনি নি কোনওকালে!

জাহেদ বলেন, ইহকালে যা শিখবার তা শিহে কাম করার আগেই তো উড়াল দিলাম কাকা, এহন আর ভাষা দিয়ে কি হইবে? আমার ইয়ার-দোস্ত-শিষ্য-সাগরেদদের অনেককেই এহানে ওহানে জায়গা করবার জন্য বিস্তর ঘুরাফিরা করতি দেহি, গিরামে যে কি হসসে, আল্লায় জানেন।

মকবুল মাস্টার রাজেদ আলির সঙ্গে কি বিষয়ে যেন কথা বলছিলেন। তিনি জাহেদকে এবার বললেন, তা শুইনে আর তুমার কোনও কাজ নেই। যা হচ্ছে তারে ঠেকাবে কিডা! মাজেদ ফকিরের দিকে চেয়ে তিনি বলেন, তা কাকা, তালগাছে আমিও কিন্তু মাঝে মইধ্যে উঠিছি! এতে আমার জাত তো গেলো না! তালি, ছেনি হাতে থাকলি জাত কেন যাবে!

গুরু পাত্তা না পেয়ে নিজে কিছু বলার চেষ্টা করলেন। বললেন, আমি আশরাফ হয়েছি বলেই লোকের কতায় গুরু নাম লিয়েছি। নইলে কি সুবিচার হয় শব্দের প্রতি!

রাজেদ আলি খান গুরুর এই কথাকে কোনও পাত্তা না দিয়েই তখন বললেন, তোমাগো যুগের কিছু আগে সৈয়দ মুজতবা আলি একখান হক কথা কইছেন, *পড়তে পারে না এক বর্নও, কিন্তু আলিফের নামে ঠ্যাঙ্গা*।

মাজেদ ফকির বললেন, এহন মনে হয় নামের যুগ। আমার তো ফকিরিও নেই, গুরুগিরিও নেই, আমার ছেলো বাচার ফকির। আমারে কি যায় না চেনা?

তখন মতলেব দাদা কথা কয়ে উঠলেন। বললেন, ওয়েছো! আমি যে এক ঠেইঙ্গো দেশে গেলাম, তারাও কি নয় মানুষ!

সবাই সমস্বরে এবার বলে উঠলেন, হক কথা।

খুলে বলি।

দিল্লি শহর। সেই শহরের বাসিন্দা খানজাহান আলি তখন যুবক। তার আগে ছোটবেলা থেকে কুরআন-হাদিস ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে জ্ঞান শিক্ষা লাভ করেছেন তিনি। কিন্তু চাকুরি নিলেন ফৌজের। নিজের দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রমাণ করে একদিন তিনি হলেন প্রধান সেনাপতি। খুব অল্প বয়েসে জৈনপুর প্রদেশের প্রশাসক হলেন। এরপর শৈশব ও কৈশোর বয়সে ইসলাম ধর্মের উপর তার জ্ঞানার্জনকে কাজে লাগাবার জন্য বাঙলা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নিলেন।

অবাক করা কথা তো! ইসলাম প্রচারের জন্য আক্রমণ!

কিন্তু আসল সব সময় নকলের আড়ালে ঢেকে যায়, ঢেকে দেয়া হয়। কিন্তু এক সময় মাথা উচু করে বেরিয়ে পড়ে সত্য। আচ্ছা যা হোক। তৈরি হলো প্রায় আড়াই লক্ষ সেনার একটি বড়োসড়ো বাহিনি। তারপর খানজাহান বাঙলা মুলুকে এলেন, দেখলেন এবঙ জয় করলেন।

লাল গোলাপের গায়ে আরও রঙ চড়িয়ে তাকে আরও লাল করতে চাইনি আমরা কেউ। কিন্তু রাতের অন্ধকারে অন্যের বাড়ির টেলিভিশনে আলিফ লায়লা দেখতে যাবার সময় যৌন উত্তেজক গল্পকে আরও রাগে চড়িয়ে ওই বালকবেলায় আমাদের মনকে কলুষিত করে তুলেছিলেন যিনি, তার নাম গুরু। সে গল্পের এমনই ধরন যে, ওই বালকবয়সেই, আজ যেন মনে হয়, রতি-বল অনেক বেড়ে যায়। সৈয়দ মুজতবা আলি বলেন, পঞ্জিকায় যে সব মলম-বড়ির চটকদার বিজ্ঞাপন অন্ধেরও চোখ এড়াতে পারে না, তাদের ভদ্র নাম আফ্রোডিসিয়া। গুরুর গল্পে পঞ্জিকায় বিজ্ঞাপন লাগেনি, এমনিতেই নফসে জিনের আছর লেগে গেছে। অর্থাৎ, এই পরিবেশনের গুন একান্ত যার, সাদা মনের উপরে নস্টামির প্রলেপ

লেপার দায়ও তার। আজ এটা বুঝি। কৈশোরে মাথা ও মতি দুইই মদনদোষে সেদ্ধ করা নাটের গুরু নাম তাহলে শুধু গুরু হলো কেন, এটা একটা বিশ্বমাপের প্রশ্ন। আমরা চারিদিকে তাকিয়ে তা জম্পেশ দেখতে পাচ্ছি।

○ কিন্তু সব কিছুকে ঠেলে এই প্রশ্ন করা দরকার যে, তার উপাধি কি হওয়া উচিত?

কে একজন বললেন, এ কথা বলো'না। পরিচয় দিতে গেলে কিন্তু পরিচয় খসবে!

কিন্তু গল্প মেলবে ডালপালা, কুটোর পালার কুটোও ছড়াবে সুতার বিলের বাতাসে, একে রুখবে কে? আর এভাবে গল্প এবং আলোচনা গড়ায়। মাজেদ ফকিরও ছাড়বার বস্তু নন। তিনি বলেন, বিষয়টা গুরুতর। কারন হলো, ইতিহাসে এর দায় আছে। অস্তিত্বের সঙ্গে সত্যের সম্বন্ধ যেমন, কালের সঙ্গে তেমন সম্পর্ক কির্তির। কিন্তু কির্তি যখন নাশ হবার উপায় হয়, তখন সামনের পরে ঝুলে থাকা পর্দা যারা দেখতে পায়না, তারা তাদের নিজেদেরও পরিচয় ভোলে।

রাজেদ আলি বলেন, বিষয়টি আপেক্ষিক। কিন্তু যাকে ছোয়া যায় তাকে আপাতভাবে হলেও তো আমরা বলি যে, বেপার সত্য! এও তেমন।

ফ্লাশ বাক।

দিল্লির আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায় ভানু। পরিচয়হীন সে নয়, কিন্তু যৌবনদিগু। সেনাবাহিনীতে কি সে কাজ করেছিলো? সে খবর জানা গেলো না। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যা বেলায় খানজাহানের বাঙলা মুলুকে শাসনভার গ্রহন করার অভিজানে তিনি সজ্জি হলেন। কেমন করে?

সেদিন ভানু গেলেন খানজাহানের সঙ্গে মুলাকাতে। তাদের মধ্যে কথা হচ্ছে -

বহু দিবস এইখানে অপেক্ষা করেছি জনাব। আপনার কাফেলায় আমাকে সজ্জি করে নিন। এই অগ্রজাত্রায় আমাকে লইতে যদি আপনার মর্জি হয়, তবে আমি প্রস্তুত।

এ কিন্তু দেশ ছেড়ে ভিনদেশে গমন!

কিন্তু আপনার ধর্মে তো কোনও দেশ নেই, রাজ্য নেই!

কিন্তু তুমি? তোমার ধর্মে?

তবে কি আমার খাহিস অপূর্ণ রহিয়া যাইবে জনাব?

তবে কালিমা পড়িয়া লও।

শিখাইয়া লন।

পড়ো, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাহ, ওয়া আশহাদু আল্লা মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

এই কাল্পনিক সংলাপের পরে ভানু ওরফে ভানু ভাস্কর খানজাহানের সঙ্গি হলেন।

শের শাহকৃত গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রাস্তার আমুল সঙ্স্কার হতে তখনও মেলা বাকি। অর্থাৎ পুরোনো সেই গ্রান্ড ট্রাঙ্ক ধরে খানজাহান এগোতে থাকেন। তারপর তিনি এলেন দেখলেন এবঙ জয় করলেন। ঘোড়ায় চড়ে রাজ্য জয় করা যায়, কিন্তু ঘোড়ায় চড়ে রাজ্য শাসন করা যায় না। দেশ ছেড়ে এসে মুসলিমরা ভারতজয় করেছে, এবঙ কয়েক শতাব্দি শাসনের ইতিহাস রচনা করেছে। কিন্তু এদের যারা ম্লেচ্ছজ্ঞান করেন তাদের কলমে ইতিহাস রচনা যে মুসলিমদের রক্তপাতের খবর বইয়ে বেড়াবে এটাই সত্য, এবং পৃথিবির নিয়ম। তবে ইতিহাসের পাতার একটা উলটো পিঠও থাকে। তবে কেন চার হাজার বছর আগে এই ভারত মূলুকে যারা এসেছিলেন, এবং এসে ধঙস করে দিলেন ভারতের অনেক অনেক সভ্যতার নিদর্শন, তারা কেন প্রিয়ভাজন হলেন?

আবারও, ইতিহাসের পাতার উলটো পিঠ থাকে।

ভানু খানজাহান আলির সঙ্গে বাগেরহাটে পৌছলো।

খানজাহান ঘোড়া থেকে নামেন। তিনি জানেন প্রজাপালনের জন্য দুই পা হলো উত্তম। অমরত্বের পথে যেতে হলে ওই দুই পা লাগিয়ে জনমানবের দিকে এগোতে হয়, তাদের কল্যানের জন্য কাজে ব্রতি হতে হয়। এর পরের ইতিহাস সবার জানা। খানজাহান আলি বাঙলা মূলুকের বহু স্থানে খনন করেছেন অসংখ্য জলাধার। কথার কথা নয়, আসলেই সঙ্ঘ্যাতে গুনে সঠিক উত্তর দেয়া অসম্ভব যে, এত দিঘি তিনি খনন করিয়েছিলেন। চলাচলের জন্য তিনি নির্মান করলেন প্রচুর রাস্তা, আর তার কৃত পুরো বাগেরহাট শহর তো সেই কবেই বিশ্ব ঐতিহ্য হয়েছে। বাগেরহাট হলো প্রাচীন মসজিদের শহর। তিনি যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই গড়েছেন কির্তি। কিন্তু তার আসল কির্তি নকল ভক্তদের কাছে ধরা খেয়ে গেছে। একজন সার্থক প্রজাহিতৈষি প্রশাসকের সুশাসনের ইতিহাস চাপা পড়ে গিয়েছে ভক্তের পুজার শ্রাদ্ধের নারকিয় গন্ধে। খানজাহান যা করতে বলেননি, ভক্তে তা করছে, এবঙ ভক্তের কাছে খানকা হলো মক্কা, উরুজ হলো হজ। খানকা শব্দের বানানে ভুল আছে। ক-এ আ-কার না হয়ে ওটা ই-কার হবে। ভন্ডদের পিরপুজা এই নামেরই যোগ্য।

বৈদ্যের টনিক যখন পড়লো তখন ইন্ডরাজের ইতিহাসে বিজয়ের ঘটনাসমূহ কেউ কেউ সোনার অক্ষরে লিখালো। তাতে গুরু মহিমা বৃদ্ধি পেয়ে খানিকটা সম্মানও খেড়ি হয়ে গেলো। অর্থাৎ বৈদ্যে এখন কোবরেজ। কারন পকেটে কিছু বেড়েছে। আশেপাশে সবাই তা টের পেয়ে গেছে। কারন অহমে ঘোটি তখন অনেক শক্ত ও মজবুত হয়েছে, একেবারে মুগুরের মত। ভাগ্যিস ডাকাতি করার পুরোনো নিয়মটি এখন আর নেই। নইলে রাতের ঘুম হারাম হয়ে যেতো।

মতলেব আলি একখানা গল্প कहিলেন, নাইড়ে ভিক্ষা করতো। একদিন সে বিরানি খেতে পেলো। তার ঢেকুরের গন্ধ সবাই পাচ্ছে।

গল্প শেষ হলে মাজেদ ফকির कहেন, টাকার কি শেকড় আছে নি?

রাজেদ আলি বলেন, কলিকাল। কিছুই বলা যায় না। অর্থাৎ না থাকলিও আছে, এমন কি, টাকার মুখও আছে। সে কথা কয়।

এক্ষণে সুতার বিল থেকে মাছ ধরে নিয়ে কাদামাখা অবস্থায় কে একজন এলেন। ইনি মকবুল মাস্টারের উর্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ গোলাম আজগর। অর্থাৎ ভানু হলেন গিয়ে গোলাম আজগরের প্রপিতামহ। তিনি এসে বললেন, ঘরকে মাজার বানাইওনা। মাজার হলো গিয়ে বাজার। আমার পূর্বপুরুষ এমন কি আমিও চাইলে মাজার ও বাজার দুটোই করে নিয়ে ইহলোকের সাধ ও আহলাদ সম্পূর্ণরূপে আদায় করে নিতি পারতাম। করিনি। আমরা ও আমাদের পূর্ব ও উত্তরপুরুষেরা যতকিঞ্চিৎ লিখিয়াছি। তাতে জিবিকা আসেনি। এই দেখুন ঝুড়িতে মাছ। আমরা মুটামুটি অভাবি।

কিন্তু আফনারা তাবিজ করেছেন বলে শুনি, কথা খাটি? মাজেদ ফকির এই কথা বলে শোনার অপেক্ষা করছেন।

তিনি বললেন, আমাদের ইমামেরা সবাই এই কথা বইলে গেছেন যে, তাদের মৃত্যুর পরে যদি নবিজির সহি সুলত পাওয়া যায় তবে সেই হাদিসের উপরে আমল করা-ই হলো তাদের পেত্তকের মজহব। তাবিজ করা ধর্মে বুরা হলি এই কথা আমাগে উপরও সত্য। তাবিজ লেখা উত্তরপুরুষে কিছু করেছেন, তাবিজ দিয়ে পয়সা করেছেন কি না তারা, তা দেখিনি। করে থাকলে ভুল করেছেন। আমরা ভবিষ্যতে আরও শুধরাবো। ইমামেরা আমাদের শুধরানোর শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, কেমন করে আমাদের নবির সুলতের উফোরে থাকতি হয়। আমি বা আমাদের পূর্বপুরুষেরা তোমাদের আমলের লালসালু গল্পের মজিদ মিয়া নন বলেই আমরা সমাজকে ঝালরওয়ালা গিলাফের অভিশাপ থেকে বাচিয়েছি। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করেছেন।

মতলেব মিয়া তখন বললেন, ওয়েছো! মাজার হলি একখান বাজার তো হইতো এহানে, কত মানসি আসতো যাতো। মেলা খেল সে!

গোলাম আজগর উত্তর করেন, বুজুর্গিতে বুজরুকির খেল তামাশা যখন নফসে বাসা বানতি শুরু করে, ভোগ তখন নস্টামিকে উগরে দেয় বলেই হয়ত তেনারা বুঝতে পেরেছিলেন সঠিক কি করলে এই অভিশাপ আমাদের উত্তর পুরুষের গায়ে লাগবে না। আমার অধস্তন চতুর্থ পুরুষ শাহমত আলি সেই মতেই বুজুর্গি ধরে রাখিছিলো, কিন্তু ধর্মের নামে তারে জাল ও মেকি মাজারতত্তের আবরু দিয়ে মুড়িয়ে জিবনের জন্য বিলসি সুক্ত-বেঞ্জনের উপলক্ষ করেনি।

রাজেদ আলি তখন বললেন, আপনি হক বলেছেন। সে আমার ইয়ার।

মাজেদ ফকির বললেন, বটে! আপনি সাক্ষ দিচ্ছেন?

রাজেদ আলি বললেন, আশারাকে-ইতরে সখা মিতির কি হয়? মহান আল্লাহ বললেন, যারা জানে আর যারা জানেনা তারা কি এক? আলো আর আন্ধার কি এক? আমি একটা ঘটনা বলি ফকির সাব?

যদি বলেন।

রাজেদ আলি গল্প শুরু করেন – শাহামতের এক ছেলে হইলো। আমি দেখতে গেলাম। ছেলে দেখা শেষ হলি আমি ছেলের বাপকে বললাম, আশরাফের ঘরে কালো মানিক, এ কেমনে হইলো! শাহার বেটা অর্থাৎ ইমান আলির গায়ের রঙ কালো ছিলো। এরপরে একদিন আমার এক ছেলে হলো। শাহা দেখতে এলো। ছেলে দেখা শেষ হলি সে আমাকে কয় – মানুষের পেতে পাঠার ছাও কেমনে হইলো! আমার বেটা আব্দুল জব্বার খান শাহার বেটার চেয়ে দেখতে কালো ছিলো। ফকির সাব, সম্পর্কটা এবার বুঝে নিন।

মাজেদ ফকির গোলাম আজগরকে বলেন, তা ভালো। তবে গল্প যদি একদিন সত্যি হইয়ে যায়, তার জন্য দায় আফনাইগে নিতি হবে কেন?

- ঠিক বলেছো মাজেদ মিয়া। তোমার গল্পগুলো যেমন গল্পই থেকে যাবে। তোমাকে নিয়ে কেউ কখনও মিথ্যাচার করবে না। কারন সবাই জানে যে, তুমি শুধু গল্পই করেছো। কিন্তু আমাদের গল্পগুলোকে কেরামতি বলে সেগুলোকে সত্য প্রমাণ যারা করে থাকেন, তারা তো আমরা নই! আর কেরামতি কেমন করে হয় তা না দেখেই বা আমরা কেমন করে বলি। ফলে যারা বলছে, সে দায় তাদের নিতি হবে। যারা নিজেদেরকে নিয়ে মিথ্যাচার করে, তাদের দায় কে শোধ করবে? দিনের আলোয় অনেক কিছুই পরিস্কার। রাতে আছে আধার। আন্ধার কি আলোর সাথে মেশে?
- বুঝলাম না। একটু বুঝিয়ে কয়েন।
- বিদায় হজের ভাসনে আমাদের প্রিয় নবি কি বলিছিলেন? তিনি বলেছিলেন, যে নিজের বঙশের পরিবর্তে নিজেকে অন্য বঙশের বলে প্রচার করে, তার ওপর আল্লাহর, ফেরেশতাকুলের ও সমগ্র মানবজাতির অনন্ত অভিশাপ। কর্মই যদি আসল পরিচয় তবে মিথ্যে নাম-পরিচয়ের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে কেন এই জাগতিক তামাশা!

এই বলে যে পথে তিনি এসেছিলেন, সেই পথ ধরে বিলের কিনার ধরে হাটতে হাটতে উধাও হলেন।

রাজেদ আলি এবার বললেন, ফকির ভাই, ইহলোকে থাকতি আমাগো প্রতিবেশে এতো দামি কথা কম শুনিছি।

- আমি মুরক্ষু মানুষ। ভেদজ্ঞান আমার নিতান্ত কম। এই জন্য তাল গাছেতে সোজা বেরেক করার গল্প কয়েছিলাম। নলি, এরে আরও রঙ চড়াতি পারতাম।
- রঙ চড়াতি ওই গল্প আর গল্প থাকতো না, সত্যি হয়ে যাতো।

সুতার বিলের পাড়ে ভানুর এক ছেলের জন্ম হলো। ছেলের নাম রাখা হলো মাহমুদ তকি। ইনি গোলাম আজগরের পিতামহ। একজন মানুষের জীবনের বিচারে ভানুর পরিবারের এই সময়টা অনেক বড়, তা প্রায় পাচশ বছর আগের কথা। সুতার বিল দিয়ে তখন নদির মত জল গড়াতো কি না জানি না, তবে এই বিল যে ভৈরব নদের একটা খাড়ি তা আন্দাজ করা যায় ভানুর অধস্তন অস্টম পুরুষ ইমান আলির বিশ্ব সংসার যিনি আগলে রেখেছিলেন তার বলে যাওয়া গল্পে। গল্প তো গল্পই। কিন্তু গল্পেও থাকে ইতিহাস ও সত্যের উপাদান। সে ক্ষয়ে যাওয়া, নুয়ে পড়া, ভেঙে পড়া হলেও তা থেকে রস আন্বাদন করা যায়। কখনও কখনও।

তিনি বলেছিলেন, সে সময়ে অর্থাৎ আদিকালে ভৈরব নাকি এতই প্রশস্ত ছিলো যে, দিনে একটি নৌকা নাকি একবার মাত্র পারাপার করতে পারতো। এখন ভৈরবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ছিঁরি কেউ মন দিয়ে দেখলে এই গল্পের উপরে বিশ্বাস রাখা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে যাবে বলে এই গল্পের এখানে ইতি টানা উচিত। কিন্তু এ কথাও বলে দেয়া দরকার যে, যুগে যুগে নদির প্রতি যে অনাচার ও অপরাষ্ট্রনিতির খেলা হয়েছে এই বঙ্গ মূলুকে, তার জন্য মৃত্যু হয়েছে মানুষের আজন্মকালের সমাজবেবস্থা ও সংস্কৃতির। এখন কেউ আর দায় নিতে চায় না। যাদের দায় নিতে হবে, তারা শক্তিমান। দায় তাদের কাধে তুলে দেবার প্রশ্নই আসে না। কে দেবে?

এই সময় বিবেক, অর্থাৎ মাজেদ ফকির উপস্থিত। তিনি বললেন, ভৈরব নেই বইলেই না সুতার বিল!

মতলেব দাদা ঝুকে কথা কয়ে উঠলেন আবার, ওয়েছো!

অর্থাৎ বুঝেছি কি না সেই বিষয়ে উনি নিশ্চয়তা চাইলেন। কিন্তু জীবন যখন অনিশ্চিত, তখন ইতিহাসের বেলায় তারতম্য কেন হবে? ইতিহাস তো ঘটে যাওয়া ঘটনার শাব্দিক উপাদান। একে নিয়ে সত্য-মিথ্যে খেলা আগেও হয়েছে, এখনও হয়। তাই ক্ষয়ে যাওয়া ভৈরবকে নিয়ে গল্প রচনা হতে পারে, কিন্তু সুতার বিলের পাড়ে ইমান আলির পূর্বপুরুষের ইতিহাসের যে উজ্জলতা, তা কিন্তু ভাটার জলের মত কালের স্রোতে মিশে গেলো একরাশ বের্থতার উপাদানকে সঙ্গি করে। নেকাজোকা, পড়াশোনা উনার পূর্বপুরুষেরা যা কিছু করেছিলেন বলে এখনও তার প্রমাণ আছে, তিনি সেগুলো ছেড়ে দিয়ে পাখি শিকার, মাছ ধরা আর গান চর্চায় মেতে উঠলেন। এগুলোর কোনওটা-ই জ্ঞানচর্চার পক্ষে বাধা না হলেও সংসারে উদরাময়ের চেয়ে বেশি সজ্যাকবার আতুরঘরের জন্য পর্দা টাঙানো হয়েছিলো।

মতলেব দাদা বলে উঠলেন, বোঝো ঠেলা! তা আল্লার মাল আল্লায় দিচ্ছেন!

গুরু মওকা পেলেন। বলেন, এই উদয় পতনের।

মাজেদ ফকির যেন কাকে ইশারা করলেন তখন। সে বলে উঠলো, তবে তোমার কুলের ইতিহাস বাতাও গুরু।

খড় উড়ে যাবে এমন সময় আকড়ে না ধরলে বিপদ, এমন বুঝে গুরু খড় আকড়ে ধরেন। অর্থাৎ কি না তত্ত্ব ও যুক্তি সন্ধানের চেষ্টা।

কিন্তু আখেরে খড় উড়ে যেতে লাগলে, গুরু বললেন, আমি বাটি চললাম।

মাজেদ ফকির ফোড়োন কাটতে ভোলেননি। তিনি বললেন, কোথায় ছিলে আগে?

এর উত্তর পাওয়া যায়নি বলে রাজেদ আলি খানের খুব গুসসা হলো। তিনি কহিলেন, কুণ্ঠিবিচার না করিয়া একে এই সোহবতে যায়গা দেয়া গলত হইয়েছে।

গুরু হেকমতি না করিলে ভক্তের শনি, অর্থাৎ আন্ধার। তবে হেকমতি জমিলো ভালো। কিন্তু আন্ধার কাটিলো না। অর্থাৎ হেকমতের গাছ তলায় যদি কেহ বেল কুড়াইতে যায়, তাহলে যদি তাকে কেউ প্রশ্ন করে, মাথা সামলাবার উপায় করেছিলে তো?

গুরু তখন করজোড়ে কহিলেন, আমারে ক্ষমা করো, আমি ভন্ড। এতোদিন ভেক ধরিয়াছিলাম।

রাজেদ আলি কহিলেন, তোমার খোলস খইসে গেছে। তোমাগো খোলস খসা।

মাজেদ ফকির এবার বলেন, আমি তালগাছ কাটি, পানের বরজ বুনি, গলফো বানাই। কিন্তু তুমি তোমার মিথ্যে অহমের কলা করতে গিয়ে নিজেই কাচকলা দেখলে।

এবার বিচার হবে।

কেউ গুল টানে, কেউ গুলবাগের দ্বানে মাতোয়ারা হয়ে কাব্য লেখে, কেউ গুল দেয়। রায় হলো যে, গুরু এই শেষ প্রকারের। তবে কিনা, মাজেদ ফকির যেমনটি কহেন তেমন কহিলেন, গুলের সঙ্গে অহম যোগ হইলে যাহা উতপন্ন হয় তাহার নাম কি হইলে ভালো হয় খান সাহেব?

রাজেদ আলি খান বলেন, তাহা ডাহা অনির্বচনীয় রস। কিন্তু এর ইতিহাসে কস বেশি। অর্থাৎ মিঠাই কম।

মাজেদ ফকির এবার গুরুর দিকে তাকিয়ে বললেন, বেটা বেদ্দপ, বলি, ছাড় এসব। দারা-পুত্র-পরিবার লইয়া খেয়ে যাচ্ছিস, খেয়ে যা। অহমে নিজের প্রতি রহম বঞ্চিত হয়ে তোর কি লাভ?

কিন্তু গুরুর তাতে মতি হলো না। অর্থাৎ গায়ে মানেনা আপনি মোড়ল! বেদ্দপ গুরু রায়ের বিষয় কানে তুলিলেন না। তখন তার কাছে খবর আসিলো যে, ইতিহাসের দিক পরিবর্তিত হইয়াছে। তখন পকেটে জমানো পয়সা ফুলে ফেপে উঠেছে, ফলে বিদ্যার জন্য বইয়ের আর কদর থাকিলো না। কাব্যতির্থ এখন তার কাছে গু-মুত।

মাজেদ ফকির না পারিয়া তখন কহিলেন, তালি বাপু চলো, তুমারে মসজিদের সভাপতি করিয়া দেই।

গুরু মনে মনে কহেন, রায় কুড়ায়ে বেল! মোড়া খেইকে চিয়ারমেন! ও হরি! এ দিকি হিটলার! ওরে আমি হিটলার হইবো! কে আছিত আমারে ধর!

কে না জানে হরমোন যেখান হইতে বাহির হইবার, সেইখান হইতে যদি প্রয়োজনের চেয়ে বেশি উগর হয়, অর্থাৎ বাড়াবাড়ি করে, তবে মানুষ নিজেরে অন্যরকম সমঝে। এমন হইলো। গুরু তবু গুরুই রয়ে গেলেন। কেউ মানিলো না, তবুও গুরু। কেউ পুছিলো না, তবুও গুরু। এহেন গুরুকুলশিরোমণির মানসযজ্ঞের ছুচো মারিয়া কেহ হাত গন্ধ করে, তেমন কেউ চাহিলো না। অতএব গুরু গুরুই রহিলেন।

তবে দন্দ মিটলো না। রাজেদ আলি খান উঠে দাড়ালেন। তিনি গুরুর দিকে তাকিয়ে বললেন, দিল্লি মুলুকের যিনি সুতার বিলের পাড়ে আইসেছিলেন, তারে তো চিনলাম। কিন্তু শোনিত যদি বিটপ হয়, তবে গুরু, কোন ডালের কোন শিরায় তোমার বাস?

রবি ঠাকুর তখন স্বর্গ না নরক বোঝা গেলো না, তবে যেখানেই হোক না কেন কোথাও বসে কবিতার একটি চরন লিখিতেছিলেন – পেলো না উত্তর।

অতএব, পুনরায় গুরু গুরুই রহিলেন।

এতক্ষণ পর পর্দার ওপাশের সোহবত খতম হলে যে যার যার উঠবার জন্য বেস্ত হইলেন। রাজেদ আলি খান তখন সমবেত সুধির কাছে জানতে চাইলেন, মরলোকের আলোচনা যদি একটি গল্প হয়ে ওঠে, তবে সঙ্কটে শরন পাবার জন্য গল্পটা কি তার জ্ঞাতিভাইদেরকে অন্য কোনও এক সন্ধ্যায় কিঙবা অন্য কোনও অলস সময়ে আমাদের কাছে ভিড়তে দেবে না? গল্প যা বলতে চায় তা কি সে পেশ করবে না আর কখনও?

মাজেদ ফকির বলিলেন, গলফোরে আগে জিজ্ঞেস করেন সে কার পক্ষে।

গল্প তখন বলিলো, দুই কুকুরের হাড্ডির লড়াইয়ে হাড্ডি যে পক্ষের হয়ে লড়ে, আমার সেই পক্ষ!

১৭/০৪/১৭

এনফেন

খুন্নার যখন এনফেন-এ পড়ে তখন আদ্যিকাল হোলেও সম্ভবত বক্সাইটের যোগান ভালো ছিলো। নইলে কেমন করে অজপাড়াগায় তার ছোট্ট হাতে এলুমিনিয়ামের একটা আস্ত স্কুলবক্স চলে আসে? বক্স-এর সঙ্গে বক্সাইটের সম্বন্ধ কেমন করে হলো সেটা জানি না, আদৌ কোনও সম্পর্ক হয়েছিলো কি না তাও জানা নেই, তবে খুন্নারের ওই বক্সের সঙ্গে কিন্তু একজনের দৃষ্টির সম্বন্ধ হয়েছিলো। আজকে সেই গল্প বলতে বলতেই স্মৃতির প্রান ফিরিয়ে আনা যায় কি না সেই চেষ্টা করবো। স্মৃতির পাতায় পাতায় লেখা আবছা হয়ে যাওয়া ইতিহাস বিশ্বাসঘাতকতা না করলেই হলো।

আদ্যিকালের ওই সময়ের ইতিহাসে এ কথা লেখা আছে যে, অমন ডাকসাইটে বাকশো এনফেন-এ আর কারও ছিলো না। ফলে বাকশো যার, সে নিজেও ডাকসাইটে, ক্লাসে সে টম-ডিক-হ্যারি বা ছলিমোদ্দিন-কলিমোদ্দিন বা শ্যাম-যদু-মদু না, বরঙ ‘শ্যাম সমান’! অর্থাৎ কৃষ্ণ। ফলে গল্পের নিয়মে একজন রাধার চরিত্র মোক্ষম, নইলে কেমন করে তার দৃষ্টি বাকশোর উপরে নিবদ্ধ হবার বহু যুগ পরেও ‘যা যাবার একেবারেই কি গেছে’ অর্থাৎ স্মৃতি হাতড়ানোর আগেই স্মৃতি মুখের সামনে এসেই বলে, হাজির! রাধার আগমন অনেক পরে। কিন্তু তার ইতিহাস ওই স্কুল বাকশোর আমল থেকেই লিখিত। সোনার অক্ষরে না হোলেও, কালির অক্ষরে তো বটেই।

এক্ষনে খুন্নার পরিচয় আবশ্যক হয়েছে। কেলাসে সে ডাকসাইটে, তাই নায়ক। কিন্তু দেখতে সে আদপে নায়কের চাকরের মত। বড়জোর সে নায়কের গাড়ির শোফার হতে পারে। বদখত মুখের যে আদল সে পেয়েছে, তা সম্ভবত তার পিতৃসূত্র থেকে উদ্ধৃত। এ নিয়ে তার মনোস্তাপের সিমা তাকে অগ্নিদাহে জালাতো-পোড়াতো কিনা জানা না গেলেও, সে অনেকের মাঝে খবর হয়ে থাকবার জন্য ফুলবাবু নয় বরং জামা-কাপড় বাছলো ছাদছিরিহিন, অন্যের থেকে নিজেকে দিনহিন করে পার্থক্যকে স্পষ্ট করে তুলতে চেয়ে সাধারণত্বকেই বেছে নিলো।

খুন্নার বলে, তলস্তয় আমার একদিনের বড়ো।

স্কুল বাকশোর যুগ পেরিয়ে অনেকদিন পরে রমা নাম্নি বিশেষ এক নারি, যে ‘শ্যাম-সমান’ খুন্নার রাধা হয়েছিলো, একান্তে তাকে বললো, বুঝাও।

খুন্নার তখন বুঝাতে শুরু করে, আমার চেহারা দেখো, নিতান্ত চাষাভুষোর। আমার সারা-দেহ-মন তোমার সামনে এই গভির রাতে, আহা কি লজ্জা! কেউ নেই, কে যেন দেখে! এ কি উতকর্ষা! এই উতকর্ষা নিয়ে তলস্তয় জন্মেছিলেন কিনা জানি না, তবে জন্ম হয়েছিলো তার আমার যেদিন অর্থাৎ উনত্রিশে আগস্ট, তার ঠিক একদিন আগে। বছরের হিসেব দিয়ে তার সঙ্গে আমার দূরত্ব বাড়তে চাই না। তার লম্বা হাত, সে শারিরিক গড়নের কিম্বা দাপুটে জমিদারি সক্ষমতার, আমার উভয়ার্থে তা খাটো, কিন্তু একদিনের অগ্রজ হিসেবে উনি আমার খুব কাছেই। নিতান্ত বুদ্ধিহিন নির্বোধ চেহারা নিয়েও কেমন করে দশজনের একজন হয়ে উঠবেন তিনি – এই যখন তার পন, অমনি টুপ করে আমিও শিকে লিয়েছি তার কাছ থেকে।

রমা বলে, এইজন্যই কি প্রেমে পড়ার ত্রি বাসনা তোমার?

খুন্নার সামান্য একটু শ্রাগ করে, এই জন্যই কি আজকে রাত তুমি এখানে কাটাবে বলে এসেছো?

পবিত্রতার বোধকে সেই রাতে তারা বাচিয়ে রাখলো। সেই রাতে বিশ্বপ্রকৃতি ও আকাশে চাদ, সব যেন একাকার হয়ে গেলো।

রমা বললো, চলে যাবো?

খুন্নার দিধাগ্রস্ত, কেন তলস্তয় কি ফিরে এসেছিলেন? তিনি বলেছিলেন, সেখানে যে-জন্য যাওয়া তাই করলাম, এবং তারপর কান্না। আমাকেও কাদতে দাও। আমি কি কাদবো, কিছু হারানোর জন্য? ধরো কৌমার্য? অথবা, কি চলেই যাবে? তা যাও, কিন্তু, না কেন থেকেই যাও না, অথবা...

রাত গভীরতর হচ্ছে। কিন্তু তবুও পবিত্রতার বোধের জন্ম হলো। কৃচ্ছতাসাধন।

রমা বললো, সে তোমার স্বাধীনতা, কিন্তু যা-করলে তোমার নায়কত্ব ঘুচে যাবে তাকে নিয়ে আগে একটু ভেবে নাও।

সব কিছু করার আগে এত কিছু ভেবে-টেবে নিলে কি চলে? কিন্তু তবুও খুন্নার নায়ক। তবে সিনেমার নায়কদের পতনের দৃশ্যায়ন শেষ হবার পরে দর্শক যখন তার উত্থানের প্রত্যাশায় বসে থাকে আসনে, নইলে তো টিকেটের দাম মাঠে, তাই পরিচালক মুনাফা ভেস্তে যাবার ভয়ে জীবনের আসল ঘটনা কেটে নতুন করে উত্থানের চিত্রনাট্য বানান। এ না হলে অবশ্য প্রযোজক নিজেও অবশ্য তার বাবার জন্মেও সিনেমায় টাকা ঢালবার হিম্মত করবেন না। সিনেমায় তাই ‘হেপি এন্ডিং’ প্রত্যাশিত। অর্থাৎ সিনেমার নটের পতনের পরে থাকে উত্থানের ইতিহাস। কিন্তু খুন্নার পতন অবধারিত হবার পরে তার ইতিহাসের সমাপ্তি অর্থাৎ ‘দি এন্ড’ নেই। জীবনের সিনেমায় কারও কারও পতনই হলো গিয়ে নাটকের অবধারিত স্ক্রিপ্ট। অর্থাৎ পতনের সম্ভাবনারা খুব বেশি মাত্রায় এটে আছে জীবনের অনুসঙ্গ হয়ে।

তবে ভোগ থেকে ত্যাগে, বিলাস থেকে তপস্যায়, পদস্বলন থেকে আত্মশুদ্ধি, ক্রোধ থেকে প্রেম, অ-প্রেমজাত ঘৃণার অন্ধকার থেকে মানবহিতের বোধের আলোয় যে-উত্তরন, এই ট্রানজিশন তলস্তয়কে অনন্যসাধারণ করে তুলেছে, খুন্নার সাধারণের মত শুধু বাচার চেষ্টাটাই করে যাচ্ছে এখনও। ক্ষুদ্রে পাণ্ডগুটে চোখে চেয়ে থেকে বলে, তবুও তলস্তয় আমার ভাই।

রমা বলে, বরং বলো, শিক্ষক।

এনফেন কেলাসের অনেক পরে হোলেও খুন্নার একদিন যখন বড় হলো, তখন রমার সঙ্গে একাত্মা হলো, গভীর রাতের কাহিনির সূত্র প্রয়োগে সেই কথা বোঝা যায়। এই কিসসা মানুষের জীবনের জন্য তত বেশি বিশেষায়িত না এই জন্য যে হাটে বাজারের অনেক বলা বা শোনা গল্পের মত এও তেমনই একটা গল্প। তবে ধন্য লাগে যখন জানা গেলো যে, রমা তাকে গ্রহন করেছিলো বিরহের গান দিয়ে! অর্থাৎ ‘হেপি স্টার্ট’ – এ কিনা বাজলো দুঃখের গান!

আমরা বললাম, হেবিস তো!

খুন্নার আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকলো, অথচ কোনও কথা বললো না।

খুন্নার বন্ধু এ কথা শুনে বললো, তাতে কি! সুখ-দুঃখ চিন্তা করে কি আর প্রেম হয়!

হক কথা।

কথায় কথায় খুন্নার ভাব-দন্দ যখন চরমে বলে তার স্বিকার্য নিয়ে আমরা আলাপ করছিলাম তখন সে এসে বলে, গানে আমারে ভুলায়নি। প্রেমে মার্জিত রুচিবোধ যতক্ষণ শেকল ভাঙে না, ততক্ষণ তা শিল্প।

আমরা শিল্পবোধের বিপরিত একটা সঙ্গ দাড় করাতে চাইলে খুন্নার বলে, ওটা প্রেম নয়। যে মন্ত্রবলে অ-প্রেম শান্ত হয় তার হৃদিস যদি কেউ না পেয়ে থাকে তবে তার দায় প্রেমের উপরে ঠেলে দেয়া অনুচিত। প্রেমের বেপারে রমার সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া গল্পকে তোমরা যদি ঐতিহ্যকে মেনে নেয়া বলো, তো বলো।

আমরা বলি, তার মন জোগাতে যোগির ভূমিকা নিয়ে দু এক চরন প্রেমের কবিতা...

আমাদের কথা শেষ হওয়ার আগে খুন্নার নজরুলের কবিতার চরন আওড়ায়, ‘অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু যাহারা আছো সুখে।’ তারপর বলে, আমার জন্য বাচা, তোমাদের জন্য বাচা হলো শিল্পময়, আমার জন্য শাক ভাত। এতে মাছ ঢাকার উপায় নেই। মাছের বিলাস আমার নেই।

আমাদের কেউ তখন বললো, তাহলে রাধারূপি রমাকে খোলাসা করে বললেই হয়!

রাধার খোলস নিয়ে দুর্ভাবনা করো না। তার অভিজাত্য হলো তার সততা। এটাকে খোলস পরিয়ে রাখা যায় না। এটা জন্ম থেকেই প্রকাশিত। তাকে চিরকালের কবিতা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, কিন্তু তবুও সে স্বতত। তোমরা যতই তার ‘হেপি স্টার্টিঙ’-এ বিরহের গান নিয়ে মসকরা করো না কেন, তার সুর একই তারে বাজে। ওইটেই তার খেয়াল। তোমরা বলবে, তাহলে তো বেপারটা বৈচিত্রহীন। কিন্তু তা হচ্ছে প্রতি রাত্রের অমোঘ আন্ধার, অথবা প্রতি দিনের আলো। একে অস্বিকার করা যায়না জীবনের অনুসঙ্গ থেকে। তার দিকে ফুল্লনেত্র কিঙবা বিকচ দস্তে চেয়ে থাকতে গিয়ে সন্ধে হয়ে না গেলেও সন্ধে আসতো, এবং পরের দিন আবার সতর্কদৃষ্টি দিয়ে রাস্তায় গতায়াতকারি যাত্রিতালিকা থেকে অপেক্ষমান হতে হতো। বিরহের গানে গানে শুরু হওয়া এই হলো আমাদের প্রেমের নিদান।

সেদিন আর কোনও কথা হয়নি।

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। খুন্নার তখন অন্ধকার যুগ। খুন্নার মনের উঠোনে শিতের তুষারপাতের কাল। উঠোনের গাছ-গাছালিতে সেই তুষারপাত হয়ে ঢেকে যায়, তার কিছুদিন পরে বৃক্ষের সমস্ত পাতাদের মৃত্যু মনের সেই জগতকে আরও বিষন্ন করে তোলে।

উচ্চশিক্ষা গ্রহন করার খায়েশ যখন তার জীবনে সঙ্গিতের মতই মুখ্য হয়ে উঠলো, তখন থেকে তার জীবনের বাকিটুকু বরসা ও আন্ধার। সঙ্গিতে পড়ার জন্য বাড়িতে পিড়াপিড়ি করলে বাড়ির কর্তা-কর্ত্রি খুন্নার মনের পিড়ার কারন হয়ে দাড়ান। তারা বলেন, যাও, আজ সন্ধ্যয় হাটে জাইয়ে খবরের কাগজ এনে নিজের ক্রমিক নম্বর খোজো গে।

খুন্নার অগত্যা তার পড়ে পাওয়া এক আনা দু আনার এক বন্ধুকে নিয়ে হাটে গেলো। তখন সন্ধে গড়িয়ে আন্ধার নেমেছে হাটের ‘হাট’-এ অর্থাৎ কুড়েরগুনোতে।

পত্রিকার পাতা উলটে পড়ে পাওয়া এক আনার দোস্ত খুন্নারকে শুধায়, আরে ভাই, পরিক্ষা দিলেই কি আর বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স হইবে? এই দেহো, কুতখাও তুমি নাই!

বন্ধুর গলায় আনন্দের আতিশায্য। উচ্চশিক্ষা গ্রহন করতে না পারার এই নিশ্চয়তা বন্ধুকে এই এইভাবে এক বিকৃত আনন্দভোগি করেছে যে, তাকে টকপে অজপাড়াগার এই বাঙালি ভুতে যদি কালক্রমে শিক্ষায় দিক্ষায় মেলা উপরে উঠে যায়, তালি তার আর সমাজে মুখে থাকে না। অতএব আনন্দ প্রকাশে সে দ্বিধাহীন।

‘তুমি নাই’ এই ছোট্ট বাক্য যে সন্ধেকে সাপের মতন পেচিয়ে ধরে তার মাথার ভেতরে ঢুকে যেতে থাকে, অথবা তাকে জড়িয়ে ধরতে থাকে, অথবা যে কি তা সে নিজেই জানে না। চা-এর দোকানের মেগনিশ কাঠের ধোয়া এসে তখন লাগে নাকে। কাঠের গতরে লেগে থাকা ছাল-চামড়ারা টাস টাস করে আঙনে ফুটতে থাকে। নাকে মুখে ধোয়ার গন্ধ, আর সর্দি তখন একাকার। খুন্নার তবু তারে উলটো শুধালো না, তোমার কি খবর। বরঙ মনে মনে ভাবতে লাগে, পরিক্ষা আমার কি এতোই খারাপ হয়েছিলো!

পড়ে পাওয়া আধ আনারও যোগ্য নয় এমন বন্ধুর আরও মন্তব্যে সে সম্বিত ফিরে পেলো।

সে বলে, এত্তো সোজা না ভাই, চলে কি আর করবা!

খুন্নার ভাবে, তা বটে, বিষয়টা কঠিন।

বন্ধু আরও যোগ করে, দেশের সেরা বিদ্যাপিঠগুলোতে সুযোগ পাতি হলি যে কায়দার পরিক্ষা দিতি হয়, বাব্বা!

তা বটে!

খুন্নার ভাবে, বন্ধু তো তালিকার তলানিতে অর্থাৎ শেষ দিক দিয়ে আমার রোল খুজেছে, দেখিনা উপরে সেই মানুষেরা কারা যারা চান্স পেলো!

খুন্নার অনেকদিন পরে যখন এই গল্প আমাদের বলেছিলো তখন আমাদের সবার ‘থ্রি ইডিয়ট’ সিনেমার গল্প মনে পড়ে।

খুন্নার বলে, আমি আসলে এত বড় ইডিয়ট নই। কিন্তু বাশের ভাঙা চাটাইয়ের চায়ের দোকানের পাশে সন্ধের অন্ধকার ঘনিয়ে এলেও আমি আমার বন্ধুর মুখের চেহারা দেখতে পারি চুলার অঙ্গারের বাড়াবাড়িতে। অঙ্গার বেটা বেদ্প! কেন যে অঙ্গারটা অন্ধকার হয়ে এলো না! তাহলে আর পড়ে পাওয়া আধ আনার বন্ধুর মুখের চেহারাটা আমাকে তখন আর দেখতে হতো না!

পড়ে পাওয়া সিকি আনার বন্ধুও যে নয়, সেও একদিন সে কোনও একদিন অপেক্ষমান তালিকার পরে আরও যে লিস্ট থাকে তারও অনেক পরের ‘কনসিডারেশন’ অর্থাৎ বিশেষ বিবেচনায় কোনও এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়তে পেরেছিলো। কিন্তু ভর্তি হলেই তো কেবল ফতে। সেখানের রেজিস্টারির খাতায় এ কথা লেখাও থাকে না যে, ‘এই মাল বিশেষ বিবেচনার’। খুদাও তাকে নিরাশ করেন নি। আমরা জানতে পারি, সেই বন্ধু নাকি অনেক টেকা করেছে। পকেট তার খালি, কিন্তু বেঙ্কের বেলাপের পেট মোটা। কিন্তু মেধা তালিকার স্থানান্তরের উতকর্ষ খুন্নারকে তার দাবি অনুযায়ী একজন পাকা ইডিয়টই বানিয়েছে, ‘থ্রি ইডিয়টস’ এর ইডিয়ট সে হতে পারেনি। সে কিছুই হতে পারেনি সেই সমাজের।

অর্থাৎ সেই সন্ধ্যায় খুন্নারের সঙ্গিত নিয়ে পড়ার যে খাহিশ, তার বারোটা বেজে গেলো! বাড়ি ফিরলো সে। বাবা চোখ রাঙিয়ে বলেন, ইঞ্জিনিয়ারিঙ খুয়ে গান! মাইরে থোবোনানে কিন্তু! যা, গিয়ে ভর্তি হয়ে আয় কলাম!

তথাস্তু।

দেশের সেরা বিদ্যাপিঠগুলোর যেখানে যে ক’টা ছিলো, তার সবগুলো চরিয়ে ঠিক কোন যায়গায় স্থায়ী হলে জীবনের গতিটারে অগতির কাছে রাহালি দিতি হবে না, সেই চিন্তায় খুন্নার বেহুশ। কিন্তু জীবনের জন্য চাই হুশ, হুস পরে কে চলতে যায় যখন হাতের মধ্যে আছে সুযোগের চাবি! অতএব খুন্নার চললো এক অধ্যাপকের কাছে। উদ্দেশ্য, সত পরামর্শ। ইনি অধ্যাপক হিসেবে কেমন তা তার জানা ছিলো না, কিন্তু নামের আগে ‘পোরবেছার’ অর্থাৎ অধ্যাপক শব্দটা জুড়ে গেলেই যে কুকুর মানুষ হয়ে ওঠেনা, খুন্নার তা বুঝতে পারলো। উনি কুলিন হবার পর গিরাম থেকে উপজেলার শহর বলে বিবেচিত হয় যে জায়গা, তারই কাছেপিঠে কোথাও দেশান্তরি হোলেন। খুন্নার তাকে গিয়ে সবিস্তারে সব কিছু বর্ণনা করার পরে কলেজের সেই পোরবেছারের কিছুতেই বিশ্বাস হতেই চাইলো না যে, তারই নিজের গিরামের, যে গিরাম থেকে তিনি উঠুলে হয়েছেন শহরে, নাম না-জানা এক ছোড়া কিনা ‘এক্সেল’ করে ভর্তি পরিক্ষায়! এও সম্ভব!

তিনি যা যা ভাবছিলেন বা ভাবতে পারতেন তার একটা কাল্পনিক খসড়া এমন –

নায়, নায়, এ হইতে পারে না! দেশ বিদেশে পড়তে যাবে আমাদের মতন অভিজাতদের ছেলে-মেয়েরা। তাদের জন্যই সামাজিক সুখ, শিক্ষা ও প্রতিপত্তি! এ কুথাকার কে, কেমনে হইলো এ! নায়, নায়! (মনের আরও গভিরে) পরিক্ষার খাতায় কি কোনও গন্ডোগোল! এই মানে!

এই ভাঙনের খেলা বোঝা গেলো অধ্যাপকের মুখের দিকে তাকিয়ে। তার কালো কুশ্রি মুখটা সেদিন অতি উতকৃষ্ট জাতের প্রভুভক্ত এক শ্রেনির প্রানির পুচ্ছের মত রঙ ও বৈশিষ্ট ধারণ করেছিলো, হিঙসায় চোখগুলো হয়ে গিয়েছিলো আরও বেশি প্রকট। রাগের চিত্তছেড়া পাপিসত্তাকে ঢাকতে তিনি নিশ্চুপ মাটির দিকে তাকিয়ে পান্ডিত্যের আরও অনেক বেশি অভিনয় করতে থাকেন। ওই মঞ্চনাটকের অর্থ খুন্নার সেদিন সবে কৈশোর ছাড়ানো যৌবনে বুঝতে না পারলে এখন নাকি বোঝে!

খুল্লার আমাদের বলে, উপেক্ষা যাদের স্বভাবধর্ম, উল্লাসিকতা ও অতিচতুরতা যাদের জাতিয় বৈশিষ্ট্য, তাদের কোষাগার সঙ্করক্ষিত হয় উপার্জনের নিমিত্ত অনেক অর্থে, তা শুধু নিজেদের ভোগের জন্য। তাদের অর্থ ও মেকি সম্মানে ভুসিত হওয়া কমনমেন বাঙালিদের কাছে অভিজাতদের আত্মধ্বংসের পথ। কিন্তু কমনমেনেরা চুপ করে থাকে। চুপ করে আছি। দুরাত্মা কখনও আত্মীয়তাবোধ অনুভব করে না। এমন কি নিজের রক্তসম্পর্কীয় সজনদের মধ্যেও না। নিজের অতি আপনজনও যদি কালের বিচারে নিতান্ত মন্দভাগ্য হয়ে বসেন, খুসার কৃপায়-অকৃপায় জন্ম থেকেই বিকলাঙ্গ হয়ে অন্যের করুণার এতটুকু আশা করেই বসেন, এমন কি তাদেরকেও এহেন ঠুনকো অভিজাতেরা সাহায্য পাওয়ার যোগ্য মনে করেন না। অতএব তার মত নিচু ও হিন মানসিকতার কারও কাছ থেকে খুল্লার যদি নেহাত কোনও উপদেশ বা পরামর্শ না পায় তবে, তবে এই দুরাশার বস্তু কিছুতেই তার কাছে কাম্য হওয়া উচিত না। অনেক দিবস গত হয়েছে। খুল্লার এখন বোঝে। দুরাত্মা অনেকের মধ্যে প্রাধান্য পেলেও জনসমুদ্রে অব্যক্তি। কমনমেন-দের মনে মনে তো বটেই।

পচার দোকানের পাচ পয়সার সুপার বিস্কুট খেতে খেতে আমি রমাকে বললাম, সার আমারে যন্ত্রকৌশল পড়তে বলেছেন। এ বিষয়ে পড়তে গেলে আমারে রাজধানি যেতে হবে শুনে রমার বেজায় মন খারাপ হলো।

সে বললো, তা বিভাগিয় শহরে কি ক্ষতি করলো তুমারে? সেও কি নয় ভালো?

খুল্লার বলে, পচার দোকানের সুপার বিস্কুট খেয়ে খেয়ে এই উত্তর দেয়া সম্ভব না। এতে মাথা খোলেনা।

মুক্তি এবার ওকালতি করলো, এই ক্ষণে আমার একখান কথা আছে, খুল্লারের যদি মতিতে দুর্গতি না হয় তবে আমাদের থেকে দূরত্ব বাড়াইওনা ভাই।

খুল্লার ককিয়ে ওঠে, আমি দুর্মতি, আমি অধম, ওরে আমারে ধরো, আমি এই সুপার বিস্কুট খেতে কেন তোমাগো দাওয়াত দিলাম! পচা পচা-ই থাকতো, সেও ছিলো ভালো! আমি এখন কোন পক্ষের?

মুক্তি আবারও বলে, আত্মবিসর্জনে কি ক্ষতি?

খুল্লারঃ আত্মবিসর্জন নাকি আত্মধ্বংস?

মুক্তিঃ কৌতুকের সময় যখন আসবে, তখন জেনো যে তুমি ভবিষ্যতের একজন লেখক হয়ে ভুতের স্মৃতি রোমান্থন করবে। আজকে এ নিয়ে কেন তোমার এত ছল?

খুল্লারঃ গল্পের নায়িকা কি তুমি, মুক্তি?

মুক্তিঃ তবে আমার সাইড রোলে মতি নেই। আমি জড়িয়ে আছি। তুমি লোক চটিয়ে কি আনন্দ পাও খুল্লার?

খুন্নারঃ আমি লোক চড়িয়ে আনন্দ পাই। তবে মনে মনে। ভবিষ্যতে যদি চড়ানোর সুযোগ আসে, তবে জেনে রেখো, সম্ভাবনার একটিও মিস করব না।

মুক্তিঃ ভবিষ্যতের কথা এখন শিকেয় তুলে রাখো।

খুন্নার কথা রেখেছিলো, কিন্তু তাতে পরবর্তি চার বছর তার জীবনে অন্ধকার এলো। তার মনের ভেতরে জন্ম নিতে থাকা অহম-এর যে পর্দা তার অজান্তেই তৈরি হয়েছিলো, সে পর্দা ভেদ করে আলো আর আসতে পারেনি বলে তার খেদের অন্ত নেই সত্য, কিন্তু যখন অহমকে সে জানতে পেরেছে বলে স্বিকার করে, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিলো। অর্থাৎ একজন আত্মস্বিকৃত খুনির জন্য বিচারের কাঠগড়ায় পচার দোকানের বিস্কুট খাওয়ার ঘটনাকে কিছুতেও দায়ি করা চলে না। এ দায় তার একান্ত নিজের। খুন্নারের এই হলো আত্মস্বিকৃতি। খুন্নারের ভাষায় – আমার জীবনের জন্য যা কিছু, তা বরসার ঘোলা জলে ভাসা। জীবনের চারদিক যদি বলি শুধু অন্ধকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই চার বছর হলো ঘোর অমাবসসা।

কিন্তু তোমার গান আর ক্রিড়ার খবর যা কিছু শুনি তাও কি ওই অন্ধকারে মোড়া? আমরা এ কথা তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, সঙ্গিতে চ্যাম্পিয়ন, সে নজরুল-রবিন্দ্রনাথ-দেশপ্রেম কিংবা লোক সঙ্গিত। তাতে লোক হাসাবার উপায় করিনি আমি, লক্ষন মেনে সঠিক সুরটা উগরে দিতে পেরেছিলাম বলেই অন্ধকারকে পাশ কাটাতে পেরেছিলাম। ক্রিড়ার অনেক বিভাগের নায়ক হয়েও আমার আধার ঘোচেনি সত্যি, কিন্তু অমানিশার অকুল পাথারে এই-ই হলো আমার কোনওরকমে বেচে থাকা।

আমরা আবার জিজ্ঞেস করি, আর পড়াশোনা?

খুন্নার হাসতে হাসতে বলে, জীবনের সবটুকুই প্রেম, গান, খেলা আর ভ্রমণ। বাকিটুকু পড়াশোনা। যদি তার জন্য কোনও সময় বরাদ্দ পাওয়া যায় তবেই। আমার কোনও বন্ধু নেই। আমার বন্ধু ছিলো না। বন্ধুত্বের সঙ্গা আমার কাছে অন্য রকম। ফলে আমার তেমন বন্ধু যেমন নেই, যেমন-তেমন বন্ধুও আমার হয়নি কেউ। আমি একা। আমি নিঃসঙ্গ। প্রেম আমাকে যা দিতে পারতো দু হাত ভরে, তা আমি নিতে পারিনি। নিঃসঙ্গতা কাটেনি আমার।

আমরা তাকে বললাম, দুই অর্থবোধকতা তোমার স্বভাবধর্ম। যা বলার তাকে খুলে বললে বুঝতে যেমন সুবিধে, তেমনি সত্য উন্মোচন হবার আশাও তাতে থাকে।

সত্য যা, তাকে বুঝি বলেই তাকে বলতে পারি না। আর বলার সবকিছুকেই একেবারে দিনের আলোয় নেঙটো করে দিলে আর আমার ফর্ম থাকে না।

আমরা এই কথায় অধৈর্য হয়ে থাকে বললাম, তোমার প্রেমের গল্প শুনাও।

খুন্নার তখন ছড়া পড়ে,

দক্ষিণে কৃষ্ণ হাসে, পশ্চিমে রাম

উত্তরে পথ ধরিলে বিধিরাও বাম।

এই ছড়া শেষ হলে খুন্নার বলে, আমার প্রেম এখানে শেষ। একে সবাই লাম্পটি বলে। সমাজের কাছে এটা আমার ফর্ম অর্থাৎ পরিচয়। এই ফর্ম নিয়ে আমি যদি বেচে থাকি তবে সমাজ খুশি।

আমরা তাকে বললাম, কিন্তু তোমার জীবনের শুরুতে যে বিরহের গান তুমি শুনেছিলে, তা আসলে এন্টি-থিসিস। ওটার মেটাফোর তুমি বুঝতে বের্থ হয়েছিলে বলেই তোমার ফর্মকে সমাজ ডিফর্ম করে নিয়েছে। এখন এইটেই তোমার ফর্ম হয়ে গেছে খুন্নার।

চারিদিকে খুন্নারের যখন অনেক আঁকার, তখন আবার এলো রমা। হাতে ছিলো তার আলো। কিন্তু তা দিয়ে কেমন করে জালাতে হয় অন্যের জীবন তা যেমন ছিলো না তার নিয়ত, তেমনি আলোয় আলোয় খুন্নারের জীবন আলোকিত করবার দায় যখন সে অনুভব করে, খুন্নার তখন তাকে নিগৃহিত করে। উত্তরের বাতাস লাগে তার গায়ে। খুন্নার জানেনি, এ হলো শিতের বাতাস, এ বাতাস গাছকে শুকিয়ে দেবে, পাতাকে ঝরিয়ে দেবে, আশাকে অব্যঞ্চিত করবে, ভালোবাসাকে বঞ্চিত করবে, অপমান করবে। সে জানেনি, জানতে পারেনি, তাই সে মোড়কের মত খোলাসা করা মনোহরি দোকানের সস্তা ও ঝকঝকে সামগ্রির মত এক অন্তসারশূন্যতার ঘোরে আটকে গেলো। চুম্বকের মতন এর টান, কিন্তু রেশ ক্ষনস্থায়ি। এই টানের আবর্তে জড়িয়ে পড়ে রমাকে যখন সে দূর করেছে, তার জীবনও তেমন করে ভবিষ্যতের আরও অন্ধকারকে টেনে এনেছে এক অসম জীবনমোহের গন্ডিতে। এই আধার ভেদ করে আবার বেরিয়ে সে। তেমন সাধ্য তার নেই।

সেদিন বিনা প্রশ্নে রমা পেছন ফিরে চলে গিয়েছিলো দূর থেকে অনেক দূরে। কিছু পেছনে ফেলে রেখে গিয়েছিলো অনেকগুলো প্রশ্ন। খুন্নার সে প্রশ্নের জবাব খুজছে। কিন্তু সমুখে আধার, চারিদিকে ঘন কালো পৃথিবী। হাতড়ে খুজতে গেলেও না পাওয়ার ব্যথা আছে।

পৃথিবী কারও কারও জন্য উদার, কারও জন্য পৃথিবীর কোনও টান নেই। কারও জন্য এই পৃথিবী প্রেমময়, কারও জন্য দুশ্চারিত্রিক বেদনার অন্ধকার চোরাগলি। কারও জন্য তা মানসিক শক্তির শৃঙ্খলে জড়ানো অন্ধকুপ। কারও জন্য চিরায়ত দুরাশার হতাশাবেঞ্জক চাহনির তুমুল হাহাকার। খুন্নারের এই হাহাকার আছে। অসীম অপরাধ ও পাপের মনস্তাপ তার আছে।

আমরা তাকে সেদিন প্রশ্ন করেছিলাম, তোমার সেই স্কুল বাকশোর হাতলের যতটুকু অঙ্ক তোমার হাতের মুঠিতে এটে যেতো, বাকিটুকুর দৈর্ঘ্য কি রমা বলতে পারে? অথবা সে কি জানে যে, হাতলের যে দুই মাথা বাকশোর কাঠামোতে আটকে থাকে তাদের ব্যাসার্ধ কত?

আমাদের মধ্যেই একজন এর উত্তর দিয়েছিলো, সে তার পারিবারিক জীবনের নিয়ম ভেঙেছিলো নিজেকে সমর্পণ করে। বাড়বেলার সেই আপদকে সে যদি শৈশবেই টেনে থাকতো, তবে হয়ত সে তা জানতো।

আর একজন বললো, রমা হয়ত তা জানতো। তার দৃষ্টির সিমা থেকে অসিমে যে জগত সে তৈরি করেছিলো তা শুধু খুন্নারের খেয়ালি জীবনের জন্য।

কে আর একজন বললো, একজন লেখক বলেছিলেন, ভুলো-মনা মিনসে দু-পায়ে দু-রকমের জুতো পরে বেরোতে চেষ্টা না করলে সুগৃহিনীর সুখ কোথায়? বেত যদি অনাবশ্যক হয়ে ওঠে তবে মাস্টারির সাদ যেমন ফিকে হয়ে যায়, দৃষ্টির সরলরেখায় প্রেমে যে নিয়ম ভাঙা, তার বেলায়ও ওই একই কথা।

শেষে আমরা খুন্নারের কাছে জানতে চাই, তা যখন তোমরা এনফেন- এ পড়তে তখন তোমরা কতটুকু ছিলে?

খুন্নার উত্তর করে, কেন! তখন আমরা ইনফান্ট ছিলাম!

আষাঢ়ের একটি ভূতের গল্প

যাকে তাড়াতে *এক্সরসিজম* করা হলো তার *সারকামসাইজ* করা গেলো না। সে এসেছিলো একটা বৌদ্ধ মন্দির থেকে। অন্তত এমনটাই দাবি। গলার ভেতর থেকে বিকৃত সুরে আসা এলোমেলো শব্দে তেমনটাই নাকি বোঝা গেলো। অর্থাৎ এ ভূত মুসলিম নয়। কিন্তু ঘাড়ে উঠেছে মুসলিমের। একেবারে মুসলিম যুবতি নারি যাকে বলে! মাথায় হিজাব, গায়ে আবরু ঢাকার জন্য যথেষ্ট পরিমান বস্ত্র। কি করে এবণ্ড কোন রূপে মুগ্ধ হয়ে এর ঘাড়ে বৌদ্ধ ধর্মীয় ভূত উঠলো বোঝা মুশকিল। আচ্ছা সে যা হোক, কিন্তু দৃশ্য কিন্তু বড়ো ভয়ঙ্কর! মেয়েটা তার শরিরে এত বল কোথা থেকে পেলো, একেবারে স্লিম শরির! কয়েকজন বান্ধবি মিলেও তাকে ঠেকিয়ে রাখা মুশকিল হয়ে যাচ্ছিলো। বান্ধবীদের সাজপাঙ্গ মিলে তা প্রায় পনেরো জনের মত ভেতরে প্রবেশ করেছে। সবার হাতে পবিত্র কুরআন শরিফের একটা করে কপি। এবার ধুমছে শুরু হয়ে গেলো তেলাওয়াত – কেউ সুরা জিন, কেউ সুরা বাকারা, কেউ সুরা ফাতিহা। এমন সময় আমি উপস্থিত! আমাকে আসলে এদের মধ্য থেকে একজন জিনের আছরে ঘটা দৃশ্যাবলি দেখানোর জন্য দাওয়াত দিয়েছে। রাত তখন দ্বিপ্রহর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু আমি পেজা তুলোর মত সন্ধে থেকে ঝরে যাওয়া বেহায়া বৃষ্টিটা মাথায় করে ছুটলাম ঘটনা উপভোগ করার জন্য। গিয়ে দেখি উপরে বর্ণিত তুমুল কান্ড চলছে – চার পাচজনে মেয়েটিকে মেঝেতে ফেলে চেপে ধরে আছে, সাত আটজনে পবিত্র কুরআন থেকে আবৃত্তি করছে, কেউ মোবাইলের এমপি থ্রি আজান তার কানে ঠেসে ধরেছে। প্রথমে ভ্রম হয়ে গিয়েছিলো মুহূর্তের জন্য, ভাবছিলাম এরা কি ঠেসে একে মেরেই ফেলে কি না!

আমি এদের মধ্যে সবার চেয়ে বয়সে জেষ্ঠ। ফলে উপদেশ দেবার কিছু জন্মগত অধিকার আমার আছে। কিন্তু ভাষা নিয়ে বিস্তর সমস্যা হবে ভেবেও আমি শুরু করলাম বয়ান। এদের মধ্যে একজন ছিলো, অর্থাৎ যে আমাকে নিমন্ত্রন করেছে এই নাটকটি দেখার জন্য, সে কিছু ইঙরেজি জানে। কিন্তু সুরা ফালাক আর সুরা নাস আবৃত্তি করার কথা বলতে আর ইঙরেজির দরকার হলো না। সুরার নাম উচ্চারণ করে ইশারায় বাকিটা বুঝিয়ে দিতেই যে যেখানে ছিলো সেটা মূলতবি করে সমস্বরে সুরা দুটো তেলাওয়াত শুরু করলো। কুরআনের এ দুটো অধ্যায় সম্পর্কে যা জানি, তাতে ওই সময়ে এই রিফ্লেক্সটা মনে আসল। এই ফাকে

জেনে নিই সুরা ফালাক এবঙ সুরা নাস নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট। সুরা দুটি আমল করলে জাদুটোনা বা অন্যের অনিস্ট থেকে মহান আল্লাহ রক্ষা করেন। অর্থাৎ শয়তানের কুমন্ত্রনা ও ক্ষতি থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখা যায়। সুরাদুটি নাজিল হওয়ার প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে, হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে লাবিদ ইবনে আসাম এবঙ তার কন্যারা জুত করে প্রিয় নবিজি রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর জাদুটোনা করেছিল। এর প্রভাবে তিনি বেশ কস্টো অনুভব করেন এবঙ এক সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফেরেশতাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা নবিজিকে জাদুকরের নাম এবঙ কোথায়, কিভাবে জাদু করা হয়েছে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে দিয়েছেন। এই ঘটনার মাধ্যমে জানা যায় যে, নবিজিকে চিরুনি ও চুলের সাহায্যে জাদু করা হয়েছিলো, যা জারওয়ান নামের একটি কুয়ের তলদেশে পাথর দিয়ে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল। এই অসুস্থতার সময়ই সুরাদুটি নাযিল হয়েছে। এর পর ফেরেশতাদের বিবরণ অনুযায়ী ওই কুপ থেকে নবিজির ব্যবহৃত চিরুনি ও তার চুলগুলো তুলে আনা হয়। অতপর ওই সুরা দুটি পড়ে নিলে ততক্ষণত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুস্থ হয়ে উঠেন। এই সুরা দুটি পড়লে অনিস্ট ও জাদু থেকে হেফাজতে থাকা যায়। তিরমিজি শরিফ, আবু দাউদ শরিফসহ বেশ কিছু হাদিস সঙ্কলনে এই ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে। আমিও মওকা পেয়ে আদেশ ঝেড়ে দিলুম সুরা তেলাওয়াত করতে। কিন্তু ঘটনা কি! কিছুতেই কিছু হচ্ছে না কেন! একজনকে মেয়েটার পা স্পর্শ করতে বলে জানা গেলো তা খুব ঠান্ডা হয়ে এসেছে। বিপদ! এই জিনের চিকিতসা চলার সময়ে আমার কেন জানি মনে হলো এই মেয়ের পরিবারকে বিষয়টা জানানো দরকার। যদি কিছু ঘটে যায়!

ভুতের ঘটনা ভয়ানক হয়ে ওঠে কখন? অনেকে বলবেন, একা থাকলে। উড়িয়ে দেয়া যায় না এই দাবি। কিন্তু একা বহু লোককে দেখেছি যে রাতে কবরের মধ্যে শুয়ে থেকেছেন। যেমন আমার আব্বা। কিন্তু সেটা পরিস্থিতি। পরিস্থিতির বাইরেও অনেকে খুব সাহস দেখান। যে ভুতের ভয় পায় তাকে সঙ্গ দিলে অনেক সময় ভয় কেটে যায়। কিন্তু যদি এমন হয় যে, যার ভুতের ভয় আছে, সে সব কিছুতেই ভুত দেখছে! তখন কি হবে! তখন কিন্তু বিপদ! ‘এক্সরসিজম’ নামের ভয়ানক একটা ভুতের ছবি আমি দেখেছিলাম। এই ছবি আমার মনের মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যে আজও আমাকে সে ভয়টা তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। যদিও আমি মোটেও বিশ্বাস করি না যে ভুত থাকতে পারে। হুম জিনের বিষয়ে বিশ্বাস আমি করিই, আমি বিশ্বাসি বলেই করি। কিন্তু জিনদের কি খেয়েদেয়ে অন্য কোনও কাজটাজ নেই যে যারতার ঘাড়ে সওয়ার হয়! আর ঘাড়ে সওয়ার হওয়ারই বা কি আছে, সঙ্গ দিলেই তো হয়, যদি তা পারা যায়! যদি তা না পারা যায় তবে ঘাড়ে এসে তেড়ে বসার সম্ভাবনাটাও যত্রতত্র ঘটনা বলেই আমার বিশ্বাস। আর যতটা ঘটে তার চেয়ে বেশি রটে। একটা ঘটনা মনে পড়ে গেলো। এই ঘটনা এপ্রিল মাসের নয় তারিখ, দুই হাজার এগারো সালে রাত বারোটা উনষাট মিনিটের সময়ে খুলনাতে বসে লিখেছিলাম। ঘটনাটা ঘটেছিলো তার দিনকয় আগে। জিনের ঘটনাটা আগে দেখা যাক -

এখন আর কোহিতুরে যাবার দরকার হয়না, জিন-পরিরা এখন পৃথিবিতে আসে। আগেও আসত, এখন এই যে একবিংশ শতাব্দি চলছে, বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ঠেঙিয়ে উদ্ধার করে দিয়েছে সব কু-সঙ্কারকে; তবু এ যুগেও আসে। পরিদের সৌন্দর্য অবলোকনে জীবনের ঐহিক ও পারত্রিক চাওয়া-

পাওয়ার একটি ক্ষুদ্র অংশ পুরনে ঘুম ও স্বপ্নের ঘোর আজ আর দরকার নেই। কাব্য রচনা করে পাঠকদের মনে কল্পনায় সে রাজ্যের অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াবার যে তাড়না, কবির সে প্রচেষ্টার হয়ত ইতি ঘটেছে। পরিরা এখন পৃথিবী রাজ্যে ছুটছে। তাই স্বভাবতই পরিদের সঙ্গে মিলছে দেখা। অশরিরি স্বপ্নের পরি বাস্তবের সাকার মানবের সঙ্গে হয়েছে একাত্ব। জানতে বড়ো ইচ্ছে করে, পরিরাজ্যে কি সঙ্খ্যাধিক্য ঘটেছে? বাস করার জন্য যথেষ্ট জায়গা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা? এই যে আমাদের প্রিয় পৃথিবী, মানুষ গিজ গিজ করছে সব খানে, নতুন করে জায়গা হবে তো জিন-পরিদের? “ঘুম পাড়ানি ঘুমের পরি আয়রে আয় আয়রে আয়, সোনামনির দুটি চোখে ঘুমের পরশ দিয়ে যা”, অথবা “পরিদের রানি এসেঘুমের দেশে আকাশের গায়” ইত্যাদি অজস্র গানের তালে-বেতালে বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে দেবার আজ প্রয়োজন হয়ত ফুরিয়েছে।

স্বয়ং রবিঠাকুর লিখেছেনঃ

সত্য দেখায় যেটা দেখি তারেই বলি পরি,

আমি ছাড়া কজন জানে তুমি যে অঙ্গরি।

যাকে তাকে আর পরি বলে ভুল করার প্রয়োজন নেই। পরিরা এসেছে পৃথিবীতে। সমস্যায় নাকাল মানুষেরা তাদের নিভুদিনের সমসারগুলির যেনো একটা সুরাহা করতে পারে, অসভ্য অদক্ষ মানুষের থেকে তাই আশ্রয় পরিদের কাছে। কিন্তু পরিবিবরা দেখা গেল, দেশের যত অশিক্ষিত, মুর্থ, চন্ডাল প্রকৃতির মানুষের কাছে গিয়ে ভিড়েছে। ভিড়েছে ভালই, আর সঙ্কস্করের নাকের উপর তুড়ি বাজিয়ে তাদের বেবসা-পাতির সোনায় সোহাগা মিশিয়েছে।

জনা-মনি আর রস-মনিরা সাত বোন। এই সাত বোনেরই মতি হল পৃথিবীর মানুষের জন্য গিয়ে কিছু একটা করে। তখন গায়ের আপরিচিত এক গৃহিনীর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। পাগল কিম্বা মাথা খারাপ বলে পরিচিত এই মহিলার সুরে (অসুরের মত শোনায় সে সুর) পাগল হয়ে কোহিতুর থেকে ছুটে আসে সাত বোন। আমি সে সুর শুনেছি। মানে আমার শোনার ভাগ্য হয়েছে (দুর্ভাগ্য বলব?)। আমার এক আত্মীয় পৃথিবীর ভোটের নির্বাচনে হেরে স্বর্গের পরিদের শরনাপন্ন হলেন। সে যাত্রায় সঙ্গি হলাম আমি। গিয়ে দেখলাম সনাতন এক যুবতি (হাতে শাখার চুড়ি দেখে বোধগম্য হল) ঘুরে বেড়াছেন ওখানে, সঙ্গে আরও কয়েকজন আছেন বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত হয়ে (সবাই ভক্ত)। সে যাক। প্রথমে সনাতন বাড়ি বলে ভুল হল। কারন প্রথমত শাখা পরিহিতা মহিলা দর্শন, অতপর এক পাশে দেখতে পেলাম একটি গাছের নিচে ভাল মত পোচ করে মাটি দিয়ে লেপা এবণ্ড তার উপর জবা ফুল পড়ে আছে, পাশে আগরবাতি জলছে। মোমবাতিও রাখা আছে। তার পাশে একটা তুলসি গাছ যত্ন করে লাগানো। সুতরাং গ্রাম্য সনাতনবাড়ির সাধারণ এ চিত্রে ভুল হবার কথা নয়। কিন্তু ভুল হল। সে বাড়ির ছেলের মুখে দাড়ি, আর নামাজও পড়ে, অর্থাৎ আশা করা যায় বাড়িওয়ালি মুসলমান। অতএব মুসলমান বাড়ি।

অবশ্য এ যুগে পোশাক অর্থাৎ বাইরের সাজ দেখে আর ধর্ম বোঝার উপায় নেই। ধর্মের আচারের সঙ্গে বাহ্যিক সাজ-সজ্জার যে একটা সম্বন্ধ আছে, সেটা এ কালে এসে গৌন হয়ে পড়েছে। পড়েছে কি? নাকি ধর্মটা আজকাল পোশাকি হয়ে গেছে কিম্বা যাচ্ছে? যা হোক সেটা আজকের আলোচনার বাইরের বিষয়। ধর্মের আন্তরিক বিষয়টা-ই মুখ্য। বর্তমান প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের দাদা-পরদাদারা অনেকেই ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছেন, বাঙালি সঙস্কৃতি ও অভ্যাসের কারনে। ক্ষতি নেই। মুসলমানের পরনে পশ্চিমা জামা-পাতলুন উঠলেও মুসলমানিত্ব যায়না। সিমার মধ্যে থেকে মুসলিম নয় এমন কারো ঘরে পানাহারও করাতেও মুসলমানের নেই কোন কড়াকড়ি। সামাজিক ওঠা-বসা, খাতির, বেবসা-বানিজ্য, প্রতিবেশির অধিকার আদায় প্রভৃতিতে আধুনিক বিধান ইসলামে রয়েছে। তবে বাহারি ফ্রুশ পরিধান করা, তিলক কাটা, আর ঘরের সঙ্গে চন্দন গাছটির নিচে প্রতিনিয়ত ফুল দেয়া, চুমু খাওয়া, তুলসি গাছটির পরিচর্যা করা, অন্য ধর্মের কিছু আবশ্যিকীয় আচারের সঙ্গে মিলে যায় বলে বিষয়টিতে অন্য ধর্মের বিচারে অভিনবত্ব আছে, মুসলমানিত্ব নেই।

বেপর্দা সেই নারি, যার ঘাড়ের সাত সাতটি পরি-বোন বাসা বেধেছে, ডাকতে শুরু করলেন তাদের একজন, জনামনিকে। সুরে সুরে হৃদময় সে আহবানে নাম উঠে এল আল্লাহ, রাসুল, বড়ো পিরসহ আরো অনেকের। বাবা খানজাহান, বাবা শাহজালাল-শাহপরানও বাদ গেলেননা। পির-মুর্শিদ, ওলি-আওলিয়ার নামের পিন্ডি চটকিয়ে প্রায় পনের মিনিটের অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রতি সদয় হয়ে জনামনি জনসমক্ষে এলেন। তবে দর্শক, ভক্তদের সমক্ষে ঠিক নয়, পরক্ষে - পর্দার আড়ালে। যিনি ডেকেছেন, তার সমক্ষে, তিনি দেয়ালের আড়াল থেকে এই লিলা করেন। আর ভক্তের দল, ওত পেতে অপেক্ষা করে কখন তিনি স্বর্গ থেকে দাওয়া নিয়ে আসবেন। জনামনি এলেন। এলেন বুঝলাম, কারন, যে কন্ঠে তাকে ডাকা হচ্ছিল, কিছুক্ষন পর সেই কন্ঠের বদলে অন্য একটি কন্ঠে সালাম শুনতে পেলাম। বাহ! জিন-পরির কি দারুন নাকি সুর মানুষের কন্ঠে ভর করেছে!

নির্বাচনে হেরে যাওয়া আমার আত্মীয় জনামনির সঙ্গে অনেক কথা-ই বললেন। মনে হল পূর্ব পরিচিত। কি জানি, নির্বাচনের আগেও হয়ত এসেছেন একবার। হেরে গিয়ে হতাশ হয়ে উচ্চবাক্য বিনিময় করছেন এখন। জনামনি বললেন, "এটা আমাদের প্রয়োজন নয় (কয়েকবার করে নাকি সুরে), যার প্রয়োজন হয়, সে আসে। তুমিও আসবে, আবার আসবে, আসতেই হবে। জনামনি রসমনির প্রয়োজন নয়, এবার হয়নি আবার হবে (শব্দের উপরে খুব জোর দিয়ে), রাগ করলে হবেনা। আবার আসতে হবে, আসতেই হবে, আসতেই হবে, জনামনির কাছে আসতেই হবে....." ইত্যাদি এবণ্ড আরো অজস্র। কি সাজ্জাতিক! আমার আত্মীয় মনে হলো তুস্ট হলেন। এবার তিনি আমাকে বললেন পরির সঙ্গে কথা বলতে। আমিও ভাবলাম মওকা যখন মিলেছে, দেখি কথা বলে। এই সুযোগ তো বারে বারে আসে না। সে অনেক কথা হল জনামনির সঙ্গে, সব মনে নেই। তিনি সকালে কোথায় ছিলেন, কোথা থেকে কোথায় গেলেন

সব বলতে শুরু করলেন। সারা পৃথিবী নাকি ঘুরে টুরে এসেছেন। আমিও বললাম তা লিবিয়ার খবর কি, আর কোন কোন দেশে যুদ্ধ ছড়াতে পারে বলে মনে হয়, ইত্যাদি। কিন্তু কোনও দেশের নাম বলতে পারলেন না (কেমন করে বলবেন, দেশের নাম তো জানা থাকা চাই)। লিবিয়ার যুদ্ধের আপডেট কোন খবরও পাইনি। কারবালার প্রান্তরে মুসলমানের সঙ্গে নাকি ইহুদিদের যুদ্ধ হয়েছিল, সেই গল্পও করলেন আরেক ভক্তের সঙ্গে! বাপ রে! আমি শেষে বললাম, তা জনামনি গো! চিনের সদ্যমৃত প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা যে আগামিবার বাংলাদেশ থেকে নির্বাচনে দাড়াবে বলে মঙ্গলগ্রহে মিটিঙ করেছে, সেটার ফলাফল কি! বলে দাও না জনামনি! এর উত্তর আমি লিখতে পারবো না। সে ক্ষমতা আমার নেই। কিন্তু আমি খুব খুশি হবার ভান করলাম, হে হে হে, যা বলেছো বটে! এবার তিনিও কিন্তু প্রসন্ন হলেন। হবেনা না, এত বড়ো একটা কনফারেন্স এর ফলাফল আমাকে জানিয়ে দিতে পেরেছেন এতগুলো আবাল ভক্তের সামনে, প্রসন্ন না হয়ে উপায় আছে! আমাকে চিকন নাকি গলায় এবার তিনি বললেন, “(খুব হাসি তামাশা করে) জানিস আমি চাইলে প্রজাপতি হতে পারি, হি হি, জোনাকি পোকা হতে পারি, হি হি। সেদিন তুই যখন চা খাচ্ছিলি, হি হি (আমি চা খাই না, কালেভদ্রে বছরে একদুইবার কফি খাই, মানে পান করি), আমি তোর সামনে প্রজাপতি হয়ে উড়ে গিয়েছিলাম, হি হি”। এবার আমি বললাম, সব যখন হতে পার, একটা কাজ কর। জনামনি “কি” প্রশ্ন করাতে বললাম আজ বিকেলে সুন্দরি অস্টাদশি হয়ে চিত্রার পারে আস , আমি অপেক্ষা করব। আমি গোলাপ হাতে অপেক্ষা করব। জনামনি বলল, তুই আগে চন্দন গাছটার নিচে একটা ফুল দিয়ে যা, আগরবাতি কিনে জ্বালিয়ে দিয়ে যা। আমি বলি, ও তাই বুঝি! এ আর এমন কি! আর সব শেষে যার ঘাড়ে বসে সাধারণ হাবাগোবা মানুষের ঘাড় মটকে খাচ্ছে, তার সঙ্গে দেখা করে যেতে বলল। কেন, সে বোঝা শক্ত নয়। কোহিতুরের অদৃশ্য জিনের পেট চালাতে যে কড়কড়ে দৃশ্যমান নোটের দরকার সেটা জানলাম।

গলায় রুদ্রাক্ষ, উদোম গায়ের পঞ্চাশোর্ধ্ব এক ব্যক্তি এলেন। এসেই টিপ করে অবনত মস্তকে এক চুমু খেলেন চন্দন গাছে। কাকা, আপনি এখানে কেন আসেন, এই প্রশ্ন করাতে তিনি বললেন, উপকার পাই। আমি বললাম, কোনও ভগবত, রামায়ন, মহাভারত গিলে ফেললেও তো জিনের দেখা মিলবে না, কুরআনেই শুধু জিনের কথা বলা আছে বলে জানি। মুসলমান মাত্রই জিনে বিশ্বাস করে। তাহলে আপনি কোন বিশ্বাসে এখানে আসেন? তিনি কোন উত্তর না দিয়ে চলে গেলেন। আমার হাসি পেল। কিন্তু সে হাসি সুখের কোন হাসি নয়। কিন্তু কোন অনুভূতির, সেটাও প্রকাশের বাইরে, আমি অধম।

এখন কথা হচ্ছে, জিন জাতির কি খেয়ে দেয়ে কাজ নেই একজন বে-পর্দা, অপরিচ্ছন্ন, মুখরা মহিলার কাছে এসে বসে বসে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলবে? জিনকে আয়ত্তে আনার কথা অবশ্য শুনেছি। সে ত অনেক বড়ো ইমানদারের কাজ (যদি সম্ভব হয়)। লালসালুর মজিদের কথা মনে পড়ে। কি ছিল, কি বলে, কি কৌশলে, কি মিথ্যায়, কি প্রতারণায় একজন

মজিদ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, একটি সমাজের সকল নিয়ম-নিতি ও প্রতিষ্ঠিত সত্যকে উপেক্ষা করে!

আধুনিক এই যুগে এমন কু-সঙ্স্কারের প্রথা টিকে আছে, এবং বহাল তবিয়ে, ভাবতে কষ্টে হয়। আধুনিক এই যুগে মজিদ শুধু নয়, মজিদানিদের উদয় সঙ্স্কার, শিক্ষা, সৌজন্য, ভদ্রতাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছে, কাচকলা দেখাচ্ছে। সামাজিক কু-সঙ্স্কার মানব জাতির অবক্ষয় ঘটায়। অশ্লীলতা, বর্বরতা, অরাজকতা, অসভ্যতা, পরিশেষে ধওস ও বিপর্যয়ের কারনগুলি অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে কু-সঙ্স্কার কিভাবে আমাদের সমাজে বাসা বেধেছে। এ সমস্ত জিনিস থেকে সমাজের মানুষকে সঠিক পথের নির্দেশনা দেয়া হলো সামাজিক সঙ্স্কার। তবুও সঙ্স্কারের নামে সমাজ থেকে কু-সঙ্স্কার দূর করে দেয়ার কথা বলা হচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে অপ-সঙ্স্কৃতির চর্চাও চলছে। কু-সঙ্স্কার দূর করা যায়নি। কারন প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারে আমরা যত পিছিয়ে আছি, আমাদের মনের অন্ধকার দূর হওয়া সেখানে অনেক কঠিন। প্রকৃত শিক্ষা-ই পারে সব অন্ধকারকে ঠেলে দিয়ে মানুষকে আধুনিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে। প্রকৃত শিক্ষা কু-সঙ্স্কারকে দূরে ঠেলে দেবে, আবার অপ-সঙ্স্কৃতিকেও কাছে ঘেষতে দেবেনা। যতদিন না সে শিক্ষা পাচ্ছি, কেমন করে জনামনি-রসমনির আসমানি দাওয়া থেকে নিজেকে নিষ্কলুষ রাখব?

গল্পের এখানেই শেষ। এবার মূল আলোচনায় ফিরে যাবো। তো যে ভুতগ্রস্ত, যেমন আমি। বিশ্বাস না করেও আমি খুব করেই ভুতগ্রস্ত। আমি জানি ভুত আমার সামনে কোনওদিন আসবে না। কিন্তু মনের মধ্যে থাকা ভুতটাকে তাড়াবো এমন দাওয়া আমার কাছে নেই। সিড়ি দিয়ে উঠতে গেলে এখনও আমাকে তাড়া করে ‘এক্সরসিজম’ সিনেমার চরিত্র এমিলি রোজের সিড়ি দিয়ে নেমে যাওয়ার সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য। রাতে আমি আয়নায় তাকাতে পারিনা যে, তাও এই সব বাকওয়াজ ভুতের ছবির কির্তি। বাকওয়াজ বলছি ছবির মেকিঙ এর জন্য নয়, মেকিঙ এর বিচারেও এই ছবি হরর ছবিগুলোর মধ্যে অন্যতম। বাকওয়াজ এই জন্য যে বিষয়টা ভুতের। ভুত বলে কিছু নেই। কিন্তু ভুতের ভয় আমরা পাই। ভুতের ছবিগুলো এই ভয় আমাদের অন্তরে ঢুকিয়ে দিয়েছে। অথবা কে জানে হয়ত অন্তরে ভুত এমনি এমনিই জন্ম নেয়!

মেয়েটার মাকে জানানো হয়েছিলো। জানানো হয়েছিলো হলের প্রভোস্টকে। যদি কিছু ঘটে যায়! আমি বুঝতে পারছিলাম কোথাও একটা সমস্যা হয়েছে। মেয়েটার যে কস্টো হচ্ছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কস্টোটা কিসের! সে কি জিনের চাপচাপির কস্টো না বন্ধুদের ছয়সাতজন মিলে তাকে ক্লাবঘরের মেঝেতে চেপে ধরার কস্টো! না কি অন্য কিছু! কিন্তু অন্য কিছুটা নিয়ে আলোচনা করতে পারিনি। অন্য কিছুটা নিয়ে সব সময় আলোচনা করা যায় না। এখানে মুসলিম পরিবারের প্রায় সব ঘরেই বন্দি করে রাখা আছে সুরেলা পাখি। কেন! কারন এই সুরের আবেশে বাড়িওয়ালা মুগ্ধ হতে চান। সব বাড়িওয়ালা-ই পাখি পুষে সুরের জন্য। সুরের জন্য, যার জন্য বিশাল আকাশ, তাকে বন্দি করে, কুক্ষিগত করে রাখতে পারলে যে বিকৃত আনন্দ জুটে মানুষের, তার বিপক্ষে সামান্য দু-একটা বাক্য উপস্থাপন করতে গেলেই আমার সঙ্গি বলল, বাচতে চাও? তাহলে থামো!

আমি প্রথমে থমকে যাই, চমকে উঠি। আটকে রাখা পাখির বিষয়ে কথা বলতে গেলেই প্রাননাথের যবনিকা পড়ে যাবে! বলে কি! এর আগেও বেশ ক’বার আমার সঙ্গি ঠিক এই কথাটা-ই বলেছে –

বাচতে চাও, তাহলে থামো। ইদের দুইদিন আগে অর্থাৎ রোযার মধ্যে মধ্য দুপুরের শেষদিকে তিন চারজন ছোকরা বাস স্টেশনে দাড়িয়ে অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে বিড়ি টানছিলো। ইদের আগে আগে বাস স্টেশনের চেহারা কল্পনা করার দরকার নেই। এর কারন এই দৃশ্য আমাদের জিনের মধ্যে প্রোথিত। বিড়ির ধোয়া রোজাদারের রোজার ক্ষতি করে, আর যে এই ধোয়া নিতে জানে না, তার কস্টোটা শুধু সে-ই জানে। কিন্তু এই আধুনিক ছোড়াদের এ নিয়ে কোনও মাথাবেথা আছে, চেহারা ও ভাবভঙ্গি দেখে সে রকম কিছু মনে হলো না। আমার সঙ্গিকে বললাম যে, এদের নিষেধ করা উচিত। সঙ্গি বলল, বাচতে চাও? তাহলে থামো! আমি ভাবি অতি বড়ো পাষন্ডেও বিড়ির ধোয়ায় অধুমপায়ির কস্টো বুঝে যায়, রোজাদারের কস্টোটাও বুঝে থাকবে। এরা বুঝবেনা! বলে কি! বাংলাদেশে হলে তো সবাই আমরা সমস্বরেই বলতাম, এই ভাই কি হচ্ছে এটা, খাবেন খান দুরে যান। ওরাও চলে যেতো। আর এরা মেরেই দেবে! বলে কি আমার সঙ্গি!

ফলে আপাত জিনে ধরা এই মেয়ের অন্য কোনও কস্টের কথা আমি যদি উচ্চারণ করি তবে কথায় বলে, দান দান তিন দান। আমার বন্ধুর কথা স্মরণ হয় – যদি বাচতে চাও তবে থামো। কিন্তু আমি আমার মনকে সান্তনা দেই এই কথা বলে যে, মন তুমি তো বুঝেছ, কি দরকার এদের দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে নিজের যুক্তির যুদ্ধ বাধিয়ে? কিন্তু বিশ্বাস যদি ভ্রান্ত হয়, বিশ্বাসিদের গায়ের জোরের অবস্থা হয় অকল্পনীয়, আর ইচ্ছেটা হয় বেহেশত পাওয়ার জন্য যে কোনও অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে প্রস্তুত মানুষগুলোর মত। আমি ঝুঁকি নিতে চাই না। জীবনের প্রতি আমার অসিম মায়া, মৃত্যুতে ভয় আরও অসিম। আমি অন্তত বির নই। আমার আকা মুক্তিযোদ্ধা হয়েছিলেন, আমি হলে কি করতাম এখনই নিশ্চয় করে বলা আমার পক্ষে অসম্ভব।

আমি ঘটনাগুলোর কয়েকটা ছবি তুলেছিলাম। এর মধ্যে অন্য একটি ঘটনা ঘটেছিলো। দুস্টু জিনকে তাড়াতে বিশ একুশ বছরের একটা ছেলে এলো। সে এমনভাবে চিকিতসা শুরু করলো মনে হলো ইসলামে পর্দা কোনওকালে ছিলো না। অথবা কি জানি, জিনের চিকিতসা বলে কথা! পর্দার ‘এক্সম্পশন’ মেলে কি না! কিন্তু কিছুক্ষন পরে এই ছোকরা আধ্যাত্মিক চিকিতসকের শরিরে প্রচন্ড কাপুনি দেয়া শুরু হয়ে গেলো, এমন কি সেটা রোগির চেয়ে অত্যন্ত বেশি প্রকটভাবে! কয়েকজন আমাকে বোঝালো জিন এখন তার শরিরে প্রবেশ করেছে। অর্থাৎ মেয়েটি জিনমুক্ত। চিকিতসা বটে! মেয়েটি তন্দ্রাহতের মত অথবা মাতালের মত ব্যবহার করছে এখন। করবে না, যে ধকলটা গেছে! আমি বললাম, ওকে পানি খাওয়াও। ওরা পানি দিলো মেয়েটিকে। তারপর ওকে নামাজের জন্য দাড়া করালো। ওর কয়েকজন বান্ধবিও ওর সঙ্গে নামাজে দাড়ালো এক গাদা যুবকের একেবারে সামনে।

ওদিকে আধ্যাত্মিক চিকিতসক ছোকরাটির অবস্থা অত্যন্ত বেগতিক। এর মধ্যে সে আমাকে কখন যেনো লক্ষ করে থাকবে। তারপর আমিই হয়ে গেলাম নন্দ ঘোষ। তেড়ে এলো তার কয়েকজন বন্ধু। না, বেশ ভালোভাবেই বলল, আপনার মোবাইলে যে ছবিগুলো তুলেছেন এর, তা মুছে না ফেললে জিন যাচ্ছে না। আমি বললাম, আমার মোবাইলে প্রথমত চার্জ শেষ হয়ে গেছে এবণ্ড তার কোনও ছবি আমি তুলিনি। হুম আমি অন্যদের কিছু ছবি তুলেছি। তারা বিশ্বাস করলো না। আমি বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে বাসায় যাচ্ছি, এবণ্ড চার্জ দিয়ে সব মুছে ফেলছি। কিন্তু তাতে তারা রাজি হলো না। আমি এক রকম অন্তরিন হয়ে পড়লাম আমার মুসলিম ভাইদের কাছে। তারা কোথেকে একটা চার্জার নিয়ে এলো। আমি চার্জার সঙযোগ করে মোবাইল অন করি, এবণ্ড আমার সঙ্গিকে দেখাই যে, দেখো এর কোনও ছবি নেই। কিন্তু ওদিকে আমি খবর পৌছে দিই যে ছবি ডিলিট করা গেছে। আমাদের এক্সরসিস্ট অর্থাৎ আধ্যাত্মিক চিকিতসক সুস্থ হলেন এই খবরে।

না, আমি আর কখনও আমার মুসলিম বোনদের জিনের ঘটনা দেখতে সেখানে যাইনি। ‘আর’ এই জন্যই বলছি যে প্রতিনিয়তই এমন ঘটনা ঘটছে। মানসিকভাবে অত্যন্ত চাপ বেড়ে গেলে আমাদের শরির কিছু প্রতিক্রিয়া দেখায় বলেই জানি। বিজ্ঞানের অতি নগন্য ধরনের ছাত্র হলেও এটা অন্তত বিশ্বাস করি যে আমাদের শরির একটা পৃথিবী। চাদের টানে সমুদ্রের উত্তাল পানি যখন বাতাসের প্রবাহ তৈরি করে, তাতে নেচে ওঠে বৃক্ষের পাতা, নরম ডাল, ভাঙা ঘরের চাল, রমনির মাথার চুল। সাগরের তিরে এই বাতাসের শব্দ আমাদের আকুল করে, ঝড়ের রাতে জানালার শার্সি দিয়ে ধুকে এই বাতাসই তৈরি করে অত্যন্ত ভুতুড়ে শব্দ। বিশ্ববিদ্যালয়ে সবে ভর্তি হওয়া বিশেষ করে ছাত্রীরা যে মারাত্মক পেরেডের সম্মুখীন হচ্ছে এখানে, তাতে করে মানসিকভাবে তারা যে প্রতিক্রিয়াশীল হবে সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। চিরচেনা পরিবেশ ছেড়ে এসে হাজার দুয়েক ছাত্রদের মধ্যে চারপাচজন যদি মানসিকভাবে অত্যন্ত নাজুক হয় তবে তা স্বাভাবিক। কিন্তু এই স্বাভাবিক ঘটনাগুলোতে অস্বাভাবিকতার রঙ চড়ানো গেলে চিচিঙ ফাকের মত পর্দা ফাক করা যেমন সহজ, তেমনি সহজ আধ্যাত্মিকতার ভয় দেখিয়ে বাড়তি অনেক রকম সুবিধা আদায় করা। আর আমার মত অত্যন্ত উতসাহি ‘আনকলড ফর’ অর্থাৎ অবাঞ্ছিত অতিথিকেও বিনে পয়সায় যাচ্ছেতাই করা যায়। তবে এতে করে হস্ট-এর দোষটা অত্যন্ত শিথিল হয়ে পড়ে। এর কারন, আর যাই হোক আধ্যাত্মিকতার মাল-মশলা আছে এতে। দোষ দেবো কেমন করে! যদি জহন্নম জুটে কপালে!

বাসায় চলে এসেছিলাম এর পরে। তখন হঠাত ভাবনা হলো, আমার মুখ আড়াল করে মেয়েটির পায়ে সুড়সুড়ি দিয়েছিলাম আমি। এটা বুঝতে যে, তার জ্ঞান আছে কি না। দুই ধরনের জ্ঞানের কথাই বলছি আমি। এক, সে অজ্ঞান হয়ে গেছে কি না, দুই, তার ঘাড়ের সজ্ঞান জিন আমাকে দেখতে পাচ্ছে কি না। না মেয়েটির কোনও প্রতিক্রিয়া হলো না। তার পা অত্যন্ত ঠান্ডা হয়ে এসেছিলো, অথবা ঝিঝি ধরেছিলো হয়ত। অথবা সে কোনও সুড়সুড়ি অনুভব করে না। অথবা সে সতিই জ্ঞান হারিয়েছে। কিন্তু আড়াল করা আমার মুখটাও কি জিন দেখতে পায়নি? তবে তথাকথিত জিনে ধরা মেয়েটি তার চিরচেনা বন্ধু-বান্ধবদের ভিড়ে তার চোখের সামনে আমার মুখের উদয় হতে সে অমন করে ভয়ঙ্করভাবে গর্জে উঠেছিলো কেন!

রাত তিনটা, ২৭০৭২০১৬, পাথালুঙ, থাইল্যান্ড।

ডায়েরি অব আ সিজোফ্রেনিক

১

(০২০৮২০১৫, চিয়াং মাই, থাইল্যান্ড) মহাবিশ্ব সুপরিকল্পিতভাবে এবং সুপরিমিতভাবে ভারসাম্যময়। ফলে মহাবিশ্বের অঙশ হিসেবে আমাদেরকেও তাই ভারসাম্যময় হতে হবে। সাময়িকভাবে বৈষম্যকে খুব বেশি চোখে পড়লেও আত্মে ওই ভারসাম্যই হলো গিয়ে আসল কথা। অর্থাৎ যে যেমন করেছে তাকে তেমনভাবেই ভোগ পেতে হবে। সে সোজা পথ বলুন কিম্বা শাস্তি। আমি এই সুত্র কারও কাছ থেকে শিখিনি, এটা আমার নিজস্ব উপলব্ধি। ভাগ্যিস উপলব্ধিটা হয়েছিলো, নইলে

আমাকে অনেক মানসিক কষ্টে পেতে হতো। কেন তার বেখ্যা আজ নয়, অন্য কোনদিন দেবো। ধান ভানতে শিবের গিত গাওয়া আমার বদ অভ্যেস হয়ে গেছে।

খাওয়ার জন্য কি যে ঝামেলায় পড়েছি আমি! চারিদিকে শুয়োরের মাঙশের ছড়াছড়ি, দে ডন'ট মাইন্ড ইন পর্ক। কিন্তু আমার মেলা আপত্তি আছে। মেলা মানে প্রচুর মিন করিনি, করেছি পুরোটা-ই। শুয়োরের মাঙশ ছুতে চাইনা। ধর্মে বাধা আছে, সে তো আছেই। কিন্তু শুয়োর দেখলে-ই আমার ঘেন্না হয়। শালা জানোয়ার বটে! একেবারে পারফেক্ট জানোয়ার বলতে যা বোঝায়। দোকানে গিয়ে মুরগি চাইলে তারা হ্যা সুচক মাথা ঝাকায়, কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে মুরগিটা কেটে দেয় ওই একটু আগে শুয়োর কেটেছে যে তখতখানিতে, ঠিক ওইটার পরে। আমি খুটিয়ে দেখি, হায় আল্লাহ, পর্ক তো খানিক আমার পেটেও গেলো। এই বুঝি ধম্ম শেষ! এই ফাকে একটা মজার কথা বলে নেই। মানে ভাবলে আমারই মজা লাগছে। প্রত্যেক দোকানে মদ বেশ সস্তা। আমার মাথায় শয়তান ভর করে। কি যে করি! কিসে যেনো টানে! আমি নিজের সঙ্গে তখন হারি। ঠিক হেরে যাওয়া বলে কি না একে জানি না, তবে জেতা যে কিছুতেই নয় সেটা বুঝতে পারি। আমি কুরআন শরিফ থেকে মদ সম্পর্কিত আয়াত খুঁজি। মানে শয়তান একেবারে আমার অন্দর মহলে ঢুকে পড়েছে। এখন বের করি সেই শক্তি আমার নেই। অন্তর মম বিকশিত কর – কিন্তু শয়তান অন্তরে বিকাশ লাভ করে আসন পেতে শক্ত করে বসে আছে। হারামজাদা শতযানের দোষ দিয়ে নিজের সাফাই গাওয়া শুরু করেছি এখন!

নবিজির আমলে প্রথম দিকে মদ-জুয়া দুটোই চলতো। কিন্তু সেই যুগে থেকেও তিনি কখনই মদ স্পর্শ করেননি। হিজরতের পরে কিছু আনসার এলেন। নবিজিকে জিজ্ঞেস করলেন, মদ ও জুয়া মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনাকে পর্যন্ত বিলুপ্ত করে ফেলে এবণ্ড ধনসম্পদও ধণ্ডস করে দেয়। এ সম্পর্কে আপনার নির্দেশ কি?

এরপর সুরা বাকারার একটি আয়াত (দুইশত উনিশ নম্বর আয়াত) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হলো - তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্য উপকারিতাও কিছু রয়েছে, তবে এ-গুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়”।

এতে কিন্তু মদ সরাসরি হারাম হয়ে গেলো না! এখানে শুধুমাত্র অপছন্দের কথা ব্যক্ত করে সাবধান করা হয়েছে, যাতে মানব-মন ও মস্তিষ্ক মদের ক্ষতিকর বিষয়টি গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু অত্যন্ত উচ্চমানের পরহেজগার সাহাবিদের কেউ কেউ এই আয়াত নাজিলের পরেই মদ ছেড়ে দিলেন। কিন্তু এর পরবর্তি ধাপের গল্পটি চিত্তাকর্ষক -

একদিন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) সাহাবিগনের মধ্যে হতে তার কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেন। আহরাদির পর যথারীতি মদ্যপানের ব্যবস্থা করা হলো এবণ্ড সবাই মদ্যপান করলেন। এমতাবস্থায় মাগরিবের নামাযের সময় হলে সবাই নামাযে দাড়াইলেন এবণ্ড একজন ইমামতি করতে এগিয়ে দিলেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তখন তিনি সুরা আল-কাফিরুন ভুল পড়তে লাগলেন।

এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে মদ্যপান থেকে পুরোপুরি বিরত রাখার জন্যে দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলো। সুরা আন-নিসার তেতালাশ নম্বর আয়াত নাজিল হলো - “হে ইমানদারগন! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাযের কাছেও যেওনা।”

উপলব্ধি করার মত বিষয় হচ্ছে, মহান আল্লাহ কিন্তু একচোটেই মদকে নিষিদ্ধ করছেন না। আমরা মানুষেরা পিটিয়েই এক রাতে মানুষকে ভালো বানাতে গিয়ে নস্টো করে ফেলি।

মদ তৃতীয় ধাপে পুরোপুরি নিষিদ্ধ হলো। সেই গল্পটি এ রকমঃ

হযরত আতবান ইবনে মালেক কয়েকজন সাহাবিকে নিমন্ত্রণ করেন, যাদের মধ্যে সা'দ ইবনে আবি অক্কাসও উপস্থিত ছিলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর মদ্যপান করার প্রতিযোগিতা এবং নিজেদের বগুশ ও পূর্বপুরুষদের অহঙ্কারমূলক বর্ণনা আরম্ভ হয়। সা'দ ইবনে আবি অক্কাস একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন যাতে আনসারদের দোষারোপ করে নিজেদের প্রশংসাকির্তন করা হয়। ফলে একজন আনসার যুবক রাগান্বিত হয়ে উটের গন্ডদেশের একটি হাড় সা'দ এর মাথায় ছুড়ে মারেন। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন।

সা'দ রসূল (সা) - এর দরবারে উপস্থিত হয়ে উক্ত আনসার যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। তখন নবিজি প্রার্থনায় বসলেন - 'হে আল্লাহ! শরাব সম্পর্কে আমাদের একটি পরিস্কার বর্ণনা ও বিধান দান করুন।'

তখন আল্লাহপাক ইরশাদ করেন, 'হে ইমানদারগন! মদ, জুয়া, মূর্তি এবং তির নিক্ষেপ এ সবগুলো নিকৃষ্ট বস্তু, শয়তানের কার্য। কাজেই তোমরা এসব বর্জন করো। যাতে তোমরা সফল হতে পারো। শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক শত্রুতা ও তিক্ততা ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখতে চায়। তবুও কি তোমরা তা থেকে বিরত থাকবে না?' (সূরা মায়দা, ৯০-৯১)

পৃথিবির সব থেকে ভদ্র নোকের দেশ, মোল্লার দেশ হলো নাকি আমেরিকা। এরা ছড়ি ঘুরিয়ে দুনিয়া শাসন করে। কিন্তু এই দেশে ধর্মের পরিমাণ হাস্যকর রকম ভাবে অন্য যে কোনও দেশের তুলনায় অনেক বেশি। শুধু সাউথ আফ্রিকা নামের দেশটিকে বাদ দিলে ধর্মে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের টিকিটি ছোয় এমন কোনও রাষ্ট্র নেই দুনিয়ায়। দেখা গেছে ধর্মকদের মধ্যে একটা মোটা অঙ্কের বিরপুরুষেরা মদ্যপ। কিন্তু এর চেয়ে ভয়ঙ্কর তথ্য হলো, আমেরিকার ভদ্র ধর্মকেরা ঘরের বাইরে ধর্মে তেমন ইচ্ছে বোধ করেন না, ঘর তাদের প্রিয়। অর্থাৎ মদ খেলে কেমন সব ঘটনার জন্ম হতে পারে তা চিন্তা করা কঠিন কিছু নয়।

কিন্তু চোরে শোনে না ধর্মের কাহিনি। চোরে যদি ধর্মের কাহিনি শুনতো, তবে শয়তানের কাজ অনেক কমে যেতো। কিন্তু শয়তানকে পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকার জন্য দুনিয়ায় পাঠানো হয়নি, বরং শয়তান হলো সবচেয়ে কর্মঠ। সারাদিন, সারাক্ষণ কিভাবে কত উপায়ে কুমন্ত্রণা দেয়া যায় মানুষকে তার জন্য ক্লান্তিহীন তার দিবস-রজনী। অতএব আমার জন্য বিভিন্ন এবং বিচিত্র ঘটনা সামনে আসতে লাগলো। যে শয়তানটা আমার পেছনে নিযুক্ত রয়েছে সে আমাকে মদ সম্পর্কিত ঘটনার এক-একটি চরিত্র বানিয়ে দেয়। কখনও মেশিনের সামনে ক্লান্তিকর এক্সপেরিমেন্টের শেষে একটু জিরোতে চাওয়া বিদেশি বন্ধুদের সঙ্গ, কখনও রাতের মিনি ফুটবল খেলে মাঠেই 'রিল্যাক্স' করতে চাওয়া সহ-খেলোয়াড়দের সহবত, কখনও সামনের দোকানের হাতছানি! ফলে আমাকে হারতে হয়। এতো এতো প্রসঙ্গ থেকে নিজেকে এড়িয়ে রাখবার মত মানসিক শক্তিদারি আমি নই। অবশ্য ওরা একটা বিষয়ে খুবই সত, আমি অনুভব করি। আমাকে মদ অফার করে ওরা। আমি বলি, নো, আই অনলি লাইক ওয়াটার। সিগারেটের পেকেট সামনে এগিয়ে দেয়, আমি বলি, আই ডন্ট লাইক স্মোক, মনে মনে বলি, ঢাকার রাস্তায় যে পরিমাণ গাড়ির 'স্মোক' খেয়েছি, এখন আর নতুন করে সাধ হয় না। তারা অবাক

হয়ে আমার দিকে আঙুল তুলে বলে, গুড, গুড, ইউ গুড ম্যান। অর্থাৎ মদ কিনা সিগারেট খাওয়া যে ভালো কাজ নয় সেটা এরাও জানে। জেনেও খায়। পৃথিবির মানুষ খারাপের সবটা না জানলেও অনেকটা জানে। সেই অনেক খারাপটার মধ্য থেকেই অনেকগুলো খারাপ কাজ মানুষ করে থাকে। জেনে শুনেই করে। আমিও করি। ইমানের দুর্বলতা আমার সিমাহিন, আর সাধ অসিম। ফলে আমিও জড়িয়ে পড়ি কখনও সখনও। তবে আমি নির্দিধায় একটি কথা বলতে চাই, পৃথিবিতে যত প্রকারের খাদ্য রয়েছে, কুখাদ্য বলাই শ্রেয় হবে, পৃথিবিজুড়ে বিয়ার নামক আদরনীয় পানীয়টি হচ্ছে তার মধ্যে নিকুস্ট, জঘন্য। অল্প পরিমাণে পানে এতে নেশাও নেই, স্বাদও নেই, বিস্বাদ আছে প্রচুর, আছে নারকিয় দুর্গন্ধ। কিন্তু মানুষ বিয়ারের নাম শুনেই নরকে যেতে চায়। কেন?

নিজের ইমান যে কতটা পাকা তা বুঝে গেছি। আবার গোড়া থেকে শুরু করতে হবে কি না কে জানে! তবে আমি নিশ্চিতভাবেই গোড়া মুসলিম হতে চাই না, সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। আমার বিশ্বাস, আল্লাহ গোড়ামি পছন্দ করেন না। গোড়ামি যারা করেছে তারা একে সত্য মেনেই করেছে। জগতে সত্যের বিধানটা

একেকজনের কাছে এক এক ভাবে প্রতিভাত। কে তাহলে সত্যি সত্যি সত্য পথে আছে? কে তা বলতে পারে? একটু আধটু শুয়োরের মাংশ না যাক, ছোয়া যে আমার পেটের লেগেছে সেটা বুঝতে পারি আমি। আমার গা গুলিয়ে ওঠে। শালা শুয়োরের বাচ্চাগুলো দেখলেই আমার গা শিরশির করে। কিন্তু আমি নিরুপায় হয়ে গেছি দেখে আমার এক জুনিয়র এগিয়ে আসে। হি ইজ আ গুড বয়। আমার উপকারে লাগছে দেখে বলছি হয়ত, আমার কাজে না লাগলে কি ওকে আমি হি ইজ আ গুড বয় বলে আদিখ্যেতা দেখাতাম? মানুষ আসলে স্বার্থপর। আমি আরও এক হাত বাড়ি। স্বার্থপর বলে পরিচিতমহলে আমার ভালো পরিচিতি আছে।

আমার বন্ধু হোটেলের সামনে আসে। আমাকে ফোন করে। আমার ঘুম তখন কেবল ভেঙেছে। তখন ঘড়িতে বেলা বারোট্টা উনিশ। তরতর করে উঠে প্রাতের সামান্য কাজ সেরেই আমি বাইরে বেরিয়ে আসি। ওর মোটরসাইকেলে চড়ি। সোজা একটি রেস্টোরার কাছে চলে আসি আমরা। আমি দূর থেকে দেখি রেস্টোরার ব্যবস্থাপনা যিনি করছেন তার মাথায় হিজাব। আমি নিঃসন্দেহ হই রেস্টোরার বেপারে। এটি একটি মুসলিম রেস্টোরা। মুসলিমদের খাবার সবাই খেতে পারে, মুসলিমরা সবার খাবার খায় না। কেন? সে আমরা সবাই জানি হয়ত। কিছুকাল আগে সনাতনরা অবশ্য মুসলিমদের ছায়াও মাড়াতোনা। এখন অবস্থা অনেক বদলেছে। এই তো সেদিনও, এই তো ক’দিন আগে আমাদের পাশের গ্রামের সনাতনদের সঙ্গে আমার আবার সে কি খাতির, একেবারে গলায় গলায় বলতে যা বোঝায়। কিন্তু সে গলায় গলায় সম্পর্কটা থিয়েটারের মঞ্চ থেকে বড়োজোর বাড়ির উঠোন অবধি পৌছতো। দুয়ার ঠেলে ঘরে পৌছতে পারতাম না আমরা, বারান্দায় উঠলেই মাসিমা কিছুক্ষন পরে গোবর দিয়ে লেপে নিতেন। আজ আর এই অবস্থা নেই। দিন পাল্টেছে। আমি মাত্র কুড়ি বছর আগের কথা বলছি। তখন আমি ছোটো। এখন ত সনাতনদের অনেকেই চুপি চুপি শুধু নয়, অনেকটা বুক ফুলিয়েই গো-মাতাকে চিবোতে থাকেন, আর ঢেকুর তুলে বলেন, মা তারা! এর চেয়ে উপাদেয় খাবার জগতে পাওয়া ভার!

এখন জাত যায় না, তবে আগে কেন যেতো?

জানি না।

(২০/৯/২০১৫, সকাল ৮ টা ১০ মিনিট) ঘুম থেকে উঠে দেখি কমোডটা যেখানে থাকবার সেখানে নেই। আমিও তাই। ঘুম থেকে উঠে নিজেকে আবিষ্কার করি অন্য কোথাও। দেখি কমোড চলে গেছে কোহিতুরের রাজার বাড়ির উঠানে, আর আমি বাগানে, অর্থাৎ অতিতে। তবে অতিত থেকে আমি স্পস্ট দেখতে পাই রাজা নিজের হাতে কমোড সাফ করছেন। তখন বুঝতে পারি ওটা আসলে কমোড নয়, ওটা দেশ।

- অবশেষে কোহিতুরকে কি না তুমি কমোড দেখলে!
- তাই তো দেখলাম, তাই তো দেখছি!
- মানে? তাই তো দেখছো মানেটা কি?
- মানেটা হলো কমোডের ময়লা সত্য, দেশের জঞ্জাল সত্য, আমার অতিতে গমন সেও সত্য, কিন্তু ভাবছিলাম, রাজা কি সত্য? আমি আজ এ কি হেরিলাম হে খোদা?
- তুমি ডাক্তারে যাও।
- ডাক্তারও কি আমাকে সত্য চিকিতসা দেবে? ঝুলায়ে রাখবে তো!

কিছুক্ষন পরে আমার চোখের পর্দা সরে যেতে থাকে। আমি শুনতে পাই বাইরে প্রবল বাতাস হচ্ছে। সেই বাতাস আমার টয়লেটের কমোডের ভেতরে কিছুটা গেলে কি একটা ধনি তৈরি হয়। ঘূর্ণি বাতাসের মতন শব্দ। সেই ধনি যেনো বলছে – মুক্ত করো আমায়।

(২০/৯/২০১৫, সকাল ৮ টা ৪৫ মিনিট) এই সময় আমার মনে হয় যে, আমার রাজার বাড়ির আশেপাশে একটু ঘোরাঘুরি করা দরকার। দেয়াল তো টপকাতে পারবো না, কিন্তু ইদিক-উদিক করে যদি কিছু আচ করতে পারি! পাইক বরকন্দাজ কিন্তু ঠিকই তেড়ে এলো, যেমনটি ভেবেছিলাম। কিন্তু ন্যাঙটোর নেই বাটপারের ভয়, আর আমার নেই ওই তলোয়ারের। ফাক ফোকর দিয়ে দেখতে পাই সেখানে যজ্ঞ হচ্ছে। অর্থাৎ রাজা ফেসে যাচ্ছেন। বুঝলাম কমোড সাফ করেন নি তিনি, আমার মনের ভেতরেই দ্বিতীয় ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়ায় আমি অমন দেখতে পেয়েছিলাম। দড়ি আনা হয়েছে। কিন্তু সে তো দড়ি নয়, সে যেনো রাজ দন্ড! এতদিন যা দিয়ে প্রবল প্রতাপশালি রাজা ছড়ি ঘুরিয়েছেন। আজ রজ্জুতে সর্পভ্রম না হলেও এটা সত্য যে ওই দড়ি গলায় পরতে হবে। ভাবলাম, কিছু একটা করতে হয়!

এটুকু অবধি সত্য, অর্থাৎ দেখেছি। কেমন করে দেখেছি তা জানি না। কিন্তু দেখেছি। আর বাকিটা স্বপ্ন। আমি যা করে হোক না কেন ভেতরে ঢুকে পড়ি। সিপাহিরা তেড়ে আসে ফেড়ে ফেলবে এমন মুখের চেহারা, অর্থাৎ অতি ভয়ঙ্কর। কিন্তু আমার টুটি ছিড়তেও তারা পারে না।

রাজার সঙ্গে আমার এবার কথা হচ্ছে –

- রাজন্য হে! রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি – এই দড়ি কি সেই চুরির মালের স্বাপ্নিক রূপ?
- তা কি করে বলবো? স্বপ্নে জিনিস কি আর এক রকম থাকে?
- কিন্তু আপনার দন্ডের দৃশ্য, সে তো সত্য!
- অর্থাৎ ভবিষ্যত?
- মুহূর্তটা বর্তমান, অর্থাৎ প্রায় অস্তিত্বতহিন। একে ট্রানজিশন পিরিয়ড বলতে পারেন জাহাপনা।
- কিন্তু একে যে তুমি মুহূর্ত বললে! এখন যে যেতে চাইছে না!
- হুম জাহাপনা, আপনার সমি পে মিথে বলি, এমন হতে পারে না, কিন্তু মুহূর্তটা আসলে ক্ষনস্থায়ি। তবে কি না জীবনে দুঃখ-কষ্টের মুহূর্তরা বেশি সময় নেয় বলে ভ্রম হয়। আপনি তো অবশেষে প্রমাণ করলেন, আপনিও আসলে সাধারণ মানুষের উর্ধে নন। দেখুন না কেন, মুহূর্তরা যেতে চাইছে না, জেকে বসে আছে আপনার নিয়তির উপরে!

■ তাই তো দেখছি!

- তাহলে ভাবুন, প্রজার জীবন থেকে দুঃখ, বেদনা, ক্ষুধা, অভাব, রোগ- জরার সময়গুলো কেমন করে পার হয়েছে! একটু অনুভব করুন রাজা মশাই!

■ কিন্তু তার আগে যে গলায় মালা, অর্থাৎ দড়ি পড়ে যাবে! ঝুলে যাবো যে!

এখন বলে রাখা দরকার যে, দড়িতে আমার ভিষন ভয়। রজ্জুতে স্বপ্নভ্রম হয় আমার। আমি পেচিয়ে দলা পাকিয়ে ওঠা সাপের অস্তিত্ব অনুভব করেই ভয়ে জেগে যাই। মনে আমাকে পেচিয়ে দলা করে দেবে! কাহিনি শেষ হলো না তবে রাজা কিন্তু দন্ড হতে বেচে গেলেন!

(২০/৯/২০১৫, সকাল ৯ টা ১০ মিনিট) রাজার দন্ড মার্ফ হয়ে গেলো স্বপ্নভ্রমের কারনে! কারন বটে! কিন্তু তাতে রাজা আগের অবস্থায় ফিরে গেলেন। অর্থাৎ কয়লা ধোয়া হলো, তবে ময়লাটা কিছুতেই গেলো না। এই সময় একটা মিছিল যাচ্ছিলো রাজপথ দিয়ে। সান্ত্বির বেতের বাড়ি উপেক্ষা করে মিছিল এগিয়ে গেলো রাজবাড়ির দিকে।

ভাত দে শাহজাদা – এই ছিলো মিছিলের শ্লোগান।

কিন্তু আমি শুনি ‘ভাত দে হারামজাদা’। অর্থাৎ রাজার কাছে দাবি সম্পর্কিত ভাবনা ও প্রয়াসের বেপারে ধারণা আমার নিতান্ত কম। ডিপ্লোমাসি শিখতে হবে ভাবছি। কিন্তু তখন আবার ভাবনায় পেয়ে বসে, শাহজাদা বা হারামজাদা, এর কোনওটাতেই কি কিছু এসে গেছে?

মিছিলটা ফিরেছে।

আমি একজনকে ডেকে জিজ্ঞেস করি, ভাই, কি দেখলে?

■ খানা- পিনা চলছে রাজবাড়িতে।

- তা হাঙামা করে লাভ কি হয়েছে? তোমাদের দাবির বিষয়ে কিছু যদি বলতে ভাই।

লোকটি আমাকে বলে, একজন এসে বলে গেলো, রাজা তোমাদের দাবি মেনে নিয়েছেন। এখন বাড়ি যাও।

(২০/৯/২০১৫, সকাল ৯ টা ৩০ মিনিট) আমি তখন ভাবছি রাজার দন্ড হতে মুক্তিলাভের জন্যই বুঝি বা রাজকিয় খানা- পিনার আয়োজন করা হয়েছে। অর্থাৎ অজুহাত। অন্তরের বিকাশ যে কি জিনিস, তা কোনওদিন বুঝতে পারবেন না কেন উনি?

রাজা বলে কথা! আমি ভাবলাম রাজাকে গানটা শুনিয়ে দিই একবার – অন্তর মম বিকশিত করো... কিন্তু তখন আমি অন্তরকে বিকশিত করিলাম। গানের কর্তা অর্থাৎ রবি ঠাকুর কহিলেন, বতসো! বক্ষ বিদর্ন করো, দেখি কেমন করিয়াছো!

আমি বলিলাম, বক্ষ বিদর্নে রক্ত ঝরিবে যে! রক্তে আমার মাথা ঘুরোয় ঠাকুর। বরঙ লিখিয়াছেন আপনি, আপনিই করিয়া দিন।

রবি ঠাকুর ইতস্তত করিলেন। তিনি বলিলেন, যখন লিখিয়াছিলুম, তখন বিদর্নের উপায় ভগবান জানতেন, আর আমিও জানতুম। এখন শুধু ভগবান জানেন।

আমি তাহাকে শুধালাম, অর্থাৎ যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিশ্বাস না করিয়াই লিখিয়াছেন? ধারণা করেন নাই? অর্থাৎ কথার কথা! নইলে ভুলিবার কথা তো এ নহে!

ঠাকুর এবার নিজেকে ডিফেন্ড করছেন, বতসো! বাজে বকিও না।

আমি বলিলাম, ভক্তরা তো আপনাকে ভগবান বানাইয়া ছাড়িয়াছে ঠাকুর। অর্থাৎ এইবার ভগবান আর আপনি এক হলেন। এইবার বলুন।

রবি ঠাকুর বিপদে পড়িলেন। সহিতে না পারিয়া ‘আ আ আ ... গা গা গা...’ করিয়া নিজের শরির উত্তিত করিলেন, এবণ্ড নিজের বক্ষই বিদর্ন করিয়া ফেলিলেন।

আমি দেখিলাম, সেখানে ঠাকুরের মন অনুপস্থিত। যেখানে মন রহিবার কথা, সেখানে অজস্র শব্দ বাসা বাধিয়াছে। আমি বুঝিলাম, ঠাকুরের লেখাগুলোই ঠাকুরের মন। আমি সেইখান হতে গান আর

কিছু কবিতা লইলাম। বোধ করিলাম, অবসরে গাহিবার নিমিত্ত কিম্বা মানসভোজের লাগিয়া সুক্ত বানাইবার জন্য ঠাকুরের কাছে যদি কিছু থাকে তবে তাহা এ-ই। এখন রাজাকে সেই গান হইতে একটা গান শোনাইতে হইবে – অন্তর মম বিকশিত করো ...

(২০/ ৯/ ২০১৫, বেলা ১ টা ৩৭ মিনিট) রাজার বাটির পানে চলিতে থাকি, কিন্তু পথে যাইতে বড়ো আসোয়াস্তি ঠেকিতেছে। সবাই কেমন যেনো নিয়ম মানিয়া চলিতেছে। অর্থাৎ কেহ কিছু কহিয়া দেয় নাই, তাহাতেও বন্ধিম বাবুর যেমন করিয়া তপোবন বলিয়া বোধ হইতেছিলো, আমারও মহাজ্ঞানি মহাজনের পথ অনুসরণ করিতে ইচ্ছে হইলো। আমারও তখন বিস্তর অনিয়মে পূর্ণ রাজপথকে বেঙমার নিয়মশৃঙ্খলাপূর্ণ বলিয়া বোধ হইলো। আমি কি পথ হারাইয়াছি? কিন্তু চক্ষু দিয়া যাহা দেখিতে পাইতেছি তাহাকে মিথ্যা বলিবো কেমনে?

ভাবিলাম পার হইয়া যাই। কিন্তু সিপাহি তেড়ে আসিলেন। কারন বুঝিতে না পারিয়া আশেপাশের কাউকে শুধাইলাম, পথ কি তাহার পরেও চলার উপযুক্ত নহে? তবে তো জঙ্গলই মঙ্গলময় ছিলো! তিনি বলিলেন, জনপ্রিয় গায়ক গুনি শিল্পি মাদ্রই হইবেন তাহা নাও হইতে পারে। তাতে প্রকৃত শ্রোতার খেসারত দিতে হয়। রাষ্ট্রনিতিতে জনপ্রিয়তার খেসারত দিতে হয় আম অর্থাৎ জনগনকে। জনপ্রিয় রাজা মশাই এই পথে যাইবেন বলিয়া- ই ব্যবস্থা এমন।

ততক্ষণে আমি বুঝিয়া লইয়াছি, রাস্তা সাফ কিম্বা জঙ্গলাকর্ন, তাহাতে প্রজার মঙ্গল নাই। গল্পের এ অবধি সত্য। বাকিটা আমার রোগের খেসারত।

(৪/ ১০/ ২০১৫, বিকেল ৪ টা ৫৫ মিনিট) তখন ভাবছি ভালো হয়ে তাহলে আর কি হবে। নস্টো পথ, নস্টো রাষ্ট্রনিতি, ভ্রষ্টো সমাজ ব্যবস্থা, কস্টো সহিষ্ণু প্রজার দুঃখ, এ সব ভুলে থাকতে হবে। তখন নিজেকে আবিষ্কার করি একটি ঘরে। সেখানে আমার মতন অনেকে এসেছেন। একজন খুব দুলছেন। ইতি বড়োজোর ত্রিশ বছরের একজন সুন্দরি। দেহ দোলালেন তিনি। হাটুর এক বিঘত উপর অবধি তার স্কার্ট। তার উপরে খেয়ে নিয়েছেন বেশামাল পরিমান মদ। ফলে উদ্যম গানের তালে তালে তিনিও বেদমভাবে বেপর্দা হয়ে যেতে থাকেন। সবার নস্টো দৃষ্টি এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করছে। আমিও কি বাদ পড়েছিলাম? তখন আমার মনে হতে থাকে, মহিলা কি আমার মনের অবস্থা আচ করতে পেরেছেন?

আমার দিকে তিনি ঢুলে ঢুলে এগিয়ে আসতে থাকেন। আমি সন্ত্রস্ত হই। কিন্তু এত বদমায়েসদের দঙ্গল এড়িয়ে আমাকেই কেন? আমি তখন বুঝতে পেরেছিলাম আমি বিগড়ে গিয়েছি। কিন্তু কতটা গিয়েছি সে ধারণা ছিলো না। আজ কি তবে তার ষোলো কলা পূর্ণ হতে চলেছে? একটু পরেই কি ঘটনা ঘটবে জানি না। চপেটাঘাত পড়বে কি? টি টি পড়ে যাবে তো! সমাজে মুখ দেখানোর থাকবে আর!

আমি তখন মনে মনে বলি, হে সুন্দরি, তোমাকে ভালোবাসতে যাবে কে? আমার কি আর এতো সাহস থাকতে হয়? কিন্তু স্থিলোক সম্বন্ধে দুর্বলতার অত্যাধিক কারন ঘটলে চোখ বিশ্বাসঘাতক হতে পারে, মনের আসল খবর সম্পর্কেই বা আমি কেমন করে এত নিশ্চিত হই? তারপরে ভাবি, চপেটাঘাত আমার কলঙ্কিত জীবনে স্থায়ীভাবে নামাক্ষিত হয়ে যাবে না তো! সর্বনাশ!

কিন্তু না। তিনি আমার কাছে এলেন, এবণ্ড আমার বুকের উপরে পড়লেন। টি টি পড়ে গেলো।

আমি এখন এদের।

(৭/ ১০/ ২০১৫, রাত ২ টা) ভুতের মুখে তখন আবার রাম নাম শুরু হয়ে গেছে। তাই মদ্যশালা থেকে বের হয়ে নতুন জীবন, নতুন ভাবনা। বুকের উপরে যিনি পড়ে গেলেন তিনি রাজার বাড়ির নর্তকি। ফলে টি টি পড়ার শব্দ রাজার বাড়ি অবধি পৌঁছলো। কারও কারও আসমান হতে কিতাব পড়ে। কারও টি টি। কারও ঘরে আসমান হতে বৃষ্টির জল। ফলে তলিয়ে একাকার। যিনি কিতাবধারি হন, তিনি কিন্তু এই অবস্থায়ও ‘আলহামদুলিল্লাহ’ পড়ার পরামর্শ দিয়ে এর থেকে পরিত্রাণ লাভের কথা বললেন। কিন্তু সে কাল আর এ কালের মধ্যে বিস্তর ‘সিগনাল’ মিসিং হবার ফলে অথবা নুয়ে পড়া সিগনালকে

জাগিয়ে তোলার জন্য যে সব কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছিলো তাদের শুধুমাত্র বক্তৃতার মধ্যে ‘সিমুলেশন’ করার ফলে সত্যিকারের দুর্ভিক্ষের মাঠে খাবার নিয়ে হাজির হওয়ার সময় পাননি বা আসমানি জলের প্রতিবিধান করেননি। রাজা এই সময় কোহিতুরের রাজপ্রাসাদ সঙ্কস্কারে মন দিয়েছিলেন। আসমানি জলের বিধান তার জানা ছিলো, কিন্তু রসুলপুরে তিনি যাননি। রাজকর্মে বাধা পড়বে!

রসুলপুরে আমারও যাওয়া হয়নি। তাই দেখা হয়নি আসমানিরা কেমন আছে। তবে মন বলছে আসমানিরা ভালো নেই। রাজা বলেছেন, এ কোহিতুর ভালো আছে, আমার মন বলছে ভালো নেই। কার কথা শুনবো? আর পত্র-পত্রিকা যা বলছে তা পড়লে বা শুনলে বিদ্রোহি মনের সঙ্গে নিজেরই দন্দ লেগে যায়। ধন্ধও লাগে। ভাবতে থাকি পত্রিকাওয়ালারা আসলে কারা? কিন্তু শেষ অবধি পত্রিকারই জয় হলো। আমারই ভুল। ওদের জয় না হয়ে উপায় আছে? নইলে ‘ভরে’ দেবে যে! ওদের হাতে অনেক বড়ো অস্ত্র থাকে। ওদের সঙ্গে পারা যায় না।

সেবার শুনেছিলাম রসুলপুরে প্রচুর বন্যা হয়েছিলো। প্রচুর আল্লা-রসুল করেও তেমন কাজ হলো না। হবে কেমন করে? বেইমান বিশ্বাসঘাতকের মুখে রাম নাম হলে আল্লাহ তা শুনবেন কেন? তবে ত্রাতা কিন্তু এলেন! অর্থাৎ জনপ্রতিনিধি। রাজা শেষমেশ পাঠিয়েছেন। জয়তু রাজন্য হে! রাস্তায় দাড়িয়ে কাদছিলো সাত বছরের ছেলে চাদ। চেহারাটা না খেয়ে, আর পচা জলে ভিজে একেবারে ব্লাক হোল। একে দেখলে মনে হয় না এর বাপে কোনওকালে সোদাগিরি করতো। কেন যে এর নাম চাদ রাখতে গেলো! কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন। কিন্তু বাবা-মায়ের মন বলে কথা! তারা কিন্তু দিন কয়েক আগেই বন্যার জলে তলিয়ে স্বর্গবাসি হয়েছেন। আল্লা চাদ ছোড়াকে কেন বাচায়ে রেখেছেন কে জানে! কেউ জানে না। না জানলেও কারও ক্ষতি নেই। তবে বন্যা কিন্তু কারও কারও পৌষমাসও হয়ে এলো! সামনে ভোট! অতএব ‘তোমাদের মাঝে এসে বিপদের সাথি হয়ে... ... আজকের চেস্টা আমার...’ জাতীয় গান গেয়ে জনতার মন ভুলাবার প্রয়াস শুরু হয়ে গেলো। এই পথ ধরেই চাদ ছোড়ার কাছে তিনি পৌছে গেলেন।

মিডিয়া কিন্তু এই খবর অতি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে ফেললো! অর্থাৎ মিডিয়া ও ত্রাতার জয়! (কিন্তু এই সময় আমার সম্বিত ফিরে আসে। আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম? কই, না তো! ঘুম ভাঙার পরও কিছু অবসাদ থাকে, চোখে জল না দেওয়া অবধি তা কাটে না। কই, আমার তো তেমন বোধ হচ্ছে না! বুঝেছি, চাদ দেখতে গিয়ে শিল্পি তার প্রেয়সিকে দেখে ফেলেছিলেন। কিন্তু আমি সত্যকে দেখে ফেলেছি। আমি দেখেছি যে, চাদের হাতে ত্রানের খাবার পৌছে নি।)

(৭/১০/২০১৫, রাত ২ টা ৩০ মিনিট) বন্যা কেটে গেলে আবার জীবন সাজাতে শুরু করেছে মানুষ। তখন ভাবলাম যাই, ঘুরে আসি। জানি যে, এই হলো ফাকিবাজ মানুষের স্বভাব। পিড়িতের প্রয়োজনে অজুহাত দিয়ে নিজেকে ফারাক করে রাখা অত্যন্ত বদ-অভ্যেস। এ হয় নির্লজ্জ মানুষের কাজ। কিন্তু তবুও গেলাম। নির্লজ্জ বলেই গেলাম। নদিতিরবর্তি নবোপল্লবশোভিত পল্লির মেঠো রাস্তা দিয়ে হেটে যাবার সময় মনে হলো এটা মরুভূমি। এর জন্য পূর্ব অভিজ্ঞতা দায়ি। নিজের অনুমানের উপরে ভালোবাসা, ভরসা কিম্বা সিদ্ধান্তগ্রহন মানুষের জন্য সোজা ও স্বাভাবিক। কিন্তু অনুমানের উপরে আস্থা রাখাটা কঠিন। অনুমান ভুল হয়ে যায়। আর আমার আরও বেশি। কিন্তু অভিজ্ঞতা মোক্ষম। আর অভিজ্ঞতা সঠিকের কাছাকাছি অনুমান করতে সাহায্যও করে থাকে। ফলে নবোপল্লবশোভিত গ্রাম্য রাস্তার বাম ধার দিয়ে হেটে যাবার সময় যদি কিছু অনুমান করে থাকি, তবে তার জন্য জ্ঞানের কাছে কৃতজ্ঞ হবো, না অনুমানের সম্ভাব্য সঠিকতার পক্ষপাতিত্ব করবো, সে কথা বলতে পারি না, তবে পূর্ব অভিজ্ঞতাকে সবার সামনে উপস্থাপন করতে পারলে অপর পক্ষ হতে কেউ যে বাধা হবার জন্য উতপাত করবেন না, সে কথা কে বলতে পারে?

তখন নদীর এ কূল নিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিলো, ভাবনার বিষয়, ও পারে সর্ব সুখের উপাদান বর্তমান।

আমি বলি, ভাবনা ছাড়ো। যার সঙ্গে কোনওদিন মিলিত হও নাই, তাকে নিয়ে এমন ভাবনা করে নিজের জীবনে দুঃখকে মিছেমিছি টেনে এনে তোমার কি লাভ হয়?

নদি উত্তর করিলো, পদদ্বয় স্রস্টার দানে তুমি বিশেষায়িত, গিয়ে দেখো।

আমি ও পার দিয়ে হেটে যেতে গিয়ে এই সত্য অনুভব করলাম যে, নদীর এ কুলের অনুমান মিথ্যে নয়। কারন সারি সারি বৃক্ষ ছায়া দিচ্ছিলো, বৃক্ষপত্রে বাতাসের আঘাতে সঙ্গিতের রাগিনির সঙ্গে হয়ে গেলো পরিচয়, শিতল বাতাসের পরশে সুযোগ হয়েছিলো বৃক্ষতলে দু দন্ড জিরোবার, কৃষক ছেলেটির মেঠো বাশির সুরে ছিলো আনন্দ-বেদনায় গাথা সহস্র বছরের ইতিহাস, ঘাটের মাঝির ডাকও ছিলো উদাত্ত – এসো নবিন!

কি করে এখন নদীর এ কুলের দীর্ঘশ্বাসকে উপেক্ষা করি!

এবার কিন্তু ফিরতি পথ।

কিন্তু এ কি! সব কিছু এত অচেনা মনে হচ্ছে কেন? তরুচ্ছায়াতলে বাশির বাশির সুর নেই, পাতায় পাতায় সুরের সম্মোহন নেই, মাঝির ঘাট নেই, উদাত্ত সে ডাক নেই, পাখিদের কলকাকলিও উধাও, পাখি নেই! তরু নেই, শিতল, স্নিগ্ধ মলয়ের পরশ নেই!

তখন আমি বুঝতে পারি, অর্থাৎ অনুভব করি, নদীর এ কুলের অনুমান মিথ্যা। এই হলো আমার অভিজ্ঞতা।

(১৩০৬২০১৬, বেলা ১২ টা ৩৫ মিনিট, চিয়াঙ মাই, থাইল্যান্ড) ভক্তেরা তসলিমা নাসরিনের প্রতি চুম্বকের টান অনুভব করে। টান টান উত্তেজনা ছড়িয়ে থাকে তার লেখায়। তসলিমার গদ্য লেখার মান মন্দ নয়। কিন্তু আমার মনে হয় মহিলাটি সিজোফ্রেনিক। কখন যে কিভাবে কি দেখেন আর কি বলেন! আর তার লেখাগুলো অনেকক্ষেত্রেই ছাত্রকে রচনা লিখতে দেবার মত, যা-ই কিছু লিখতে দিক, রচনা হয়ে যায় কুমিরের, তেমনি যা-ই কিছু বলেন উনি, বলেন, কেস্টা বেটা-ই চোর। ভক্তেরাও তখন হই হই করে ওঠে – ঠিক বলেছো দিদি, তুমি খাসা মাল! দিদি এই ভাবে মর্তের বেদ লিখছেন, ভক্তে সেবা দিচ্ছে, যা পারছে গিলছে, গো-গ্রাসেই গিলছে।

সম্প্রতির সূর্যটা হারিয়ে গেছে বলে আক্ষেপ করে লাভ নেই। সম্প্রতি ছিলো যে কালে, সে কাল আর আসবে বলে সম্ভাবনা নেই। আবার, সম্প্রতি কি ছিলো কোনওকালে? তাই সবচেয়ে ভালো অবস্থান হলো এই বৈরিতা। আমার বেলজিয়ামের বন্ধু জায়েদ, যে আগে খ্রিস্টান ছিলো, কাল রাতে ওর গাড়িতে আসার সময় আমাকে বলল, আমেরিকার জন্য এখন সবচেয়ে ভালো অবস্থানই হলো যুদ্ধটা যালিয়ে যাওয়া। আমেরিকা ফিরে আসতে পারবে না। আমি বললাম, ঠিক, যুদ্ধে আমেরিকার যে জয় হবে সে সম্ভাবনা মোটেও নেই, কিন্তু চালিয়ে যাওয়াটা তার শক্তিমত্তার প্রমাণ, বিশ্বে আরও কিছুদিন দাপটের সঙ্গে তান্ডব চালিয়ে যাওয়াতেই ওদের সুবিধে। জায়েদ যোগ করে, হুম, আমেরিকা একটা কাজ করতে পারে, তা হলো সবাইকে এক সঙ্গে মেরে ফেলা। কিন্তু সেটা হয়ত পুরোপুরি সম্ভব নয়। তাই নতুন প্রজন্ম জন্ম নেবে, তার শিশুরা বড়ো হবে আমেরিকা নামের মস্ত দানব সন্ত্রাসি রাষ্ট্রের প্রতি ঘৃণা নিয়ে। তাহলে কি আর যুদ্ধটা থামবে? এখন তাই বৈরিতাই সঠিক পথ টিকে থাকার জন্য। অর্থাৎ নিজের জায়গা ছেড়ে দেয়ার অর্থ আত্মসমর্পণ। কে তা করতে চাইবে আজকে?

মুসলিম নামধারি, মুসলিম পরিবারের একজন দুদিন আগে আমেরিকার ফ্লোরিডায় গুলি করে সমকামিদের এক পার্টির গোটা পঞ্চাশেক জান কবুল করে। আমেরিকার এটাই হল গিয়ে সব চেয়ে ব্যক্তিগত বড়ো কেজুয়াল্টি। ওই দেশে একজন খুনি আগে কখনই পঞ্চাশ জনকে সাবাড় করেনি। ফলে এটা এখন ইতিহাস। আমি হত্যার বিপক্ষে। কিন্তু মন অনেক শক্ত করে বলতে পারছি না যে এই ধরনের হত্যাকান্ড থামবে। থামার কোনও লক্ষণ নেই। তসলিমা এবার নড়ে চড়ে বসলেন, আবার বললেন,

কেস্টা বেটা-ই চোর। কেন যে ওরা দুধ কলা দিয়ে কালসাপটা পুষছে! আমিও বলি, তাই তো। কেস্টাকে বের করে দাও! ডোনাল্ড ট্রাম্প আর কোনও নতুন কেস্টাকে ঢুকতে দিতে চায়ও না। আর তোমরা এখন বের করে দাও। কিন্তু আমি বলি, মিসেস তসলিমা, আপনাকে বাংলাদেশ বের করে দিয়েছে, দিয়ে ঠিক করেছে অথবা করেনি, এই হিসেব করার সময় নেই, আপনি বেশ ভালোই আছেন আমি জানি, কিন্তু ফুটানিটুকু না করলে তো মিডিয়ায় সরব থাকা কঠিন! নইলে ভালোবাসো মানুষ, যোলো কোটি মানুষ যে আচার খেয়েই জীবন পার করে, সে আচার না খেলেও না চেখে দেখলেও তার প্রতি আপনার বিষোদগারটা করা মুর্থতা হয়েছে। তবু ভালো এখন ফুটানিটা করতে পারছেন। দেশে থাকলে তো পারতেন না।

দুধ কলা খাওয়া কালসাপ যারা পোষে, তারা দুনিয়া জুড়ে কি করেছে সেটা দেখতে পান না কেন এটা মাথায় আসে না! আসে। পা-টা না চাটলে তো দুধ-কলা নয়, ওয়াইন-বার্গার-পার্টি-ট্রফি মায় শোয়ার জন্য বিছানাটাও জুটবে না আপনার! ফলে ওকালতিটা করতেই হয়, কি বলেন! ওকালতিটা করেন বলেই ভালো করে বাচেন, নইলে গু-মুতের মধ্যে ত্যানা ত্যানা হয়ে মরতে হতো আপনাকে। বাংলাদেশে আসুন, দেশের মানুষকে ভালোবাসুন, আপনাকে সবাই ক্ষমা করে দেবে। আপনি কবিতা ও লেখায় দেশের জন্য যে হা-হতাশ করেন, ওটা মিডিয়াবাজি। দেশের মানুষকে সত্যিকারের ভালোবেসে দেখুন। যাদের আজকে পা-টা চাটছেন তাদের বিপক্ষে বলুন না কেন, দেখুন না কেন কেমন করে আপনি এমন আরামের জীবন পেয়ে যান! ফলে আপনি বেশ জেনে গুনেই মাঠে নামেন। আপনি ওদের বিপক্ষে বলতে যাবার মতন সাহসি নন, আপনি বরঙ কেস্টা-বেটাদের বিপরিতে বলতে পারার মতন গোড়া। কেস্টা-বেটাদের নাম নেয়া কয়েকটা সেক্ট-এর মতই গোড়া। আপনিও নিশ্চয় তা জানেন? পৃথিবিতে একটা রক্তপাতহীন সাম্রাজ্য কায়েমের সুবাতাস পাচ্ছি। মেঘের পরে আসে মেঘ। ইতিহাস নিজেই নিজেকে প্রতিনিয়ত নতুন করে তৈরি করে। ফলে রক্তপাতকারীদের আজকের ইতিহাসই যে চূড়ান্ত, তা ভাববেন না। তখন হয়ত আপনি থাকবেন না, আমি থাকবো না, আমরা কেউ থাকবো না। আসবে নতুন প্রজন্ম। তারা আপনাকে ভ্রান্ত জানবে। আপনি হয়ত মুছেই যাবেন। কে আপনাকে মনে রাখবে? কিন্তু পৃথিবির ইতিহাস রচিত হবে নতুন কোনও রক্তপাত ছাড়া, হয়ত। আমি দেখতে পাচ্ছি। আজকের আমেরিকা নয়, ইসরাইল নয়। আপনি খুব ভালো করে জানেন এরা রক্তচোষা। কিন্তু টিকে থাকার জন্য আপনাকে তা ভুলে যেতে হয়। ইতিহাসটা পরিবর্তিত হবে। আমি দেখতে পাচ্ছি। পাখিটা থেমে থেমে ডাকে। ডাকের পরে ডাক, সুরের পরে সুর, পাতার পরে পাতা, ইতিহাসের পাতারা উল্টাচ্ছে মিসেস তসলিমা। সে দিন দূরে নয়।

ডায়েরি অব আ সিজোফ্রেনিক

২

(পনেরো নয় পনেরো!!! রাত ২ টা ৩০ মিনিট, থাইল্যান্ড) বিমান থেকে নেমে গন্তব্যের দিকে যাত্রা শুরু। কিন্তু যিনি বিমানযাত্রি হয়ে এয়ারপোর্টে নেমে আমার সঙ্গি হয়েছেন তার কিন্তু মারাত্মক ক্ষুধা লেগে

গেলো। সঙ্গিনির নাম দেই টুনি। তার একটা বিড়াল ছিলো অতি সুন্দর চেহারার। সেই বিড়ালটি নয় বছর বয়সে মারা গেলো, তার পর থেকে আমার সঙ্গিনির শোক শুরু হলো, কিন্তু শেষ হয়নি। শেষ যে হবে তারও কোনও সম্ভাবনা দেখতে না পাওয়াতে আগুনে আরও ঘি ঢালবার জন্যই কি না তার নাম আমি মৃত বিড়ালের নামে রেখে দেই। সেই থেকে সঙ্গিনি হয়ে গেলেন টুনি। সবার কাছেই তিনি এই নামেই পরিচিত।

তার আসল নাম ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। যাক না, ক্ষতি কি?

ক্ষুধা কোনও নিয়ম মানে না, কিন্তু গাড়ির গাইড নিয়ম করেই আমাদেরকে খাবার দিয়ে গেলেন। টুনির চক্ষু চকচক করে। ইনি খান কম, কিন্তু খাওয়ার আশা প্রচন্ড, খাবার দেখলে চোখের চেহারা আরও লোভাতুর। ইনি চেখে দেখেন বললে ভুল বলা হবে না। হুম, টুনির চক্ষু স্থির, জিহবা চুকচুক, পাকস্থলি শিহরিত, অর্থাৎ খেতে প্রস্তুত। উইদ নো টাইম, টুনি খাবার চিবোতে থাকে। আসলেই সে পুরোদস্তুর ক্ষুধার্ত। আমি কিছু পরে মুখে দিয়ে কেন জানি না আমার কাছে বিস্বাদ ঠেকলো। টুনি ততক্ষণে খেয়ে সাবাড় করেছে। কিই বা এমন, ছোট্ট একটু পাওরুটির বান- এর মধ্যে ‘কিছু একটা’ পুরে দেয়া।

আমি গাইডকে ডাকি, জিজ্ঞেস করি, এর মধ্যে কি?

গাইড আমাকে যে উত্তর দিলেন, তাতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনিত হই যে, বিদেশের মাটিতে টুনি প্রথমে যে খাবারটি খেয়েছে তার নাম শুয়োরের মাঙশ!

এ সন্দেহ জানার বাদে টুনির চেহারা কেমন হলো তার বর্ণনা দেয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। এখন তো শুরু হয়ে গেলো খিচুনি, বিস্তর আফসোস আর তওবা পাঠ! না করে উপায়! একজন ইমানদার মুসলিম শুয়োরের বাচ্চা খাবে আর তওবা করবে না, তা কেমন করে হয়! আমি তাকে সান্তনা দিলাম। বললাম, দেখো পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ পাক কি বলছেন -

নিশ্চয় তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জন্তু, রক্ত, শুকরের গোশত এবণ্ড যা গায়রুল্লাহ নামে যবেহ করা হয়েছে, সুতরাং যে বাধ্য হয়ে, অবাধ্য বা সিমালজ্ঞানকারি না হয়ে, (ভক্ষন করে) তাহলে তার কোনো পাপ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশিল, পরম দয়ালু।’ [সূরা বাকারা: ১৭৩]

হু, টুনিরও পাপ হয়নি এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। সে নিজেও এটা জানে, কিন্তু গা’র মধ্যে কেমন যেনো করতে থাকে তার, এটার উপশম কি! গত সপ্তাহে মুরগির মাঙশ মনে করে একই রকমভাবে শুয়োরের মাঙশ আমিও খেয়ে ফেলেছি। কেউ কিছু কহিয়া দেয় নাই আমারেও!

আমি বুঝতে পারছিলাম টুনির ভেতরে কেমন করছিলো। অ্যা...

(রাত ১০ টা, ৩১/১/২০১৬, পাখালুঙ, থাইল্যান্ড) রবিন্দ্রনাথের বিশ্বমানস সাধারণ বাঙালির ধরা-ছোয়ার বাইরে থেকে গেছে বলে যখন তিনি দাবি করে বসলেন তখন তৌশিকি সাহেব নড়ে চড়লেন। ইতি অতিভক্তি সহকারে রবিন্দ্রনাথের পূজো করেন। মানে বউ ছেড়ে দেয়া যাবে, কিন্তু রবিন্দ্রনাথের গালমন্দ করা যাবে না তার সামনে, এমনই এক ভক্ত! সেখানে আমি গিয়ে উপস্থিত হোলাম, আর আগুনে ঘৃতাছতি দেবার মতই বলে ফেললাম, সত্যজিতের কেমেরা বিশ্বের যে কোনও কালের যে কোনও মানের পরিচালকের সঙ্গে পাল্লা দিতে সক্ষম, কিন্তু তা কিছুতেই বাঙালি মানসকে অতিক্রম করে যায় না, কিন্তু রবি ঠাকুরের...ইয়ে মানে...

কথা শেষ হলো না, তৌশিকি সাহেব কিছু শুনতে পাবার আগেই হাত নেড়ে বললেন, থামো থামো!

তিনি তখন তৌশিকি সাহেবকে বললেন, তার মানে আপনি মেনে নিচ্ছেন যে সত্যজিত আরও বড়ো বাঙালি?

খতমত খেলেন তৌশিকি, আপনি কিন্তু ঠা- ঠা-ঠাকুরকে অবজ্ঞা করছেন!

তিনি এবার বললেন, আসলে রবিন্দ্রনাথকে বুঝতে পারি বলেই তাকে ভালোবাসি যুক্তিসহকারে, অন্তর থেকে, অন্ধভক্তিসহকারে নয়। রবিন্দ্রনাথ বাঙালিকে অবজ্ঞা করেছেন কি না বলতে পারি না তবে সাধারণ বাঙালির রবি ঠাকুর বুঝতে হলে আরও কয়েকটা শতাব্দিতে যুগে যুগে ক'টা বিপ্লব করে আসতে হবে। খেটে খাওয়া চাষা-মজুরদের জন্য রবিন্দ্রনাথ নন। তবে আমি যেহেতু কাল নির্ণায়ক নই, কিন্তু ভাবনা প্রকাশে দিধাহীন, তাই সিমার মধ্যে অসিমকে প্রকাশ করি ভয়ডরহীন।

তৌশিকি গাইগুই করেন, আপনি কি বলতে চান রবিন্দ্রনাথকে ধারন করতে বাঙালি ব্যর্থ হয়েছে?

আমি বলি, হুম, শুধু গানে আর কবিতায় তিনি নিজেকে অতিক্রম করেছেন। তার গানকে মোছা যাবে না, তা সম্ভব নয়। এটুকু বিনা তিনি খুব ভালো করে জানতেন যে তিনি সাহিত্যে যা করেছেন তা মজুর খেটে খাওয়া বাঙালির জন্য নয়।

আবেগে তৌশিকি কাদো কাদো হয়ে বললেন, আপনারা এ সব বলছেন কি?

তিনি তৌশিকিকে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি বাঙালি বলতে শুধু বাঙালি ব্রাহ্মন বুঝে থাকেন? অর্থাৎ অভিজাত বাঙালি?

তৌশিকি কোনও উত্তর না করায় তিনি আবার যোগ করেন, অভিজাত শ্রেণির কিন্তু তথাকথিতভাবেই মানুষশ্রেণির। যাদের ঘাড়ের উপর দিয়ে বন্দুকটা চালাবেন, তাদের ঘাড়ের কথাটাও খেয়াল রাখতে হয়। অভিজাত লেখক প্রাকৃতজনের ভাষায় লিখলেন অথচ সে লেখার বোধগম্যতার জন্য যে বোধির প্রয়োজন...

(ভোর ৫ টা ৩ মিনিট, ২৪০৬২০১৬, থাইল্যান্ড) যতজন আরবের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার, এবঙ পরিচয় হয়েছে, কেউই গ্রহন করেনি আমাকে। আমার চেহারা ভাঙাচোরা, গায়ের রঙ তামাটে, পকেটের অবস্থা তৃতীয় বিশ্বের অর্থনিতির পরিসংখ্যানেই পরিদৃষ্ট, পকেটের চেহারা না দেখেই সেটা বলে দেয়া যায়, ফলে ব্রাহ্মনত্বের সঙজ্ঞা অনুসারে ঐতিহাসিক কিম্বা ভৌগলিকভাবে আমি শূদ্রশ্রেণির, সেই কথা আরবেরা জানেন। তাই আমার পশ্চিম-ইউরোপিয় বন্ধু নব্য-মুসলিম জায়েদ আমাকে যত আন্তরিকভাবে গ্রহন করে, নব্য-পরিচিত এবঙ খোদার অপার দানের খনিজ তেলসিক্ত আরব যুবকের কাছে আমি তত উপেক্ষিত। আমি ও আমার বন্ধু জায়েদ যখন একসঙ্গে কারও সঙ্গে পরিচিত হই, জায়েদ খুবই আদরনয় হয়ে ওঠেন। এতে আমার হিঙসে, ইর্ষা কোনওটা-ই হয় না, কিন্তু মন খারাপ হওয়াটা উড়িয়ে দিতে পারিনা আমি। আমি ইঙরেজিতে কথা বলায় জায়েদের চেয়ে বেশ পটু, তবুও অন্যরা জায়েদের সঙ্গেই কথা বলতে বেশি ইচ্ছুক। ব্রাহ্মনত্বের সঙজ্ঞাটা তখন আবার মনে করি। একটা গল্প স্মরণ হয়ে গেলো -

ফটিকের বয়স তখন উনিশ-কুড়ি। সে ও তার এক বন্ধু বেড়াতে গিয়েছিলো তার এক খালার বাড়ি। দুসম্পর্ক নয়, কাছেরই বলতে হবে - ফটিকের মায়ের বড়োমামার মেয়ের বাড়ি। তার মায়ের সঙ্গে এর আছে সরাসরি রক্তের সম্পর্ক। সে যা হোক। ফটিকের বন্ধু কিন্তু বেশ নামকরা একজন পদার্থবিজ্ঞানির ছেলে। দেখতেও সে ভারি সুদর্শন। কিন্তু বেচারা ফটিকচাদ! সে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, বাবা সামান্য চাকুরে। ফটিকের সুরতের কথা না-ই বললাম, সে কথা বলে শেষ করা যাবে না। ফটিকের মায়ের বড়োমামার মেয়ের স্বামি বিত্তে ও বৈভবে ও অবস্থানে ওই মুল্লকের তেমন 'বিরা.....আআট' কিছু না হলেও

তিনি কিসের জন্য যেনো অহম নামের রোগে ভুগছিলেন। গল্পের শেষ দিকটা এখনই বলে দিয়েছি।

বিকেল বেলা চলে আসতে হবে। ফটিক তার মায়ের বড়োমামার মেয়েকে তাদের বাড়ি বেড়াতে যাবার কথা বলে সালাম দেয়, তার স্বামিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সালাম দেয়। ফটিকের বন্ধুও ফটিকের মায়ের বড়োমামার মেয়ের স্বামিকে আমাদের ‘ওদিকে’ যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করলো। ফটিকের দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে তিনি বললেন, ‘ওদিকের’ আত্মীয়রা তো তেমন ‘জোরের’ না, তাই আর..... হুম, তবে যাবো দেখি একদিন তোমাদের বাড়ি। তোমার আত্মাকে আমার অন্তরের শুভেচ্ছা দিও।

আরবেরা হয়ত ভাবে, বাংলাদেশ মানে তো শ্রমিকের দেশ। আমি সে কথা মানি। ততটুকু অবধি মানি যতটুকু মানলে আমার দেশের প্রতি ভালোবাসাটা অবজ্ঞায় পরিনত না হয়। কিন্তু আমি ভাবি অন্য কথা। আমরা ধান রুই, পুকুরে রুই-কাতলা না হলেও কই-টাকি-শিঙ মাছ ধরি, মাচানের লাউ নিয়ে বাজারে বিক্রি করি, গাছের সুপোরিটা পেড়ে সাইকেলে ঝুলিয়ে বাজারে বেচতে যাই – তাতে খুদকুড়ো যা হয় কিনে এনে জিবিকা চালাই, কিছু না পেলে মাঠের শাকটা কুড়োই, বিলের কচুটা – কলমিশাকটা দিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করি; কিন্তু হাদারাম, তোরা কি করতি? ডাকাতি করা ছাড়া তো তেমন কোনও কাম ছিলো না, আর খুনোখুনি করা, আর ছাগল চরানো। আর মেয়ে হলেই তো জ্যাক্ত পুতে দিতিস হারামজাদা! কিসের এতো অহঙ্কার তোদের? এমনিতে অহঙ্কার হলো আল্লাহর চাদর, ও নিয়ে টানাটানি করা দুর্মতির লক্ষণ। আরব হলো ইসলামের সুতিকাগার। তবুও তাদের এই ‘হটিনেস’ – এর কারন কি? হুম, আরবদের বিশেষত্ব হচ্ছে প্রানের প্রিয়তম নবিজি মহম্মদ (সা) সেই দেশের মরুভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আরবদের আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে খনিজ তেলের কারনে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের মুসলিম দেশের শ্রমিকের উপরে দয়া করা, এবঙ পশ্চিমাদেশীয়দের বেশি বেশি করে ‘তেল’ দেয়া, উভয়ার্থেই তেল দেয়া। বাংলাদেশ বা তৃতীয় বিশ্ব মাত্রই তাদের কাছে শ্রমিক, এ কথা আগেই বলেছি। আরবদের ভাগ্য যে মহম্মদ (সা) সঙ্কট বা পার্সিয়ান ভাষার জাত নন, তিনি আরবজাত সন্তান। আল্লাহ মহান, এবঙ বিচারক হিসেবে অত্যন্ত সুবিবেচক, কারন তিনি পৃথিবির শ্রেষ্ঠতম মানুষটিকে পাঠালেন আরবের মাটিতে। কারন? খুব সোজা। খারাপ মানুষদেরকে পথে আনবার জন্য সব সময়ই একজন ভালো মানুষের প্রয়োজন হয়। আর ভালো মানুষটি যদি হন ‘শ্রেষ্ঠতম’, তবে যাদের হেদায়েতের জন্য তাকে পাঠানো হচ্ছে, তাদের ‘রকম’ বোঝার জন্য কি আর গজ-ফুট-ইঞ্চি মিলিয়ে হিসেব জানতে হয়? নস্টোতম, ভ্রষ্টোতম, নিষ্ঠুরতম মানুষগুলোর হেদায়েতের জন্য পৃথিবির শ্রেষ্ঠতম সঙ্করকারকের প্রয়োজনের যুক্তি খন্ডন করা যায় না কিছুতেই।

ভাগ্য ভালো, আমি কৃষকের - শ্রমিকের জাত, কিন্তু আমি পৃথিবির বর্বরতম জাতির জাত নই। মানবজাতির হেদায়েতের জন্য যাকে পাঠানো হয়েছে তা নিয়ে তাদের গর্ব করার কিছু নেই, কারন তিনি কোনও জাতির একার সম্পত্তি নন – তিনি অতিমাত্রায় সমানভাবে এ বিশ্বের সবার। তবুও আরবেরা তাকে নিয়ে বিলিয়ন ডলারের খেলা খেলছে, আর ভাবছে ইসলাম যেনো তাদের বাপের সম্পত্তি – তারা-ই যেনো এর ধারক ও বাহক। বর্বরতা, মুর্থতা আর কাকে বলে! কে যেনো একজন কবে বলেছিলেন, জামাতে ইসলাম মানেই ইসলাম নয়, আর জামাতে ইসলাম না করার অর্থ ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করা নয় – কথাটা এতো ভালো লেগেছিলো আমার যে ভুলতেই পারিনা। আরব মানেই ইসলাম নয়। আরব হলো ভ্রান্ত বিলাস আর বেহুদা অহমের বিজ রোপন করে মুসলিম উম্মাহকে আলাদা করে রাখার এক ভ্রষ্টো জাতি। নবিজি বলেছিলেন, অনারবের উপরে আরবের কোনও শ্রেষ্ঠত্ব নেই। আরবরা এ কথা ভুলে গেছে।

(ভোর ৫ টা, ২৬০৬২০১৬, থাইল্যান্ড) মোরগদের জৈবঘড়ির কাটায় কোনও বিবর্তন নেই। এরা প্রাগৈতিহাসিক কালে যে সময়ে ডেকেছিলো, আজও ওই একই সময়েই ডাকছে। অর্থাৎ মোরগসহ আরও অনেক পাখ- পাখালির জীবনের ঘড়ির কাটা আধুনিকতার ঝাটা খায়নি বলেই হয়ত লক্ষ বছরের সময়ের চলনে সেই ঘড়ি ভুল ‘রিডিঙ’ দিচ্ছে না। নামকা বৈচিত্রের মধ্যে জীবনের সাধ ও আহলাদ পূর্ণ করতে গিয়ে ‘আধুনিক’ হয়ে ওঠা মানুষেরা সময়ের কাজ সময়ে করেনি, এদের তৈরি ঘড়িও সময় গুনতে ভুল করে, এমনকি ঘড়ি যদি ইয়ুরোপের দেশ সুইতজারল্যান্ডের হয়ে থাকে, তাও। যাদের তৈরি ঘড়ি ঠিক মতন সময় দিতে পারে না, তারা জৈব- ঘড়ির শরনাপন্ন হলে মানুষের ইতিহাস অন্য রকম হয়ে যেতো। জৈব- অজৈবে মিলেমিশে পৃথিবীটা অন্য রকম হতে পারতো। মানুষ ঘড়ির কাটার অবহেলার শিকার। এখন প্রশ্নটা হলো, আধুনিক আসলে কে? মোরগ, না মানুষ?

(২৯০৬২০১৬, রাত ২ টা ৩৫ মিনিট) ঘরের খিল আটে না এরা। গৃহস্থের ভাগ্যের উপরে কেউ কিল বসাবে, এমন সম্ভাবনা নেই বলেই হয়ত খিল আটার দরকার হয় না। এদের নিত্য ব্যবহার্য তৈজসপত্রাদি বাইরেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে অনেকটা। সৌদি আরবে নামাজের সময় হলে যার যার নামাজ পড়তে চলে যায় দোকানপাট প্রায় খোলা রেখেই। হুম, না বলে নেবার প্রয়োজন আছে অভাবির। সেখানে এমন অভাবি কম। হাড়- হাভাতে বাঙালিদের কু- কিত্তির কথা অবশ্য মাঝে- মাঝে শোনা যায়। সে অন্য প্রসঙ্গ। এখানে এই মুসলিম গ্রামে আহামরি ধনি মানুষ নেই। কিন্তু দরিদ্রও নেই। তবে রাবার চাষ করে নিম্ন- মধ্যবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত মুসলিমেরা যে একটু ধাতে ওঠার চেষ্টা করে যাচ্ছিলো, রাবারের দাম এমন কমিয়ে দিয়েছে গবরমেন্ট যে, কারও কারও শিরদাড়া দিয়ে রাবারের দুধ ঢেলে দিলেও কিছুটা পুষ্টি পাবে ঢের, বাজারে বয়ে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে। তবুও এরা ফুর্তি করে, হাসে, আড্ডা দেয়, বাংলাদেশের গ্রামের মানুষদের মতই। পার্থক্য খুবই সামান্য। কিন্তু যেটুকু পার্থক্য তা কিন্তু স্পষ্ট! এদের মধ্যে চেচামেচি, মন্দ কথা- বার্তা ঠেলাঠেলি দেখিনি এখনও। এরা অনেকে আমাদের মতই নামাজ কামাই করে, আমাদের মতই অনেকে নামে মুসলিম, কিন্তু এদের মধ্যে আছে সৌহার্দ। এরা পার্টি করে, সেখানে মুরগির পোড়ানো ঠ্যাঙ চিবানো যায়, পেপের সালাদে মুখ চুবিয়ে দিয়ে বলা যায় ‘আ রয়’ - দেলিশাস! তবুও কে ঠ্যাঙ খাবে আর কে রান, তা নিয়ে ঝগড়া হয় না। এই পার্টিগুলোতে সবই থাকে, শুধু মদ নেই। মদ নেই তাই উদোম নাচানাচি নেই, মদ নেই তাই মাতলামি নেই, মদ নেই তাই ধর্ষনের সম্ভাবনা নেই। আমি মদওয়ালা পার্টিও দেখেছি এস্তার। পার্থক্যটা খুবই সুস্পষ্ট। মদ খাওনা – তুমি তো দেখছি ভালো ছেলে হে! গুড গুড! এ কথা যারা বলেন, তারাও ঢেলে কষে মদ গেলে। মদে কি হয়, আর কি হতে পারে তা এদের জানা। এরা আমেরিকাকে নকল করে। এরা জানে, মদ আমেরিকা নামের একটা ব্রস্টো দেশকে আরও ব্রস্টো করছে, আরও মদ্যপ করছে, আরও হিঙস করছে, আরও মাতাল ও শক্তিমত্ত করে তুলছে। তেনারাও জানেন যে মদাক্রান্ত, এবঙ বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো সম্ভ্রাসি এই দেশটির সমাজ ব্যবস্থা, পরিবারব্যবস্থার মধ্যে যে শনি ঢুকে গেছে তা থেকে বেরোনো কত কঠিন। আর, এখানে এই নিশ্চিতি গ্রামে রাতের অন্ধকারে মেয়েরা মটরসাইকেল চালিয়ে মসজিদে এসে নামাজ পড়ে চলে যাচ্ছে দেখে আমার মনে হয় এরা কত নিরাপদ!

গ্রামের এই মানুষগুলোর পার্টিতে মদ নেই। এখানে ধর্ষনের কোনও সম্ভাবনা নেই। এই গ্রামে কোনওদিন কোনও ইভটিজ হয়নি, ধর্ষন হয়নি, অপহরন হয়নি। এরা আমাদের মতই স্বল্পশিক্ষিত, অনেকে অশিক্ষিত, একেবারে গোয়া ভুত। কিন্তু তবুও এদের মধ্যে মানবিকতাবোধ প্রবল। এই জিনিসটা স্কুল- কলেজের বই পড়লেই গজায় না বুঝতে পারি। এরা নিরাপদবোধ করে সব কিছু আল্লাহর উপরে ন্যস্ত করে। ফলে দরজায় খিল আটার প্রয়োজন কম। অবশ্য যে ঘরে সোমত্ত মেয়ে

আছে, সে সব গৃহের ছিটকিনি অভিকর্ষ বলের বিপক্ষে ক্রিয়া করে কি না জানা নেই। তবে পচিশ বছরে যুবক খালিদ আমাকে তার ঘরে থাওয়াতে যখন নিয়ে গেলো তখন ভোর চারটা। জেনেছি যে, ঘরে তার দুইভাই, তাদের স্ত্রি-সন্তানেরা আর এক যুবতি বোন ঘুমাচ্ছে। খালিদ বারান্দায় উঠে ঘরের সদর দরজা টেনে খুলে দিলো।

একটা গল্প মনে পড়লো। প্রাসঙ্গিক কোনও গল্প নয়, কিন্তু তবুও মনে পড়ে গেলো। মনে পড়লো বলেই বলতে চাওয়া। ডাবলু ভাইয়া আমাদের মধ্যে এক মজার মানুষ। ইনি আমাদের ভাষায় ‘পচা গল্প’ করতে ওস্তাদ। ওই অর্থে সব সময়ই যে গল্পগুলো ঠিক ‘নস্টো’ হয়ে ওঠে তা নয়, কিন্তু তার বিশেষত্ব হচ্ছে, তার গল্প বলার ধরনে শ্রোতার হাসি না আসতে পারে, কিন্তু গল্প শেষ হতেই আমাদের গল্পকারক ডাবলু ভাইয়া নিজেই যেভাবে হাসতে হাসতে বিছানা কিম্বা মেঝেতে গড়িয়ে পড়েন, তা দেখে শ্রোতা অর্থাৎ আমাদেরও অবস্থা কাহিল হবার মতন হয়। তিনি গল্প বলে নিজে গড়ান, শ্রোতা গল্পে যতটা না, ওই হাসিতেই গড়ায়। সেবার তিনি একটা গল্প বললেন –

ক্লান্ত মুসাফিরের যাত্রাপথে সঙ্গে ঘনিয়ে এলে ঘুমাতে হবে কোথাও – এমন ভেবে সে এক গৃহে উপস্থিত হলো। গৃহস্থ ‘দুগ্ধিত ভাই, আমাদের ঘরে যুবতি মেয়ে আছে...’ – এ কথা বললে তাকে প্রথমবার নিগৃহিত হতে হলো। এরপর দ্বিতীয় গৃহে আমাদের মুসাফিরের ঘুমানোর প্রচেষ্টা। সেখানেও প্রায় একই অজুহাতে তাকে বিদেয় করে দিলেন গৃহকর্তা। এরপর তৃতীয় ঘর, তারপর চতুর্থ ঘর। উহু, হলো না। কিন্তু কি অবাক কান্ড! সবাই একই অজুহাতে তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে! এ দিকে ক্লান্তিতে তার শরির ভেঙে আসছে, এমন সময় তার মাথায় একটা দারুণ বুদ্ধি খেলে গেলো। পরবর্তি বাড়ির মালিকের সঙ্গে মুসাফিরের কথা হচ্ছে –

- সালাম আলাইকুম ভাই।
- ওয়াসসালাম, কি করতে পারি আপনার জন্য?
- আচ্ছা ভাই, আপনার ঘরে কি কোনও যুবতি মেয়ে আছে?
- কেন বলুন তো!
- না, মানে একটু শুভাম!

গল্প এখানেই শেষ। ক্লান্ত মুসাফিরের তকদির নিয়ে পরবর্তি চিন্তা না করাই মঙ্গলজনক। কিন্তু আমাদের গল্পকারক ডাবলু ভাইয়ার হাসির ঠেলায় আমার এবড় অন্যদের নিজেদের পেটেই বেথা হতে শুরু করে। এ গল্প উনি বহুবার আমাদেরকে বলেছেন। কিন্তু হাসির ফলাফলে কোনও পরিবর্তন হয়নি। ভবিষ্যতেও হবে এমনটা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।

ঘরে যুবতি মেয়ে থাকলে বিপদের ঘনঘটা আছে নৈতিকতা বিবর্জিত সমাজে। নৈতিকভাবে স্থলিত মানুষেরা সব যুগে সব সমাজেই কম বেশি থাকে। থাকেই। কিন্তু একটি সুসহ সঙ্স্কারের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ‘থুঙ ইয়াই’ নামের এই স্বল্পশিক্ষিত গ্রামে ‘ঝুকি’ অনেক কম মনে হয়েছে আমার। আমাদের দেশের মুক্তচিন্তক ‘আধুনিক’ হয়ে ওঠা যুবক-যুবতির দলে অবশ্য বাধ সাধবেন, বলবেন, ‘প্রিমিটিভ’ চিন্তা ভাবনা! কিন্তু এই গ্রামের সোমন্ত নারি কিম্বা বৃদ্ধা সবাই মটরসাইকেল চালায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে যায়

নিজেদের গাড়ি চালিয়ে, বাড়ির কাজে বাবা-মাকে সাহায্য করে, বাজার থেকে শাক-সজি কিনে এনে রান্না করে, অন্যকে ‘সাদাকা’ করে, দাওয়াত দিয়ে খাওয়ায়, গ্রামের অনুষ্ঠানে দোকান বসিয়ে খাবার বিক্রি করে, গ্রামের প্রতিবেশিদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলে, শত্রুতা করে না, মসজিদে ছেলেদের সঙ্গেই পর্দা করে নামাজ পড়ে। তখন আবার মুক্তচিন্তকের দল মন্তব্য করবেন, ওই যে! সারা শরির ঢেকে রেখে দিয়ে সে আসলে নিজেকেই শৃঙ্খলে জড়িয়েছে, এর থেকে বের হবে কেমনে? তা বটে! বাপ-মার মুখে চুনকালি লাগিয়ে ‘আধুনিক’ হওয়ার নাম করে রাস্তায় বেরিয়ে এলে যখন জনগনে কাউকে সাধারণ সম্পত্তি মনে করে, তখন সে কি সুখ! এই মেয়েরাও রাস্তায় বেরিয়েছে কিন্তু! বরঙ ঢের বেশি বেরিয়েছে। কিন্তু মঙ্গলের সার্বিক ধারণাটা যার জানা হয়নি, সেইসব বখাটে আধুনিকদের আছে স্পর্ধা, আছে আশ্ফালন।

স্বপ্নের জ্যা-শব্দ

১।

(২৫/১১/২০১৫, বেলা ৩ টা ১৭ মিনিট)

স্বপ্ন দেখার রোগটা আবার শুরু হয়েছে। ঘুমের সঙ্গে স্বপ্নের সম্পর্ক আছে। অবশ্য দিবাস্বপ্নকে এর সঙ্গে মেলানো যাবে না। দিবাস্বপ্নকে নিজের জীবন উন্নয়নের কাজে লাগানো গেলে ব্যক্তির উপকার সাধিত হতো। কিন্তু আমরা দিবাস্বপ্নই শুধু দেখি, তা থেকে প্রেষণা গ্রহণ করি না।

অক্ষিগোলকের নড়ন আর চড়নের অবস্থা না ঘটলে নাকি স্বপ্নের জন্ম হয় না। স্বপ্ন নেই তো অসম্ভব ঘটনা নেই। সম্ভব আর অসম্ভব ঘটনার রসায়ন হচ্ছে গিয়ে স্বপ্ন। পশ্চিমা গবেষকরা বলছেন র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট এর কথা। যতসব। ওরা বলবে আর তাই হতে হবে নাকি? হুম, হতে হবে। যতদিন ক্ষমতার পেলাই সাইজের মসনদে ওরা বসে আছে ততক্ষণ ওরা স্পেডকে ডায়মন্ড বললে বাকি পৃথিবিকেও তাই বলতে হবে। অর্থাৎ জি সার, হ্যা সার করতে হবে। ওরা আজকে বলবে, ওহে প্রাচ্যের কালো মানুষেরা, তোমাদের জন্য এই প্রলেপ আমরা গবেষণা করে তৈরি করেছি, এটা মুখে লাগাও আর ফর্সা হও। কালকে এই ওরাই বলবে, আরে ফেলো ওটা, এই দেখো নতুন গবেষণা, আগেরটা আসলে নাথিঙ, এটাই আসল। এভাবেই কিন্তু চলছে পশ্চিমা দেশের গবেষণা গবেষণা খেলা!

বন্যা এলো। দেশে বন্যা আসাটা স্বাভাবিক ঘটনা। দেশে শুধু নয়, সবখানেই হবে বন্যা। বন্যা প্রকৃতির একটি স্বাভাবিক ঘটনা। বন্যা হবে, আর বন্যার জল ধুয়ে যাবার জন্য আছে নদি। কিন্তু নদি আমরা ভরে ফেলেছি আবর্জনা দিয়ে। আমাদের মন যেমন আবর্জনাময়, আমাদের পরিবেশকেও সে রকম করে ফেলেছি আমরা। আমরা যে কত নিচ, তা আমাদের প্রতিবেশ দেখলেই যে কেউ আন্দাজ করতে পারবে। নদি ভরে ফেলেছি আবর্জনা দিয়ে, বানের জল গড়াবে কিভাবে? অর্থাৎ তখন বাড়িতে পানি ওঠে। তখন দাদারা অর্থাৎ নেতা ভাইয়েরা অবশ্য মওকা পেয়ে কাজে লেগে পড়ে যান। বানের জল নাবাতে তখন সে কি প্রচেষ্টা। মনের আবর্জনা নামানো গেলে হয়ত ক’বছর পর বানের জল নদি দিয়েই গড়াতো। তবে তা হবার নয়।

স্বপ্নে দেখছি একখন্ড জমি বন্যার জলে ভরে আছে। ওদিক দিয়ে পার হতে হবে। কিন্তু পার হবে মানুষ নয়, বৃক্ষ! বলে কি!

হ্যা, ঠিকই বলছি।

তখন দেখলাম, নৌকায় করে মন্ত্রী এসেছেন। উনি বক্তৃতা করছেন -

ভাইসব, বৃক্ষেরা জেগে আছে। এই বন্যায় দেখুন তারা কেমন মাথা উচু করে দাড়িয়ে আছে।

আমরাও দাড়িয়ে যাবো, কেউ আমাদের কিস্যু করতে পারবে না...

খুবই অনুপ্রেরনামূলক বক্তৃতা, সন্দেহ নেই। জাগতেই হবে সবাইকে – এই কথা মন্ত্রী যখন বলেন তখন তা থেকে অনুপ্রেরনা না পাওয়ার কোনও কারন নেই। কিন্তু আমি পেলাম না। তখন মানুষের কথা বিস্মৃত হয়ে আমি বৃক্ষদের কথা ভাবতে থাকি। হরমোনের ক্ষরনটা তখন একটু বেশিই হলো, নইলে আমি কেমন করে অমন জাহাজ মন্ত্রির সামনে দাড়িয়ে পড়তে পারলাম?

- ‘মাননীয় মন্ত্রী, আমার আপত্তি আছে আপনার কথায়’

■ তুমি কে গা?

- আমি জনতা।

■ অর্থাৎ জনতা পার্টি?

- না মন্ত্রী মহাশয়, কোনও পার্টি টার্টি নয়, ওগুলো ডার্টি হয়ে গেছে। আমি হলাম আম।

মন্ত্রির মুখ দেখে মনে হলো, তিনি ভাবছেন, এই অবেলায় আম এলো কোথেকে? এখন তো ভাদ্র মাস!

যা হোক, মন্ত্রী গজরাচ্ছেন, কিন্তু কিছু বলতে পারছেন না।

আমি তখন বলি, আমি কি বলবো আমার আপত্তির কথা?

■ আচ্ছা, বলে ফেলো।

- আপনি বৃক্ষের কথা বলেছেন যে তারা দাড়িয়ে আছে, জেগে আছে।

■ হুম সত্যিই তো বলেছি, চলে যাও রাতারগুল, আর দূরে তাকিয়ে দেখো, কিছু দেখতে পাও না হে! চোখের মাথা খেয়েছো নাকি?

- পাই তো, কিন্তু অনেক কিছুই তো দেখতে পাই না মন্ত্রিবর!

এই কথা শুনে পাশ থেকে সাঙ্গ গোছের একজন আমার দিকে মুষ্টি পাকিয়ে আসতে গেলে মন্ত্রী তাকে হাতের ইশারায় বাধা দেন।

আমি বলি, ঘাস, গোলাপ ফুলের গাছ, গুল্ম, এদের কথা কি স্মরণ রেখেছেন মন্ত্রিসাব? ওরাও তো বৃক্ষের দলভুক্ত! মাথা উচু করে জেগে থাকা কয়েকটা বৃক্ষদের দেখেই কি বলে দেয়া যায় যে সব সবুজই হয় জেগে থাকাদের দখলে?

পুলিশ এসেছিলো কি না জানি না। স্বপ্ন তখন ভেঙে গেছে টিভির আওয়াজে। সেখানে মন্ত্রী চেচাচ্ছেন -

আমরা হ্যান করেছি ত্যান করেছি, হ্যান করেঙ্গে, ত্যান করেঙ্গে, জরুর করেঙ্গে।

বটে! গড় প্রবৃদ্ধির হার আশা যা ছিলো তার চেয়ে মেলা বেড়েছে বলে মন্ত্রির সে কি আহলাদ!

আমার তখন একটা গল্প মনে পড়ে, এটা কি গল্প না প্রশ্ন তা ভুলে গেছি। বোধ হয় কেউ আমাকে প্রশ্নটা করেছিলো ছোটবেলা, গড়ের অঙ্ক কষতে দিয়ে। ললিত সার আর হাফিজ সার আমাকে অঙ্ক করাতেন। অঙ্কে ভালো ছিলাম মোটামুটি। ভালো পেরেও বেতের বাড়িও খেতে হতো অনেক সময়। এখন আবার একটা গল্প মনে পড়ে গেলো। ফাইনাল পরিষ্কার খাতা দেয়া হচ্ছে। হাফিজ স্যারের হাতে বেত। খাতার সঙ্গে প্রত্যেককে বেতের ভিষন বাড়ি উপহার দেয়া হচ্ছে। হাফিজ সার ঠোট কামড়ে ধরে পেরাতেন। লম্বা লম্বা বেতের বাড়ি হাতে পড়লে মনে হতো আকাশ থেকে গোলা পড়েছে। মেঘেরা পাঠিয়েছে। অর্থাৎ বজ্রাহত হয়ে নিজের আসনে বসবার আগে মনে হতো, আহা কেন যে অঙ্কটা আর একটু ভালো করে করলাম না! সে যা হোক। সবাই বাড়ি খেলো। খেলো না একজন। সে আমি। আমি পরিষ্কার চুরানব্বই মার্কের উত্তর করেছিলাম। চুরানব্বই পেয়েছিলাম। সার এতে খুশি, পেটালেন না। কিন্তু যায় কই! আবুল তখনও হাত কচলে যাচ্ছে আর ‘উহ আহ’ করছে। ওই আবেগেই কি না জানি না সে বলে বসলো, সার, ও (আমি) তো একশ পায়নি। তাহলে ওরে কেন... ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাই তো! সার যে এটা অন্যায় করছেন! পরিক্ষায় আমি তো শতভাগ নির্ভুল নই। তবে আমি কেন বেতের মার হতে ছাড়া পাবো? সার ডাকলেন। পরের ঘটনাটার কথা স্মরন হতেই আমি আজও হাতের দিকে তাকাই। বজ্র পড়েছিলো হাতে। পড়া-ই উচিত হয়েছিলো। সার সঠিক ছিলেন। ভুলের ক্ষমা যে করে সে মহত, এই কথা বারে বারে খাটে না। অন্তত ক্লাসের খাতা দেবার সময় তো নয়ই।

কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পেরেছিলাম কি না মনে নেই। অনেক আগের কথা। কিন্তু আজ একটু বয়স বেড়েছে, একটু বুঝতেও শিখেছি।

প্রশ্নটা এমন ছিলো – আচ্ছা বলো তো, জলের গভিরতা যদি পাচ ফুট হয়, আর একশ জন মানুষের গড় উচ্চতা যদি সাড়ে পাচ ফুট হয়, তবে কি এতে নিশ্চিত করে বলা যাবে যে সবাই হেটে ওই জলে গলে বেরিয়ে যেতে পারবে?

আমার বন্ধু এই প্রশ্ন শুনে বলে, হাটার দরকার কি, সাতরে গেলেই তো হয়!

আমার বন্ধুর মত এত বুদ্ধিমান আমি নই, আমি ভাবছি, আরে তাই তো! একজনের কাছে এক টাকা আছে, আর একজনের কাছে নিরানব্বই টাকা। অর্থাৎ গড়ে পঞ্চাশ টাকা করে আছে। এখন রুটি যদি পাচ টাকা প্রতিটি হয়, তবে কি বলা যায় যে দু’জনই রুটি খেতে পাচ্ছে?

বন্ধু বুদ্ধিমান, বৈষয়িকও। আবার বলে, জলটা গঞ্জাজল হলে ভালো, তাতে কারও কারও স্বর্গপ্রাপ্তি হবে, মন্দ কি!

খেতে পাচ্ছে তো বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষেরা, এশিয়া-আফ্রিকার কাঙালেরা? খেতে পায় পৃথিবির সবচেয়ে বৃহত্তম দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দেশ ভারতের সবাই? বলিউড, বেঙালোর, ক্রিকেট, আর উপরের ক’জন র‍্যাঙ্কধারি ধনিদের দেখে কি বলা যায় সবাই খাচ্ছে? বলা কি যায় আসন্ন শিতে বাংলাদেশের সবাই কাপড় পরতে পারবে শিত নিবারনের জন্য?

দেশে লক্ষ-অজুত-নিযুত প্রজা না খেয়ে থাকে। যারা না খাইয়ে রাখেন তাদের অপরাধ কি আমার শতভাগ মার্ক না পাওয়ার চেয়ে কম?

না কম না, এই উত্তর আমি নিজেই দিয়েছি।

কেন?

কারণ বেতের বাড়ি দেবার জন্য উপযুক্ত অভিভাবক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

২।

(২০/০৪/২০১৬, রাত ১১ টা ৩০ মিনিট, পাথালুঙ, থাইল্যান্ড)

বেতের বাড়ি যারা দেবেন বলে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে একটা সমঝোতা হয়েছে। ফলে তারাও এখন ধামা ধরেন। অর্থাৎ বেশি তেল যাতে না পড়ে যায়, তাই এই ব্যবস্থা। ধামা ধরলে কিছু তো মিলবে। ‘তাতেই কাপড় তাতেই ভাত’। সমাজের উচ্চ শ্রেণির ‘ওদের’ মধ্যে আনুকূল্য বড়ো অদ্ভুত। কেউ কাউরে ভালোবাসে না ওরা, কিন্তু একে অপরের জন্য ‘কম্ম’ করে যায়। এই কম্মের ধম্ম হচ্ছে টাকা। একটু ভালোভাবে ছড়ি ঘুরিয়ে বাচতে চাওয়া। সন্কে হলে মদে ডুব দিয়ে এরা কহেন – *আ/গর জন্নত বরুয়ে জমিনস্ত, হমিনস্ত হমিনস্ত হমিনস্ত*। অর্থাৎ ধম্মের ঘাড়েরা আর কিছু না পারলেও সুন্দর কথা কইতে জানেন ভারি। এই সময় বড়োকাকা খন্দকার মকবুল হোসেন এসে হাজির। আমি তারে শুধাই, আচ্ছা জমিন যে গ্রাম- ইউনিয়ন- থানা- জিলায় ফারাক হয়ে গেলো কাকা, এ বুঝি সেই ব্রিটিশরা করে গিয়েছিলো?

তিনি আমাকে বলেন, তা তুমি এ নিয়ে এতো ভেবে সময় নষ্টো করতিছো কেন? যাও গো, পড়ায় মন দাও।

আমি গো ধরি, না! আমার পড়া হয়ে গেছে বড়োকাকা। এখন আপনার সঙ্গে গল্প করবো। বলেন না, এটা কি ওদেরই কারবার?

বড়োকাকা মুশকিলে পড়েছেন বলে মনে হলো। আমি ভাবলাম স্কুলের খাতা কাটা, নামাজ আর হারমোনিয়ামে গলা সাধা এই যার প্রধান কাজ ছিলো, তাকে কি বিপদে ফেললাম আমি? লজ্জা পেতে থাকি মনে মনে। কিন্তু প্রশ্ন যেহেতু করা হয়ে গেছে, এ থেকে বের হয়ে আসা, অর্থাৎ ‘উইথড্র’ করাও সম্ভব নয়। স্বপ্নে কেউ এই কাজ করেছে বলে শুনি।

বড়োকাকাকে মনে হলো কিছু বলার জন্য তিনি প্রস্তুত! তিনি আমাকে বলেন, তুমি চোরকে প্রশ্ন করো, সে ভালো কি না মন্দ! দেখো সে কি উত্তর দেয়।

আমি বলি, আমি কেমন করে জানবো যে, বেটা চোর?

বড়োকাকা এবার কপট রাগ দেখান, কেন তোর জানতি সমস্যা কুথায় যে সে চোর না পুলিশ!

- আমি তালি পুলিশেরও এই প্রশ্ন করতি পারি বড়োকাকা?

■ বেতের বাড়ি খাতি ইচ্ছে হলি কর গো, যা!

অর্থাৎ পুলিশই হলো সেই সঙ্কট যে কি না বেতের বাড়ি দেবে। কিন্তু কাকে দেবে আর কাকে দেবে না সেটা ঠিক হয় অন্যখানে। বড়ো কঠিন শৃঙ্খল!

এবার বড়োকাকা একটা গান ধরলেন। তার একখান গলা! বাব্বা! গমগম করে। উনি হলেন জাত নজরুল সঙ্গিত শিল্পি। গানটা যে কোনটা সেটা এখন আর আমার মনে আসছে না। স্বপ্নের সহস্র ঘটনার আড়ালে হারিয়ে গেছে। আরও কতশত কথা হয়েছে তার সঙ্গে, কিন্তু না, মনে পড়ে না সব। স্বপ্নের প্রায় সবই তো মানুষ ভুলে যায়, যা মনে থাকে, তাও ভুলে যায়। আমি আরও ভুলি। তাই এই লেখা।

৩।

(১৫/১২/১৫, সকাল ৬ টা ১ মিনিট, থাইল্যান্ড)

স্বপ্নে দেখছি আমার *র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট* হচ্ছে। অর্থাৎ স্বপ্ন দেখলাম যে স্বপ্ন দেখছি। চোখের তারা কত দ্রুত ঘুরছিলো সে কথা মনে নেই। তবে সোনালি যুগের সিনেমার রিল ঘোরার মত পটপট বা টপটপ করে যে আওয়াজ শোনা যেতো (অবশ্য এ শব্দ শুধু প্রোজেকশনিস্ট শুনতে পারেন। ওই শব্দ শুনে শুনেই তো তার পোড়া জীবন গেলো!), অনুভূতিটা সে রকম। রিলের মুভমেন্টে পয়ত্রিশ মিলিমিটার ছবি, চোখের মুভমেন্টে স্বপ্ন। দেখলাম কে যেনো আমার ঘরের সামনে মাজার বানাচ্ছে। ঘর কোথায় তা জানি না। হবে কোথাও। স্বপ্নের ঘরে দলিল দস্তাবেজ লাগে না। ফলে ‘লোকেট’ না করতে পারলেও তাতে স্বপ্নে বেঘাত ঘটে না।

দেখলাম যে মাজারের কাজ প্রায় শেষের দিকে। আধুনিকতার সব অত্যাশ্চর্য চটকদারি রকম-সকম চটকিয়ে সভ্যতা উদ্ধারের এমন এক যুগেও কেউ নতুন একটি মাজার বানাতে পারে, ভাবতেই যেনো কেমন লাগে! কিন্তু এর ঠিক পরেই সে ‘কেমন লাগা’টা তিরোহিত হয়ে গেলো। বরঙ ভাবতে থাকি, মাজার তো আর এবাদতখানা নয়, স্নেহ একটি বেবসা প্রতিষ্ঠান। মাজার এখন বাজার। মুক্তবাজারের পালে হাওয়া যেই লেগেছে পুজিবাদের বিকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। প্রোডাক্ট নিয়ে বেবসায়িরা দুনিয়াময় দৌড়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু মাজারে পারলৌকিক প্রোডাক্ট কিনতে ধন্য দেন স্বয়ং ক্রেতারা। পার্থক্য এটুকুই। দুনিয়া জুড়ে বড়ো বড়ো বেবসার অন্যতম প্রধান দুটি হলো অস্ত্র এবং নারকোটিকস এর বেবসা। আমি তখন

আমাকে প্রশ্ন করেছি যে, মাজার বেবসা কি এর চেয়ে খারাপ? এরা তো মানুষ মারছে না! তখন আবার অরিন্দম বিষাদে কহিলেন, কেন? জঙ্গিবাদ বিস্তার করেছে কে?

আমি তখন বললাম, জিবনে বেচে থাকাটা-ই যেহেতু শেষ কথা, মাজার যে গড় হারে জঙ্গিবাদি হয়ে গেছে, এর কোনও প্রমান তো কারও কাছে নেই! অনুমান করে অবশ্য অনেক কিছু চালিয়ে দেয়া যায়।

এই কথা বলে আমি যে মাজারের পক্ষে সাফাই গাইনি সে কথা নিজেকে বলেছি। অন্যকে বলার কোনও দায় আমার নেই। তবে কি না, আমাকে যারা এর পরেও এক হাত নিতে চাইবেন, তারা বলবেন, তোমার প্রোপোজিশন যদি মেনেও নিই, তবে তারা এর চেয়েও অনেক খারাপ কাজ করছে।

- সেটা কি?

■ যদি ধরে নিই যে তারা মানুষ মারছেন, তারপরেও আমরা বলবো যে, মারছে না মানে?

- হেয়ালি ছেড়ে মনের কথাটা খুলে বলুন।

■ মনই যেহেতু মানবিকতার মূল বস্তু, মাজার তো তাকে হত্যা করেছে! এ দেহের কি দাম!

- বাহ বাহ! চমতকার বলেছেন - এ দেহের কি দাম! হক কথা! বটে!

তারপরে তারা আবার বলবেন, লজিক অর্থাৎ বোধিকে হত্যা করা টিস্যু কলার দেহকে হত্যা করার চেয়ে নৃশঙ্কস!

আমি মনে মনে ভাবি, ভোগ যাদের কাছে একমাত্র মুখ্য ও আগু বস্তু, তারা কেমন করে এমন সুন্দর করে নিজেদের পক্ষে সাফাই গাইতে পারে! ভোগের কাছে যারা ধরা খেয়ে গেছে, সে ওই মাজারও, তাদের জন্য সুন্দর বানি। বাকিরা অর্থাৎ আমাদের মত আম'রা

- এদের হাতে কলা, কাচকলা। কি সুন্দর করে বলছে - এ দেহের কি দাম, যেনো পুরোটা-ই মারফতি! কার মুখে কি শুনছি যে, আজকাল নিজেই কইতে পারি না। শয়তানের অবশ্য সন্ন্যাসি হওয়ার অপচেষ্টা নতুন কিছু না। আমাদের দেশের বুদ্ধিদিশু আলোকপ্রাপ্ত মানুষগুলোও এমন, মাঝে মাঝে সন্ন্যাসি হবার ভাব করেন। ভুল! মাঝে মাঝে না, তারা আসলে সব সময়ই দেখান যে তাদের মত ভালো মানুষ এই জগতে পাওয়া ভার। এই ভাবনায় আমার বমি পেতে শুরু করে। আমি জেগে উঠে দেখি বমি পায়নি - ওটাও স্বপ্ন!

৪।

(একটি অলৌকিক ভাসন, ১২/২/২০১৫)

আজ একটা স্বপ্ন দেখলাম। এমনিতে স্বপ্ন-টপ্ন দেখিনা খুব একটা। যাদের স্বপ্ন বারে বারে ভেঙে ভেঙে খানখান হয়ে যায় তাদের স্বপ্ন দেখা ঠিক না। আমাদের জাতিয়ভাবে স্বপ্ন দেখা এবঙ তা ভঙ্গ হওয়া একটা সঙ্কৃতি। আমরা আশাব্যস্ত হই, জেগে উঠি, আবার ঢলে পড়ি হতাশায়। তাই স্বপ্ন না দেখা উচিত। কিন্তু আজ দেখলাম। এটাকে অবশ্য স্বপ্ন না বলে দুঃস্বপ্ন বলা উচিত। দেখলাম, আমি কোন এক মোড়-টোড়, না এই জাতিয় কোন জনসঙ্ঘযোগে দাড়িয়ে পড়েছি। অথবা কোন সম্মেলন-টম্মেলন কিছু একটা হবে। সে যাই হোক। সেখানে আমার কিছু কথা আছে সে রকমই ভাব মনে হলো। একটা দরজা খুললাম (মোড়ে দরজা কোথা থেকে এসেছিলো সেটা কোনদিনই খুঁজে বের করতে পারবে না কোন গবেষক, স্বপ্ন বলে কথা!)

আমি এবার কথা শুরু করি ,অর্থাৎ ভাসন। আগে কি ছাই মাথা বলেছি সেগুলো মনে নেই। কিন্তু নিচের কথাটা একেবারে স্মরণযোগ্য। স্পষ্ট মনে আছে। আমি বললাম (আমার গলায় সে কি তেজ! এতো তেজ কোথায় পেয়েছিলাম স্বপ্নে জানি না)

.....হে রানি, আপনার বাবা আমাদের সবার বাবা, অর্থাৎ মহান জাতির
পিতা বলছেন, যাদের জন্য এ রাজনীতি, তাদের জন্য যারা দু'মুঠো
ভাতের ব্যবস্থা করতে পারে না, তাদের রাষ্ট্রনীতি থেকে সরে যাওয়া
উচিত। হে মান্যবর, হে কদ্রি, আপনার রাষ্ট্রনীতি ছেড়ে দেয়া উচিত.....

এরপরে আরও কিছু বলেছিলাম। কিন্তু আর মনে করতে পারিনি। স্বপ্নের কথা সব কিছু মনে থাকে না। একেবারে যা না ভোলা যায় ,অর্থাৎ মনে দাগ কেটে যাবার মত কিছু হলে সেটা মনে থাকে। আমারও সে'রম হয়েছে।

তারপর দেখলাম আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমি নাকি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মত জঘন্য অপরাধ করেছি!

যদি স্বপ্নে দেখতাম যে মহান জাতির পিতা বেচে আছেন তবে স্বপ্নের মধ্যে কি দেশ-মাতা কি তাকেও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে গ্রেফতার করতেন? কারন এ কথা তো আমার নিজের কথা নয়। এ যে স্বয়ং জাতির পিতার উক্তি!

বিষয়টা কি জটিল হয়ে যাচ্ছে? একে স্বপ্ন, তায় আবার জাতির পিতা সে কথা বলেছিলেন কি না সেটা কিন্তু আমি জানি না। স্বপ্নে আমার মনে হতে পারে যে এটা হয়ত জাতির পিতারই কথা! তাই আমি হরমোন-এর অত্যধিক ক্ষরন বাচাতে মোড়ে মওকা পেয়ে ঝেড়ে দিয়েছিলুম কথাগুলো।

স্বপ্নে আরও দেখলাম যে ,আমাকে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। ওরা বলতে আমি রাষ্ট্রের চোর ধরার কাজে নিযুক্ত পুলিশদেরকে বুঝিয়েছি। আমি তো চুরি করিনি, কিন্তু তাও আমাকে নিয়ে যাচ্ছে, এটা আমার অনুভূত হতে লাগে। পরে বুঝতে পারি আমাকে ওই ভাষনের জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু আমি তো মন্দ কিছু বলিনি। দেশে অনাহারক্লিস্ট মানুষের জন্য রাজনিতিকদের কোন চিন্তা নেই। ইচ্ছেও নেই। থাকবে কেন? রাজনীতি তো এখন সবচেয়ে লাভজনক বেবসা ,আখের গোটানো পেশা। সাধারণ মানুষের প্রতি ভালোবাসা থাকলে সেই পেশায় বাধা পড়তে পারে। ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এটা আচ করেছিলেন। তিনি বললেন ,

বাবুরা কঙগ্রেস করছেন ,আসফালন করছেন ,বজুতা করছেন ,
ভারত উদ্ধার করছেন ,কিন্তু দেশের হাজার হাজার লোক
প্রতিদিন অনাহারে মরছে ,সেদিকে কারও চোখ নেই।

যাদের জন্য রাজনীতি তাদের সঙ্গে মিশে না গিয়ে দামি গাড়ি আর সাত তারকাওয়ালা লাইফ স্টাইল অবলম্বন করে মুখে বড়ো বড়ো কথা বলে যে রাজনীতি ,তার নাম ধোকা। আমরা কি সেটা বুঝতে পারছি? জনগনের দাবির মুখেও আমরা রাজনিতিকেরা মুখে কুলুপ এটে বসে থাকি। জনগন জিম্মি , কিন্তু আমরা বলি তারা মুক্ত। ক্ষেতমজুর আর কৃষকের ও তাদের পরিবারের নিত্যদিনের হাহাকার রাজনৈতিক সভা-সমিতি আর মিটিঙ-ফিটিঙ এর ডামাডোলে চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু তার পরও কিছু লেজুড় বুদ্ধিজিবিরা বচন ছেড়ে যাচ্ছেন, কই দেশ তো এগিয়েছে! দেশের প্রবৃদ্ধি বেড়েছে! ইত্যাদি ইত্যাদি।

ক্ষুধায় যদি এ দেশের একটি, শুধুমাত্র একটি মানুষও কস্টো পায়, তবে দেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্পন্ন হয়েছে বলা যাবে না। আর এখন তো ক্ষুধার্তের পরিসংখ্যান কোটির হিসেব দেয়। তারপরও

কি বাগাড়ম্বর— আমরা স্বাধীন! আমরা স্বাধীন! আমরা এগিয়ে গেছি! আমরা পেরে গেছি, আমরা হ্যান, আমরা ত্যান ইত্যাদি বাক্য দিয়ে সাধারণ জনগনকে মাথায় হাত বুলিয়ে চুপ করে রাখা রাজনিতিকেরা আসলে জর্জ বার্নার্ড শ'এর ভাষায় —

এক সারি ক্ষয়ে যাওয়া মোমের পুতুল ,যারা আসলে
সিমালজ্ঞানকারি ,এবং তারা একটি দুস্ট ও স্বয়ংক্রিয় সরকার
ব্যবস্থার মধ্যে ঝুলে আছে ,যে ব্যবস্থার একমাত্র মন্ত্র হচ্ছে ফাকা
বুলি এবং মিথ্যা গল্প।

সে যাক।

স্বপ্ন এখনও শেষ হয়নি। পথে হেটে যাচ্ছি, সঙ্গে পুলিশ। রাস্তায় দেখি পঙ্গপালেরা পড়ে আছে কোটি কোটি। প্রথমে আমার মনে হলো মৃত পঙ্গপাল যেনো নয়, রাস্তায় যেনো বাসর সাজানো, যেনো ফুলের বিছানা। কিন্তু মোহ ভাঙলো আমার। অজুত পঙ্গপালেরা কেমন করে ফুলের বিছানায় শোভা পায়! অগুনতি মৃত পঙ্গপালের মধ্য দিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হলো। ভাগ্যিস সে গুলো মৃত মানুষ ছিলো না। নাকি মৃত মানুষই, কিন্তু আমি দেখেছি পঙ্গপাল!

যেতে যেতে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বন্ধু বলতে ছোটোবেলায় এক সঙ্গে পড়তাম। আমাকে দেখে বলে, আরে তোর এ কি অবস্থা!

আমি বলি, আরামেই তো আছো। কোনরকমে অপেক্ষমান তালিকার একেবারে ন্যাজের মাথা হতে বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেয়ে এহন সরকারের ছাত্র সঙগঠনের চামচাগিরি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার হইছো। এখন যে চিটাররা (আসলে চিট)-ই টিচার হচ্ছে সেটা আস্ত দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা তুই যে ওয়েটিঙ থেকে চান্স পেলি, না পেলি কি করতি! ভাগ্য ভালো যে তলানি থেকে হলেও উঠে এসেছিস। নইলে নিঘঘাত মন্দিরের পুরোহিত হতে হতো তোকে। তাও তো পারতি না, তোদের তো আবার কাস্ট-ফাস্ট এর বেপার-সেপার আছে। কি যে হতো তোর! আমার মনে আছে তুই ভর্তি পরিষ্কার ফল বেরোবার পর নিজের রোল নম্বর খুজে পাচ্ছিলি না। আর সে কি দুঃখ তোর! আর ছালে, আর এখন মওকা পেয়ে ফুলে উঠেছিস! আর বুকও ফুলছে আত্মগর্বে! তোর নিজের মধ্যে কি কোন লজ্জাবোধ নেই! দেখি, ও হাসে আমার কথা শুনে। বুঝতে পারি ওর কোন লজ্জা করছে না। লজ্জা না পাওয়ারই কথা। আমরা যুগবোধ হারিয়ে ফেলেছি, লজ্জাবোধের প্রশ্নই ওঠে না।

আমাকে এরপর টানতে টানতে নিয়ে আসা হলো জেলখানার সামনে। সেখানে দেখি স্বয়ং মাননীয় রানি দাড়িয়ে! তার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে —

- এ সব কি কথা বলা হয়েছে?
- ক্ষমা করবেন, কোন কথা হে মান্যবর?
- বুঝতে পারছো না ,কচি খোকা সাজা হচ্ছে বুঝি?
- ক্ষমা করবেন ,হে দেশমাতা ,মানে মানে...
- আমার বাবাকে নিয়ে...
- মানে মহান জাতির পিতাকে নিয়ে হে রাজন্য?
- তবে আর বলছি কি!

তখন আমার আবার মনে হতে থাকে আমি আর কোন এক জনসঙ্গমে দাড়িয়ে ভাসন দিচ্ছি। সামনে অনেক মানুষ। তারা সবাই আমার কথা শুনছে। চারিদিকে নিরবতা। কেউ কোন কথা বলছে না। এক পাশে রানিও দাড়িয়ে আছেন। আমি বলছি —

.....জনগনের মৌলিক অধিকার নিয়ে রাজনিতির যে
ইশতেহার ছিলো তার কিছু কি পালিত হয়েছে ,আপনারা-ই
বলুন। কেন চুপ করে আছেন ?কেন চুপ করে থাকবেন ?আর
কতদিন চুপ করে থাকবেন। গায়ের জোরে ক্ষমতায় টিকে থেকে
এ দেশের স্বার্থবাদি রাজনিতিকেরা আগেও রাষ্ট্রিয় সঙ্কট তৈরি
করেছে ,আজও আমাদের মতামত ,জীবন ও ইচ্ছের কোন মূল্য
দিতে তারা মোটেও ইচ্ছুক নয়.....

অর্থাৎ ভোটের আগে তারা) ভোটের এবণ্ড জনগন (ছিলো। এখন ক্ষমতা পেয়েছি। এখন তারা
অতিত। অনেকটা বার্কলের দর্শনের মত ,আমার সামনে যা আছে ,তা আছে ,আমি যদি এখানে না
থাকি ,তবে সে জিনিসগুলোকে বলতে হবে ,তারা ছিলো - ভোটের আগে জনগন আছে। কিন্তু ভোটের
পরে ,তারা ছিলো। অর্থাৎ রাজনিতিকদের মনে হওয়া ছাড়া জনগনের কোনও অস্তিত্ব নেই। ফলে ,
মনে যদি না হয় যে জনগন আছে ,তবে কার জন্য এত এত কাজ ,আর কি-ই বা হবে সে কাজ করে !
অতএব নিজের আখের গোটাও।

রানি তখন আঙ্গুলের ইশারা করলেন পুলিশদেরকে। এর অর্থ ,পুলিশ ,লে যাও ইস বদমাসকো।
পুলিশ আমাকে টানতে টানতে নিয়ে যায়।
তবে কি সত্য ভাষনের জন্য আমার এই শাস্তি?

৫।

তাই বলে, নিজের মৃত্যুটা এভাবে দেখতে হবে? কিছু মানুষ পিছু নিলো। খুন করবে এমন
কোনও ভাব তাদের মধ্যে লক্ষিত হলো না, তবুও নিলো। এদের বয়েস নিতান্ত কম।
কৈশোরে কেবল পড়েছে, কিন্তু ‘মিশচিভাস’ – ডানপিটে হয়ে গেছে পাল্লায় পড়ে। পাল্লায়
পড়ে গোল্লায় যাওয়া। সন্তাসি হতে বয়েস লাগে নাকি আজ আর? কিন্তু এরা কেন এতো
উদ্ধত হয়ে গেলো? এই বয়েসে তো স্কুলে গিয়ে পড়া না পারলে কান ধরে বেঞ্চের উপরে
দাড়িয়ে থাকার ভয়ে পড়া করে যাওয়া – এমন বয়েস। এই বয়েস তো সন্ধে হলে হাত-
মুখ ধুয়ে বই নিয়ে পড়তে বসার কথা। কিন্তু তা না করে লাঠি-সোটা নিয়ে ওরা আমাকে
ধাওয়া করছে! তাদের একজন পান্ডা আছে। এই পান্ডারও পান্ডা আছে। এটা একটা
শৃঙ্খল।

আমার অপরাধ? আমি যেখানে অবাস্তিত সেখানে প্রবেশ করেছি। অবাস্তিত জায়গাটির নাম
ক্ষুদার্ত পৃথিবী। সেখানে গিয়ে দেখি রাজ্যশাসন চলছে বাগাড়ম্বর নামের দেশপ্রেমের মাপকাঠি
দিয়ে। মেপে মেপে কাঠি অর্থাৎ লাঠি দিয়ে ছেলে বা প্রজাশাসন। চমক বটে! এরপর শুরু
হয় আমার আজন্ম দৌড়। আমি দৌড়তে থাকি কিসের যেনো ভয়ে, সে কি জুজু, নাকি
হুজুগ জানি না, শুধু দৌড়ের কথাটা মনে করতে পারি। পুকুরের পারে চলে আসি আমি,
সেখানে কলাগাছ। ওরা কলা দেখিয়েছে বলেই হয়ত কলাগাছ। সেখানে আমার বেগ অর্থাৎ
থলেটা রাখি। ওই বেগেই বুঝি জীবন, তাই তাকে রাখার এতো প্রয়োজন। কিন্তু বেগের
সঙ্গে জুতোটাও ফেলে চলে আসি আমি। যখন চলে আসি, তখন জুতোর কথা মনে পড়ে।
জুতো উদ্ধারই হয়ে যায় আমার জন্য মুখ্য। অর্থাৎ মনে হয় বেগ নয় জুতোই আমার জীবন।
কাপড়ের তৈরি কম দামি একটা জুতোর জন্য আমার সে কি আবেগ! আমার বউ টুনি আমাকে
অনেক দামি জুতো কিনে দিতে চাইলে আমি কিনিনি। আমার ওই সস্তা জুতো- ই চাই। সেই
থেকে কাপড়ের এই কালো জুতো আমার সঙ্গি। একে উদ্ধার করতেই হবে। জুতোর দিকে

দৌড়তে থাকি আমি। কিন্তু তখনই মনে হলো আমার পায়ের তল থেকে মাটি সরে গেছে। আসলেই তাই। ভূমি দ্বিখন্ডিত হয়ে যাচ্ছে। দেখি, পৃথিবী থেকে একটি টেকটোনিক প্লেট সরে যাচ্ছে, সরে যাচ্ছে আমার জুতোজোড়াও। এখন উপায়, কি হবে আমার জুতোর? আমি লাফ দিয়ে সরে যেতে থাকা টেকটোনিক প্লেটের উপরে গিয়ে পড়ি। কোনওরকমে উদ্ধার করি আমার জুতো।

কিন্তু হায়, জুতোর উদ্ধার হয়েছে, কিন্তু আমাকে উদ্ধার করবে কে এখন? আমি দেখতে পাই, পৃথিবীর ছাদ এবণ্ড দেয়ালেরা নড়তে শুরু করেছে, তারা কাছাকাছি সরে আসছে, সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। আমি ভেতরে, আর সবাই বাইরে। অর্থাৎ সবাই মুক্ত, আমি আটকে গেছি। পৃথিবী নামের ঘরটি দ্রুত সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে, দেয়ালেরা আরও কাছে চলে আসছে, আমার জীবন প্রদীপ টিমটিম করে ভয়ে। কাউকে কাউকে মুক্তির স্বাদ দিতে গিয়ে যে ধাওয়া খেয়েছি আমি, তাতেই আমার নিজের জীবনই আটকে গেছে সহস্র প্রতিবন্ধকতার অপূর্ব কারিশমায়। আমি এখন নিস্পেষিত হবো। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। খুব কাছ থেকে নিজের মৃত্যুকে দেখতে পাই।

ভোর ৪ টা ৫৩ মিনিট, ২৩০৬২০১৬, সিয়ামদেশ।

৭।

বাবা আর ছেলে হেটে যাচ্ছে। গ্রামের পথে ধুলো উড়িয়ে বাবা ও ছেলে হেটে যাচ্ছে। গোখুলির রঙের সঙ্গে মিশে সেই গ্রামের পথের লাল ধুলি উড়িয়ে বাবা ও ছেলে হেটে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে তা কেউ জানে না। কোথায় যাওয়া যায়? কতদূরে যাওয়া যায়? তাও কেউ জানে না। শুধু জানা যায় বাকী পথের রেখাটুকু, তারপর মিলিয়ে যাওয়া। বাবা ও ছেলে তারপর মিলিয়ে যায়। তাদের আর দেখা যায় না। তারপর এলো স্বপ্ন। তখন আবার তাদেরকে দেখতে পাওয়া গেলো। ছেলে বাবাকে প্রশ্ন করছে, বাবা দেখো কত্ত বড়ো বাড়ি হচ্ছে!

বাবা ছেলের দিকে তাকিয়ে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলেন, হুম, বড়ো বাড়ি।

ছোট্ট পায়ে দৌড়ে দৌড়ে বাবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চলতে ছেলে বাবাকে জিজ্ঞেস করে, আমাদের বাড়ি এমন বড়ো না কেন ও বাবা? আমরা কেন কুড়ে ঘরে থাকি? বলো না বাবা?

বাবা বলেন, হয়ত নিজেকেই বলেন, কুড়েঘর ও অটালিকার পার্থক্য গড়ে দেয়া নিয়ামকের নাম হলো অর্থ। অর্থ না হলে বড়ো পাকা বাড়ি করা যায় না, এমন কি অর্থ ছাড়া কিছুই করা যায় না পৃথিবীতে।

কিন্তু বাবা কেমন করে এই কথা তার ছেলেকে বলবেন যে, তাদের অর্থ নেই, তারা বলতে গেলে দুটো খেয়ে- পরে বাচার জন্যই বেচে থাকতেই শুধু পারে! যদি মনে কস্টো আসে তার! ছেলেকে কস্টো দেবেন না বলেই বাবা বললেন, এখনও বিবেকটা পুরোপুরি মরে যায়নি তোমার বাবার, তাই আমরা কুড়েঘরে থাকি, বুঝেছো?

ছেলে কি বোঝে এই কথায় তা জানি না, সে বলে, কিন্তু তুমিও তো চাকুরি করো! এই বাড়িটা যার সেও তো চাকুরি করে! তাহলে আমাদের কুড়েঘর কেন?

বাবা আনমনেই বলেন, জীবিকা অর্জনের একটু উপায় হিসেবে চাকুরি কিম্বা অন্য কোনও শ্রম; কিন্তু উচ্চতলার অটালিকার জন্য চাকুরির নামে উতকোচ। জীবিকা গ্রহণ করো বাচতে, কিন্তু অন্যপথটা জীবনকে সাজাবার জন্য। কিন্তু একটা গড়তে গেলে অন্যটা খসে পড়ে বলে আমি আমাকে হয়ত ভেঙে ফেলিনি পুরোপুরি। আমি সঠিক এ কথা আমার জ্ঞাতসারে দাবি

করার মত সত আমি নই, কিন্তু কোনওরকমে খেয়ে-পরে টিকে আছি – এটাও কি অনেক বড়ো সার্থকতা নয়! সাজাবার জন্য যা কিছু দরকার তা যদি চাও তুমি, তবে এই চাকুরি থেকে ইচ্ছে করলেই তুমি তা পাবে, কিন্তু তোমার ভেতরে রয়েছে আরও বড়ো ও মহান একটা অট্টালিকা, সেটাকে তখন ভেঙে ফেলতে হবে কিন্তু! যদি তুমি তাকে ভেঙে ফেলো, তবে এই অট্টালিকা তুমি পেতে পারো। ছেলের দিকে এবার তিনি তাকিয়ে বলেন, তুমি যখন বড়ো হবে তখন বুঝবে, তোমার আসলে কোনটা চাই – এই ইট-কাঠ-পাথরের অট্টালিকা, না তোমার অন্তরের ভেতরের সেই মহান সত্তা।

তারপর তাদের কথা আর শুনতে পাইনি। স্বপ্নের দেয়াল ভেদ করে তখন তারা হাটতে হাটতে দিগন্তে মিলিয়ে গিয়েছে।

ভোর ৫ টা ১৯ মিনিট, ২৪০৬২০১৬, থাইল্যান্ড

ডগলফ

(২/১০/২০১৫, রাত ৩ টা ১ মিনিট)

নতুন একটা খেলা আবিষ্কার করেছি আমি। অবশ্য স্বপ্নে। খেলাটা বুদ্ধিমানের খেলা কি না, তা আমি আজও আবিষ্কার করতে পারিনি, কিন্তু অভিজাত সমাজের যারা মান্যবর, আরও পরিস্কার করে বললে মাতবর, তারা সাধারণত এটিকে খেলে থাকেন। ফলে আমার মত আম'র পক্ষে বাস্তবে এটিকে খেলা সম্ভব নয়। ফলে স্বপ্নের আগমন। খেলাটি একেবারে নতুন আবিষ্কৃত, এ কথা বললে সর্বৈব মিথ্যে বলা হবে, বরঙ বলা উচিত একটা খেলার সঙ্কল্পন করেছি। খেলাটার নাম গলফ। সেদিন পর্বত দেখতে সাধ হয়েছিলো বলে যে স্বপ্নটা শুরু হয়েছিলো, তাতে শেষ অবধি পর্বত দেখা আমার হয়নি, কারন রেলগাড়ি আমাকে ফেলে চলে গিয়েছিলো, অথবা আমি রেলগাড়ি আসার হুইসেল শুনতে পাইনি। স্বপ্নে শব্দ শোনা যায় কিনা, আবার শব্দবহুল স্বপ্ন দেখলে আমি বলতে পারবো। ব্যর্থ মনে প্লাটফর্ম থেকে নেমে হাটতে থাকি আমি। মনে হয় বনের মধ্য দিয়ে হাটছি। দূরের পর্বত ঘন বনে আবৃত। তার ছোয়া এখানে লেগে আছে সবখানে। ফলে বনের আবির্ভাব অযৌক্তিক নয়।

যা অযৌক্তিক তা হলো দেশে ঘন বনের উপস্থিতি। অর্থাৎ স্বপ্নটা যে দেশে দেখা কোনও এলাকার প্রেক্ষাপট না সেটা নিশ্চিত। অর্থাৎ বৈদেশ্য। কোন দেশ সেটা জানা নেই, জানার প্রয়োজনও নেই। দেশে বনদেবতাদের কৃপায় বন উজাড় হয়ে গেছে। শয়তান যদি দেবতার ভূমিকায় অভিনয় করে তবে সে মঞ্চ নাটক দেখে আমরা বিস্মিত হই, হতে হয়, নাটকের দুঃখের 'সিন' দেখে আমরা যেমন কাদি, যদিও জানি যে ওটা সর্বৈব মিথ্যে। আমাদের সোনার দেশে বনদেবতা শুধু নয়, আরও হরেক রকমের দেবতাদের কৃপায় দেশ উজাড়, বন তো সাধারণ একটা অংশ মাত্র। সে যা হোক, স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে দুঃস্বপ্নের দিকে যাত্রা হয়ে যাচ্ছে। ফেরা যাক।

যে বিষয়টা আশ্চর্যের তা হলো স্টেশনের প্লাটফর্মে হাটতে গিয়ে আমি দাড়িয়ে পড়ি। আমার সামনে ছোট্ট একটি বল এসে পড়ে। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম বুনো ফল হয় তো হবে। পাশে বন, তাতে হরেক রকমের পাখি ডাকে, আর হরেক রকমের ফল খায়। তারই হয়ত একটা এসে পড়েছে এখানে। কিন্তু না। ভুল হয় আমার, দেখি ছোট্ট সাদা রঙের একটি বল। দেখেই আমি বুঝে যাই এটি গলফ খেলার বল। বলটি আমি ধরবো ধরবো করছি এমন সময় কেডি আমার সামনে দৌড়ে হাজির। কেডি হচ্ছেন যিনি গলফ খেলোয়াড়ের খেলার নড়ি অর্থাৎ 'ক্লাব' ভরতি বেগ বহন করেন।

কেডি আমারে তরতর করে বলেন, ধইরেন না, ধইরেন না ভাই, খেলা চলতেছে!
কেডির দিকে তাকি দেখি, আরে, এ দেখি সিদ্দিক! আমি বলি, সিদ্দিক ভাই, এখনও কেডি যে! তা কি করে হয়!

তিনি আমাকে বলেন, তুমি অতিতে আছো। তুমি যে সিদ্দিককে চেনো সে ভবিষ্যত। ওই দেখো কে আসে?

আমি তাকিয়ে দেখি প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ ওরফে হুমু এরশাদ এসেছেন সাদা পোশাক পরে। অর্থাৎ গলফ খেলছেন।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি আমার দিকে তাকিয়েও দেখলেন না। অলরেডি ‘বগি’-তে আছেন তিনি, সেজন্য হয়ত মেজাজ খারাপ হয়ে আছে তার। জানি না ডাবল, ট্রিপল বগি করলে মেজাজের তার কি অবস্থা হবে? হয়ত সে মেজাজেই আর একটা বিয়ে করে ফেলবেন!

সিদ্দিক ভাই রাষ্ট্রপতির পেছন পেছন চলতে থাকেন। কাধে তার মস্ত বড়ো বেগ। এখনও, অর্থাৎ স্বপ্নের আমলে সিদ্দিক ভাইয়ের উপরে চন্দ্রবিন্দু লাগানোর সময় আসেনি।

এরশাদের আমলে আমার জন্ম হয়। কিন্তু এখন আমাকে এতো বড়ো দেখাচ্ছে কেন?

সিদ্দিক ভাই বললেন, আমি অতিতে আছি, অথচ তোমার বয়স বেড়ে তো মনে হচ্ছে মিলেনিয়ামের পরের দিকে আছো!

অর্থহীন। সব কিছু গোলমেলে মনে হয় আমার কাছে।

কিন্তু ততক্ষণে চাচা, অর্থাৎ এরশাদ সাহেব খেলতে খেলতে মেলা দুরে চলে গেছেন। তার স্কোর আমি জানতে পারিনি। তবে ঋনাত্মক স্কোর যে হবে না, সে বেপারে আমি নিশ্চিত। গলফ পৃথিবিতে একমাত্র খেলা আর স্কোর যত বেশি নেগেটিভ, বোঝা যাবে তিনি তত বেশি পয়েন্ট অর্জন করেছেন। ‘একমাত্র’ বললাম এই জন্য যে, আমার আর অন্য কোনও খেলার নাম জানা নেই যার পয়েন্ট ‘না’ বোধক হয়। নতুন যে নিয়ম আমি প্রবর্তন করেছি এই খেলার, তার বর্ণনা এখন দেবো।

অনেক নিয়মের মধ্যে আজ যে নিয়মের বর্ণনা থাকবে তা হলো, ‘পাটিঙ গ্রিন’-এর যেখানে পতাকা আর গর্ত অর্থাৎ ‘হোল’ থাকে, তার প্রায় কাছাকাছি মাটিতে পোতা খুটির সঙ্গে শেকল দিয়ে বাধা থাকবে একটা শেফার্ড কুকুর। শেকলের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করবে শেফার্ডটি কত পরিধির বৃত্ত রচনা করে রাজত্ব বিস্তার করতে পারবে। অবশ্য যে সব খেলোয়াড়ের হার্ট খুব দুর্বল, তারা জানেন শেফার্ড যখন চেচায় তখন রাজ্যের বিস্তৃতি বৃত্ত ছেড়ে কতগুন বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশের সাম্রাজ্যে নাকি সূর্যের অস্ত হতো না। শেফার্ডের চিতকার গলফ কোর্সকে ছাড়িয়ে যায় কিনা সেটা মেপে দেখতে হবে। দুর্বল চিত্তের অধিকারি খেলোয়াড়দের এ খেলায় না আসা উচিত। সঙ্গে অবশ্য হুতপিন্ড বিশেষজ্ঞ থাকলে অন্য কথা। এখন প্রশ্ন হলো বল ‘হোল’-এ ফেলবেন কেমন করে একজন খেলোয়াড়? শেফার্ডের কামড়ের ভয় আছে, আছে গগনভাঙা চিতকারের চিত্তহারা উপায়? তাহলে উপায়? নতুন সঙ্কল্পের এ খেলায় কেডি হিসেবে থাকবে শ্লেজটানা কুকুর। শুধু শ্লেজ গাড়ির নিচে ছোটো ছোটো চাকা লাগানো থাকবে। এরা ‘পাটিঙ গ্রিন’-এ রাখা শেফার্ডের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। সত্যি যুদ্ধ না। চেচামেচির যুদ্ধ। এ বিষয়ে এদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। শেফার্ড - শ্লেজ কুকুর যুদ্ধের ফাকে খেলোয়াড় ‘পাটার ক্লাব’ ব্যবহার করবেন। তবে শেফার্ড যদি অতিশয় বুদ্ধিমান হয়ে থাকে, তার জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ি থাকবে না। স্বপ্নে পাওয়া এই খেলার নাম দিয়েছি ডগলফ। যারা হাসজারুর মাঙস খেয়েছেন তারা এই খেলা দেখতে আসবেন।

আমার এই নিয়মে যদি মিলেনিয়ামের আগে থেকেই খেলা হতো, তবে বাংলাদেশ একটা জিনিস খুবই মিস করতো। সিদ্দিক ভায়ের অর্থাৎ গলফার সিদ্দিকুর রহমানের জন্ম হতো না।

স্বপ্ন যে স্বপ্নই এটা বোঝা গেলো।

(২/ ৩/ ২০১৬, রাত ২ টা ৩৭ মিনিট)

ঘাস কাটতে যাচ্ছি, না বলে ছাটতে যাচ্ছি বললে অধিকতর উপযুক্ত বলে বোধ হয়। চুল কাটার বেলায়ও প্রায় তাই। অবশ্য যে একেবারে নেড়ে হবার নিয়ত করেছে তার ক্ষেত্রে কোন শব্দ প্রযোজ্য তা জানিনা। ঘাস ছাটাইয়ে ঘাসের প্রান বেচে যায়, সঙ্গে যে কাটতে যায় তার নিজের প্রানও বাচে। কারন ঘাসের প্রয়োজন রয়েছে ঘাসওয়ালার গোয়ালের অভুক্ত প্রানিটির। এই প্রানিরা সঙসার বাচায়। বিষয়টা শেকলের মত - ঘাস বাচায় প্রানিকে, প্রানি ঘাসওয়ালাকে, ঘাসওয়ালা আবার ঘাস কাটে। কর্মি ছাটাই শব্দটা আমার কাছে উপযুক্ত মনে হয় না। বরঙ অতি সৌজন্যে আসল উদ্দেশ্য আড়াল হয়ে যাওয়া এই শব্দজোটকে বরঙ মরনমারনবিহারি বোধ করি, আর পেল্লাই মেজাজ পাল্লা দিয়ে তখন গরম হতে শুরু করে। কর্মি *কাটাই* হলে বরঙ বিষয়ের অর্থের প্রতি একটা সুবিচার করা হয়। কিন্তু এখন যেমন শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে নির্বিচারে সাধারণ মানুষ হত্যা চলে নির্বিকার, কর্মি ছাটাইয়ের বেলায়ও তাই। তাতে কর্মির শুধু নয়, তার পুরো পরিবারের গলা, অর্থাৎ জিবন কাটে। কেমন কাটে জিবন? ভাষান্তর ঘটে না, ভাবান্তর ঘটে না সামাজিক বিধাতাদের, ঘটে শুধু অগুনতি মানুষের ক্ষুধা ও মৃত্যু; এক মৃত্যুপুরির মধ্যে জিবন কাটে আমাদের। তা সেদিন এমন এক মৃত্যুপুরির মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। ডগলফ খেলবো, এমন এক নিয়ত। কারন মনে করতে পারছি যে শ্লেজ গাড়ি রাখা ছিলো। কুকুরের হাকও শুনতে পাওয়া গিয়েছিলো। হাতে ক্লাব। ফলে এ যে ডগলফ-এর প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু মানুষ ভাবে এক আর হয়ে যায় আর এক, রুমালের বেড়াল হয়ে যাওয়ার মত। কারন উপর থেকে যিনি কাঠিটা নাড়েন, তিনি আর যা-ই করুন, অবিবেচনার কাজ তিনি কিছুতেই করবেন না, এ বিশ্বাস আমার আছে। ফলে ঘটনা অন্যরকম হয়ে গেলো। আমার আঘাতে বল গিয়ে পড়লো পুকুরে। ডগলফ - খেলার ওইখানেই ইতি। না না, বিরতি, যতি কোনওটা-ই না-শুধু ইতি। অর্থাৎ খাতম! কিন্তু ইতিউতি করে এতেই যে আমার মতিভ্রম হয়ে যাবে, তা কে জানতো! জলে বল পড়লে তখন আমার মাথায় একটা দারুন চিন্তা আসে। জলে পোলোও খেলা হয়, জলকেলিও হয়, গলফ খেলতে পারলে সমস্যা কি? অতএব, গলফ -এর নতুন সঙস্করনের পরবর্তি অঙশটা জলের সঙ্গে সম্পর্ক বলে এর নাম জগলফ। জগে জল নিয়ে দৌড়তে থাকবে কেডি। সেই সঙ্গে ভো দৌড় দেবে শ্লেজ কুকুরেরাও। দৌড়তে থাকবে ভয়ে খেলোয়াড়ের আত্মারাম খাচাছাড়া যাতে না হয় সে জন্য হতপিন্ডের ডাক্তার। পুকুরে পড়ে যাওয়া বলটিকে উদ্ধার করতে আসবে দমকল বাহিনি। কাহিনি এখানেই শেষ নয়। অর্থাৎ তখন মনে হবে এটা আর গলফ খেলা নয়, পুরো একটি সিনেমার গলফো! হে স্বপ্ন, তুমি আমাকে উদ্ধার করেছো যে তুমি বাস্তব নও।

কচুরিপানা

(রাত ১২ টা ৫৩ মিনিট, ১১০৩২০১৬, পাথালুঙ, থাইল্যান্ড)

স্থান ডাউন-আপ বিশ্ববিদ্যালয়। আসলে ‘ডাউনমোস্ট’ কিন্তু ভাবেসাবে পুরোপুরি ‘আপ’, এবঙ এই ভাব নিয়েই স্বপ্ন, শো-আপ, এবঙ সবকিছু বলেই এরম একটা নাম। এর আগে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম এমনকি ইয়ান-নৈঋত নিয়েও বিস্তর খেলা হয়ে গেছে। অর্থাৎ সব দিক নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ হয়ে গেছে বলে এ নাম রচনা করা হয়েছে এটা ভাবার কোনও কারন নেই।

এটা এখন দেশের সবচেয়ে ভালো বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে পড়লে জীবনে আসল শিক্ষা না আসুক, প্রেসটিজ জুটে তামাম! লাখ তিরিশেক টাকা খরচ হয় এই প্রেসটিজ কিনতে। মানুষেরও সয়ে গেছে, পয়সার মহত্ব মেনে নিয়েছে। এই মহত্ব নিয়ে তড়াপাচ্ছিলো একজন। তার সঙ্গে কারও কথা হচ্ছে।

- পড়ো কোথায়?
- ইয়ো! ডাউনসাপে স্টাডি কড়ি, ইয়ো!
- এটা আবার কোন সাপ? অজগর, না কোবরা?
- এঠাকে ইয়উ মিন, ইয়ো! কোবরা বলতে পারেন! ইয়ো।
- অর্থাৎ ফোসফাস?
- ইয়ো!
- সাক্সাস! তা এবার তুমি আমাকে বলো তুমি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়।
- ওঠা অ্যাকচুউলি নো ডাউনসাপ, আই গো ডাউন –আপ...
- তুমি যে ডাউনে ‘গো’ করেছো এটা বুঝতে পেড়েছি বাপ!

২।

(৩০/১১/২০১৫) ঢেকি সগগে গেলেও নাকি ধান ভানে। সে অবশ্য স্বর্গে না গিয়ে বোঝার উপায় নেই। যাযাবর এই কথাটি বলে গেছেন। তিনি বুঝে গুনেই বলেছেন। তবে শাহরিয়ার কবির না বুঝে কি না, আল্লায় মালুম, নরকেও শিবের গিত গাইতে পারেন। তার জন্য অবশ্য নরকে যাওয়ার দরকার নেই। আপাতত এই দুস্টুমতি, সুবিধাবাদি, কু-বুদ্ধিজীবির দায়েরকৃত একটি মামলা প্রসঙ্গে কথা বলবো। খান এ সবুরের বিপক্ষে করা মামলা। এই অ-কাজের কাজির কিছু দাবি আছে -

- খান এ সবুরের কির্তি (যদি কিছু থাকে) মুছে ফেলা হোক। স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তিও।
- সঙসদ ভবন চত্তর থেকে সবুর সাবের কবর তুলে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেয়া হোক।
- খুলনার কাস্টমঘাট থেকে শুরু হওয়া যশোর রোড নিউ মার্কেটের অদূরে জোড়াগেট থেকে ডান দিকে খালিশপুরের মধ্যে চলে গেছে। জোড়াগেট থেকে বামে রেডিও সেন্টারের সামনে দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তাটিই এখন হিট। অর্থাৎ মেইন রোড, কিন্তু যশোর রোড নয়। পুরাতন যশোর রোড এখন ‘বে-লাইন’। নতুন এই রাস্তাটির সঙ্গে সম্ভবত ‘নতুন রাস্তা’ এর কাছে গিয়ে আবার খালিসপুরের মধ্য দিয়ে আসা পুরাতন যশোর রোডের মিলন ঘটে। তখন আবার খুলনা-যশোর বা যশোর-খুলনা রোড নাম নিয়ে চলতে থাকে। এই রাস্তার নামও মুখে ফেলা হোক।

হুম, একজন রাজাকারের নাম-নিশানা মুছে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। কথাটা বলছে কে? কে এই শাহরিয়ার কবির?

কির্তি মুছে ফেলা যায় না। খুলনার পাটকলগুলো নস্টো রাজনিতিতে তুলে দেয়া, কিম্বা নস্টো করে ফেলা গেছে অনেক কায়দায়, কিন্তু পাটকলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অজস্র মানুষের জীবন। কির্তি মুছে ফেলা মানে কি এগুলো ধুঁস করে ফেলা? উহ! কনফিউজড।

৩।

(৯/১/২০১৬, সকাল ১১ টা ১৩ মিনিট) কিছু বখে যাওয়া তরুণেরা একটা মঞ্চ বানিয়েছে। বখে যাওয়া এই অর্থে যে, তারা ধরাকে সরা ভাবছে। আসলে কারা সে মঞ্চ বানিয়েছে আমার কাছে তা স্পষ্ট নয়। আমি এই মঞ্চের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। কিন্তু ফিরতে পেরেছি। কারন আমি আমাকে ধোকা দিতে চাই নি। আমি বুঝি যে কোন আবদারটা ভালো কিম্বা মন্দ। শুরু থেকেই এরা বিভিন্ন মামা বাড়ির আবদার করে দেশকে একটা অস্বস্তির মুখে ফেলেছে।

এখন পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা নিয়ে মন্ত এক আবদার তুলছে তারা।

পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন বলতে আমি কি বুঝি সেটা আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি। আমি দীর্ঘ আলোচনা করতে পারিনা, সে জ্ঞান আমার নেই, ফলে অল্প কথা বলব। আমি মনের কথা বলতে আজীবন দিধাহিন।

গতকাল তিন পাকিস্তানি যুবকের সঙ্গে পরিচয় হলো জুম্মার মসজিদে। নামাজের পরে তাদের সঙ্গে কথা হলো। কথা প্রসঙ্গে সাতচল্লিশ এলো। আমার সবচেয়ে আগ্রহের জায়গা এটা। সবচেয়ে কষ্টেরও। আমি আবারও বলছি, মনের কথা প্রকাশ করতে আমি দিধাহিন।

সাতচল্লিশ নিয়ে আমার মনোভাব জানার পরে অনেকেই আমাকে নিয়ে বিভিন্নভাবে মন্তব্য করেছে। কিন্তু আমি আসলে কার, আমি নিজেও কি তা জানি?

আমি কোনকালে মওদুদির একখানা বই পড়েছিলাম, আর এক সময় কসে বাম রাজনীতি করে পরে কুলক্ষ-সু/নে জামাতকে সমর্থন করা একজন আজন্ম ভালো মানুষের সঙ্গ নিয়েছিলাম, তাতে আমি রাজাকার হয়ে গেলাম। আমি 'নির্বাচিত কলাম' - এ তসলিম হয়ে হিফজ করেছিলাম, কিন্তু তবুও আমি রাজাকার। আমার ঘরে মার্শ, এঙ্গেলসএর- বইয়ে ঠাসা, রুশদি-ক্যাম্পবেলও তালওয়াত করি মইন্দে সইন্দে তবুও আমি মৌলবাদি, কারন আমার ঘরে পবিত্র কুরআন আছে। হুমায়ুন আজাদ স্যার বলে গিয়েছেন, একজন রাজাকার চিরকাল রাজাকার, কিন্তু একজন মুক্তিযোদ্ধা ব্লা ব্লা ব্লা। বখে যাওয়া এই পন্ডিতির 'বাক্যতত্ত্ব'টা অবশ্য আমার খুব প্রিয় বই। আমার 'আমি' টা এখন শাখের করাতির মধ্যে পড়ে গেছে। আমি এখন কার? আমি আসলে কার? আমি ডানে না বামে – আসহাবুল মায়মানা, না আসহাবুল মাশয়ামা? আমি তো 'লর্ড অব দ্য রিঙস' উপন্যাসের Col um হয়ে গেলাম জে ঘন ঘন এই কথা আওড়াতে Master is good, master is bad! ওরে, আমি কি হনু রে, আমি থিসিস না এন্টি-থিসিস? এদিকে হলো কি, উজবুকদের ময়লামাখা অন্তরের

মধ্যে যে ফেস আছে, এর কেতাবি ইসম ফেসবুক, সেখানে শত সহস্র লাইক দিয়ে বলা হলো জাকির নায়েক নামে লোকটা সন্ত্রাসি। নায়েকের নায়কত্ব এতে ঘুচে গেলো, নায়েক এখন নায়কও নয় নায়েকও নয়, নায়েক এখন নালায়েক, নায়েক এখন ভিলেন।

কিন্তু কোনওদিন কোনও অসভ্য, বর্বর, হীন, চোর, বদমাশ, হারামজাদা ভালোমানুষেরা বললো না যে, টিভিতে যে সিরিয়ালেরা সিরিয়ালি আমাদের মনন, রুচি, চরিত্র, চেতনা, দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিনিয়ত 'কিল' করে চলেছে, আসুন তাদের একটা সদগতি করি। নায়ক যদি তলে তলে অন্ধকারে টেনে নিয়েই থাকে, তবে তার বিচার হওয়া উচিত, কিন্তু রাগমোচনের উলঙ্গপনাকে উসকে দেয়া দুর্গন্ধযুক্ত থুথুরও যোগ্য নয় এমন চ্যানেলগুলোর জন্য কি বিধান? এক্ষেত্রে অরিন্দম কহিলেন, আমার সুনাম বাঙলা আমি তুমায় ভালোবাসি। বাহ রে বেটা বাহ!

ফলে আমার বিষয়ে আমি যদি কনফিউজড হই, তবে তাদের কাছেও আমি স্পস্ট না হলে এ দায় আমারই। তাদের কাছে আসলে অবশ্য কোনওকিছুই স্পস্ট নয়। না তাদের নিজেদের জীবন, না তাদের কাছে দেশ। দেশ তাদের কাছে সুবিধা আদায় করে নেয়ার জন্য একটি উপায় মাত্র। একটা ছবি দেখাই -



এটা মঞ্চের অকুস্থল শাহবাগের চিত্র। আমি প্রথম দিককার পাপি। লেগে থাকলে মাঝে মধ্যে টেলিভিশনের কেমেরায় অনেক পাপির মত আমাকেও দেখা যেতো সে বিষয়টা অনেকটা নিশ্চিত করে বলা যায়। যার-তার কত রঙের চেহারা-ই তো দেখি আজকাল।

সে যা হোক। সাতচল্লিশ এর প্রসঙ্গ এলে পাকিস্তানি তরুন বলছে -

এই হলো পাকিস্তান, মধ্যে বিশাল ভারত, তার পরে বাঙলাদেশ।

আমি বললাম, হুম এটা সাতচল্লিশ ও একাত্তরের পরের ঘটনা।

সে ইতিহাসটা জানে। বলে, হ্যাঁ, সাতচল্লিশ এর আগে তো সব এক। একটা কন্টিনেন্ট।

আমি জানি সে ইচ্ছে করে ভুল বলেনি। তবুও শুধরে দেই, বলি, সাব-কন্টিনেন্ট। তামাম দুনিয়ায় একটাই সাব- কন্টিনেন্ট।

তারপর সে বলে, থাউস্যান্ডস অফ কিলোমিটারস ফ্রম পাকিস্তান। আ লিটারেল কান্ট্রি, ওহ, বাট, ইটস রিয়েলি ইম্পসিবল, ইটস রিয়েলি ইম্পসিবল। পার্টিশন তিন দেশ দে সাকতে, লেকিন অর কুচ নেহি দিয়া।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমি এই তরুণদেরকে কেমন চোখে দেখবো? তাদের কি ঘৃণা করবো? এ'রম শত সহস্র পাকিস্তানি রয়েছে যারা মনে করে, বাংলাদেশ হওয়াটা অবশ্যম্ভাবি ছিলো, ভৌগলিকভাবে হলেও এক পাকিস্তান হওয়া কখনই সম্ভব নয়, বাংলাদেশ বড়োজোর একটা কলোনি হয়ে থাকতে পারতো – আমি তাদেরকে কি করবো? সম্পর্কচ্ছেদ করবো? কিন্তু কেন?

আমি উস্তাদ গুলাম আলি, মেহেদি হাসানের গান শুনে শুনে বড়ো হয়েছি, তাদের গান গাওয়া হলো আমার কাছে প্রতিদিনের সকালের নাস্তা খাওয়ার মত, আমি এদের কি করবো? এদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করব অর্থাৎ গান গাওয়া বন্ধ করে দেবো?

হ্যা, দেশের জন্য যদি প্রয়োজন হয় তবে আমি তাও হয়ত করতে পারবো, কিন্তু আমি কোনওদিনও বাংলাদেশের পতাকাকে মাটিতে বিছিয়ে তাতে আসন পাতে পারবো না। আমি কোনওদিনও আমার শত্রুর মৃত্যুতে উল্লাস করতে পারবো না, শত্রুর মৃত্যুতে আমি মিস্তি বিতরন করতে পারবো না।

একাত্তরের রাজাকার, ধরে ধরে জবাই কর- এই শ্লোগান তারা দিয়েছিলো। জবাই করতে সাহসে কুলায়নি সত্য, কিন্তু এতেই মনের মধ্যে থাকা সত্যটা বেরিয়ে এসেছে তাদের। আমি নিজে খুব দৃঢ়ভাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই। একাত্তরে আমার মুক্তিযোদ্ধা বাবাকে খুজতে এসে না পেয়ে আমার দাদিকে রাজাকার চড় মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছে, আমার চাচাকে বুটের লাথিতে দরজার চৌকাঠ থেকে উঠানে নিক্ষেপ করেছে, আমাদের বাড়ি লুট হয়েছে। আমার আব্বার খোজ তবুও আমার দাদি কিম্বা চাচা বলেননি। রাজাকার আমার বাবার বুকে টুটুফোর রাইফেল দিয়ে গুলি করে দিয়েছে (আনলোড ছিলো বলে রক্ষা), আমি সেইসব রাজাকারকে নিশ্চয় ভালোবাসিনা, নিশ্চিতভাবে ঘৃণা করি। কিন্তু তাদের মৃত্যু হয়ে গেলে আমি সে মৃত্যুতে উল্লাস করতে পারবো না।

উল্লাসে করি মঞ্চ,
আসলেই সে প্রপঞ্চ।

নাহ! কিছুতেই পারবো না। কারন আমি মানুষ।

একাত্তরের প্রেক্ষাপট আমরা কেউই দেখিনি। ঠিক সে সময়ের আবেগ দিয়ে এখন পৃথিবিকে বিচার করা বোকামি। নতুন একাত্তরের ধূয়ো তোলা তরুণেরা কাপুরুষ। এদের যুদ্ধ করার সাহস নেই। সম্মুখে মৃত্যুর বুলেটের সামনে থেকে নেঙটি খাড়া করে পালাবে এরা। সম্মুখ সময়ের জন্য আদর্শের প্রয়োজন হয়। আজ কোথায় সেই আদর্শ?

৪।

(১৭/১/২০১৬, রাত ১ টা ২৩ মিনিট)

■ কি ভাবছো?

- ভাবছি স্বপ্নটা না দেখলেও পারতাম।
- কি স্বপ্ন আবার?
- দেখলুম, ভদ্র লোকেরা টয়লেটে পানি না রেখে শুকনো খড়খড়ে টিসু পেপার রাখেন। পাশে একটা মুখ খোলা বা বন্ধ যা হোক একটা বাকশো থাকে – ব্যবহৃত টিসু পেপারের জায়গা হবার জন্য। ভদ্রতার নমুনা বটে! আর দেখলাম যে অভদ্রেরা টিসু ও জল ব্যবহার করে।
- ওটা স্বপ্ন নয়, সত্যি দেখেছো। তোমার স্বপ্নের বেরাম হয়েছে।
- সত্যি দেখেছি বলছো?
- হুম, বলছিই তো!
- তাহলে তো আমি বেশি করে অভদ্র হতে চাই ভাই!

৫।

(২১/০২/২০১৬, রাত ১১ টা ২৭ মিনিট, এনার্জি রিসার্চ ল্যাবরেটরি, পাথালুঙ, থাইল্যান্ড)

সোনার রতি মাপতে গেলে সোনা মিয়ার ভিরমি খেতে হলো। মুর্ছাও খেয়ে গেলো। এই ফাকে সেকরা রতিক্রিয়ায় কিছু ভেজাল মিশিয়ে দিলো। জেগে গিয়ে সোনা মিয়া আমাকে প্রশ্ন করলো, যা জন্মাবে তা কি বাঙলা ভাষা না রেডিও জকি?

আমি তখন তাকে বলি, আজ মনে পড়ে গেলো চৌধুরি সাব ও রবি ঠাকুরের রসায়নের নিষেধবানি – ও লো তুই যাস না মিয়া, তুই ভো হয়ে যাবি, নাই হয়ে যাবি। শুধু সোনাটা পুড়ে পুড়ে লাল হয়ে যাবে।

সোনা মিয়া অতি দুঃখে মন খারাপ করে বলে, আমি শুনি নি সে কথা। গিয়েছি। এখন দেখছি কথা খাটি!

তাকে বলি, তা বাঙলা ভাষা নিয়ে কি যেনো বলছিলে তুমি?

- আসলে ভাবছিলাম। বলার মত সাহস তো নেই, তাই ভাবি।
- তা যা ভাবলে সেটাকে এখন একটু উগরে দাও, কেউ নেই।
- ভাবছিলাম যে, বাঙলা ব্যঞ্জনবর্ণ এবঙ আঙরেজি অ্যালফাবেটে এক জায়গায় দারুন মিল।
- কোন জায়গায় এত মিল পেয়ে গেলে?
- কেন বাঙলা ‘চ’ আর ইঙরেজি ‘এফ’ এর ক্ষেত্রে!
- ম ম ম ম , মিল, কিন্তু কেমন?
- গুনে দেখো, এরা দু জনের পজিশন একই।
- হুম, তাই তো - ষষ্ঠ। কিন্তু ঘটনা কি?
- ভাবছি, শুধু ‘চ’ নয়, দাদাগিরি, আর লজ্জাহিন, বিবেকহিন এফএম-এর মত কুত্তাগিরি, শুয়োরগিরিতে পুরো বাঙলা বর্ণমালা-ই আজ ফাকড!

৬।

(৫/৩/২০১৬)

আমার লিখে ভাত করার ইচ্ছে নেই। অবশ্য যা লিখি, আর যেমন করে লিখি তাতে ভাত হবারও উপায় নেই। নইলে কি করতাম জানি না। তবে এমনও ভাবছি যে, এমন কি লিখে নাম করার ইচ্ছেও নেই। ফলে বুঝতেই পারছেন আমার কেয়ার টেয়ার একটু কম করি। যাদের নাম ও ভাতের দরকার তাদের অন্যকে তোয়াজ করে লিখতে হয়। সামনে যাদের দেখতে পাচ্ছি অনেকে সেই পথে চলেন। অর্থাৎ দলন মর্দনকেই জীবনের মক্কা বানিয়ে ফেলেছেন। এটাকে অযাচিত আসঙ্গলিপ্সার চেয়ে নস্টো, খারাপ ও হিন মনে হয় আমার কাছে।

- আচ্ছা আমাকে কে ডেকে এনেছেন একটু বলবেন? এর তো কোনও দরকার ছিলো না! আমি বহুবীর বহুজনের কাছে লেখা পাঠিয়েছি, সে মৌলিক লেখা হোক, কবিতা অনুবাদ হোক, কিম্বা অন্য কিছু। ছাপেনি কেউ। কোনও শালাই ছাপেনি। আমাকে চিনেনা তো ছাপবে কেন?

এই হয়েছে আর এক পদ্ধতি। মুখ না চিনলে ছাপানো মুশকিল আছে। মুখ চেনা, ছেপে দাও, পড়ার দরকার কি! তবে ভাবে কিন্তু ষোলো আনা! অর্থাৎ বিরাট পন্ডিত! পড়েনা এক ফোটাও। পড়ার সময় কোথায়, তেল মাজতে মাজতেই তো বেলা যায়! ফলে আমার মতন আম লেখকের লেখার গুস্তি ঠেঙিয়ে এখন আমাকে ডেকে আনার কোনও অর্থ দেখতে পাই না।

- আপনারা অন্য কোথাও দেখুন। আমার এখানে আসার এক কদমও রুচি নেই, ইচ্ছে নেই, নিয়ত নেই। আমি অতি শ্রদ্ধাভরে এই পুরস্কারটা ব্লাডি প্রত্যাখ্যান করলাম। পুরস্কার তাদের দিন, যাদের এটা দরকার।

এভাবে বলে গদগদ করে হেটে বেরিয়ে আসলো আমার বন্ধু। লেখক হিসেবে সে তুখোড়, এ কথা অনেকে বলবে না। হয়ত অধিকাংশই বলবে না। এর কারন সে তার বক্তব্যেই বলেছে। তাকে কেউ চেনেনা। আজকাল চেনা লেখকদের বই কিনতেই লোকে বাজারে যায়। খুজে খুজে ভালো বই কেনার সময় আজ আর কারও হাতে নেই। ফলে বন্ধুর বইও আজ আর কারও হাতে পৌঁছে না তেমন। পাঠক তাকে কি করে পড়বে? পড়লে তখন হয়ত পাঠকে চিনতে পারতো তাকে। নিজেকেও।

৭।

(৯/৫/২০১৬, সকাল ৯ টা ৪৯ মিনিট)

ধান ভানতে শিবের গিত চলছিলো। তখন শিব হাজির। অর্থাৎ আমাদের করিতকর্মা শিবু হাজরা।

- দেকো, দেকো, বজরায় কইরে সে ধান নিয়ে এয়েছে পদ্মা পাড়ি দিয়ে, এ দেকছি আরও এক আটি!

অর্থাৎ মশা মারতে কামান দাগালো সে আরও একবার।

কিন্তু শিবু কৈফিয়ত দিতে গিয়ে বললো, ব্রহ্মাধ্বলে ধান এবার কম হইয়েছে।

- ওলো, তুই ধানে বিষ দিসনি কেনে?

শিবু হাজরা বলে, বিষ সব কাচা বাজারে চইলে গেইছে।

- তালি এহন কি হইবে?

শিবু বলে, তবে পদ্মায় আসার সময় দেকলাম, রবিবাবু ‘সোনার তরি’ বজরায় করে পদ্মাবিহার করে চিরতার সেরবেত গিলছেন, আর তাতেই এক একটা কইরে কবিতা বের হচ্ছে। তাতে ধানের কতাও আছে!

■ আছে? ধানের কথা আছে? তাই বুঝি এক আটি! না থাকলে কি হতো?

শিবু উত্তর করে, কেনো? সোনার পাথর বাটি হইয়ে যেতো!

■ তা সে বাটিতে ভাত কি এ বছর উঠবে?

শিবু তখন বলে, নেই তাই খাচ্ছে। অমন কইরেই খেইয়ে যাও।

৮।

(৯/১০/১৫, রাত ২ টা, থাইল্যান্ড)

তখন আমি বুঝলাম যে মানবাধিকারে আমি বিশ্বাস করি না। অর্থাৎ শব্দের মাহাত্ম্যে আমার ভরসা নেই। আম যদি ছালা হয়ে যায় তবে তাতে আমার গুনাগুন কি নষ্ট হয়?

■ তা হয় না, কিন্তু গুনতে একটু কেমন লাগে না?

- ও তোমার অভ্যেসের বেপার। আদিকালে আমার নাম কেউ ভুল করে বেগুন রাখলে দেখতে আজ তুমি বলতে আহা, রাজশাহির ফজলি বেগুনে এ কি স্বাদ! অথবা ল্যাঙড়া বেগুনের মুকুলে এইবার পোকা লেইগেছে গা...

■ অর্থাৎ নামে কিছু আসে যায় না বলছো? কিন্তু নামেই তো চলছে সব!

- সে যার চলে চলুক, আমার চলে না সেই কথা বলেছি। বলেছি যে ‘মানবাধিকার’ শব্দের মধ্যে প্রচুর নষ্টামি রয়েছে। অর্থাৎ মানবের অধিকার রক্ষা করতে এদের যত চেষ্টা, মিটিঙ - এ অর্থহীন জ্ঞান ফলানো আর চা-পানি খাওয়ার তেষ্টা ঢের বহুগুন। মানবাধিকারের ধুর্যো তুলে যারা বাড়তি সুবিধা আদায় করে ‘অভিজাত’ জীবন-যাপন করে, বিকৃত হয়ে শব্দটা ওই পর্যন্ত সিমাবদ্ধ হয়ে আছে।

আমার পড়ে পাওয়া এক আনার এক বান্ধবি ছিলো। অর্থাৎ পাতানো। আসলে সে পাতা দইয়ের মত – পচা ও নড়বড়ে। আসলে সে আমার কোনও দরেরই কেউ হয় না। তারে বললাম, আসো ইভটিজিঙ এক রাতেই কমায়ে দিই।

■ কি করে?

- কেন শাহবাগে ঝুলায়ে দিয়ে! একটারে ঝুলাবো, সেই দৃশ্য টিভিতে লাইভ কাস্ট করবো, দেখবো দেশের বির-যুবাদের কয়জনে পরের দিন স্কুল-কলেজ, রোয়াকে, আর বাসের ভিড়ে বিরত্ব দেখায়!

সে আমারে বলে, ওয়াক! এই না হলে মুসলিম! তুমি ইরান আরবের কাহিনি এনে চালান করলেই হবে! কি বর্বর! কি বর্বর!

- ইরান আরব মানে মুসলিম, এটা আমার জানা ছিলো না। জানলাম।

বান্ধবির সঙ্গে আর কথা হয়নি। তার সঙ্গে বাদ দিয়েছি। তারপর আমি যারা টিজড হয়েছে তাদের সাক্ষাতকার নিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। এরা সবাই আমাকে সমর্থন করেছে। রাস্তায় তখন রাস্ট্র হাজির – মানুষের ভূমিকায়।

রাস্ট্র আমাকে বললেন, আমি কিন্তু বিস্তৃত ক্ষমতার অধিকারি!

- আঙে, হুজুর, জাহাপনা, সে আর না জানতে!
- আমরা ছালা বানাবি, তোর এই স্পর্ধার রহস্য কি?
- কিন্তু জাহাপনা, আম তো ছালা পরেই লজ্জা নিবারন করছে! নতুন করে কারে কি বানাবো বলেছি! বরঙ ছালার বদলে কিছু কাপড়ের ব্যবস্থা করুন, আম-এর মঙ্গল হয় তাতে।
- আবার হেয়ালি, তবে রে...!!!

সেই থেকে আমি জেলে। আমার 'রিতু' চলছে। কিন্তু একটা আমও এখন অবধি জোটেনি!

৯।

(বাস্তু- শাপের উপাখ্যান)

সাপটি প্রায় তেড়ে এলো। কিন্তু শাপে বর! সম্ভাব্য শিকারের ঠিক পাশে কোথেকে ওই সময় একটি নাদুসনুদুস মন্ডুকের আবির্ভাব হতেই সাপ তাকে ধরাশায়ি করে ফেলে।

রেহাই পাওয়া সম্ভাব্য শিকার অত্যন্ত কর্কশ স্বরে অবজ্ঞার সুরে বলতে থাকে, সাধেই কি আর তোকে কুপমন্ডুক বলি!

মন্ডুক অর্থাৎ বেঙটি তখন কাতর কন্ঠে সাপটিকে বলতে থাকে –

আমার কোনও আফসোস নেই, আমার জন্মই তো উতসর্গের জন্য। কিন্তু যারা শুধু ভোগ করেই এই পৃথিবিকে ধরাশায়ি করে, তারা তো প্রকারান্তরে তোমাকেও ধঙস করেছে। তুমি তাও সুযোগ হাতছাড়া করলে?

সাপটি তখন বেঙটিকে মুখ থেকে মুক্ত করে বললো, আমি তো কেবল ফোসফাস করেই বেচে আছি, ছোবল দিইনা তাই আমাদের অস্তিত্ব বিলোপের পথে, ছোবল দিলে কি হতো একবার ভাবতে পারো হে বোকা বেঙ?

বেঙ বলে, বুঝেছি এবার, অর্থাৎ পৃথিবিকে ধঙস থেকে বাচায় এমন কেউ নেই!

সাপের আফসোস, যার হাতে রাজদন্ড, তার হাতেই স্থান, বস্তু ও স্বপ্নের চিরকালীন ধারণা বদলে গেছে, রাজদন্ডের সর্বগ্রাসি অসভ্যতা এখন নতুন এক সভ্যতার নাম নিয়ে এই প্রকৃতি শাসন করছে, এই অপবিত্রতা এখন অপমৃত্যুরই নাম, কিন্তু বাস্তবে এ শুধু শব্দবহুল জীবন-যাপন...

প্রকৃতি শাসন, না নিধন! বেঙ যেনো আনমনেই বলে, নাও ভাই, আমাকে মুখে তুলে তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তি করো।

সাপের তাতে আপত্তি, আমি হিঙস কিন্তু নস্টো স্বভাবের না, যাও তুমি মুক্ত।

বেঙ চলে যাবার সময় বলে বলে গেলো, মুক্তির শুদ্ধ অর্থ প্রকৃতির সবাই বুঝলো, কিন্তু প্রানিকুলের শুধু একটা প্রজাতি বুঝলো না। রাজদন্ডের অভিশাপে চোখে সামনে দুলে ওঠে কালো পর্দা, আড়াল হয়ে গেলো প্রেম, শাপ আসে শাপ যায়, ভোগের পেয়ালা উপচে গেলেও চাই, আরও চাই, আরও, আরও চাই... তবু নাকি মুক্তির আসে একা ভোগের পথ ধরে...

১৩/ ৫/ ২০১৬, রাত ৯ টা ২৪ মিনিট, সঙখলা, থাইল্যান্ড।

১০।

(রাত ৩ টা , ১৫/৫/২০১৬)

ছবিটা দেখে কেউ একজন বললো, বাহ! চাদের ছবি। কথা কেড়ে নিয়ে আর একজন বলে, আরে নাহ! এটা জানালার ছবি। তারপর কেউ বললো রাতের ছবি, কেউ অন্ধকারের ছবি, কারও দাবি আলোর ছবি। অর্থাৎ ‘সত্য’টা দেখা অন্ধের হাতি দেখার মত হয়ে গেছে। তবুও রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর কঠিনেরে ভালোবেসেছিলেন। যারে জানা যায় না তারে কেমন করে ভালোবাসা যায়? এই ভ্রান্তিতে পড়ে ছবিটাও দুলছে, মায়াবি ছবিটা দুলছে।

উপরের দর্শকেরা আম। এবার এলেন পন্ডিতেরা, এরা ছবির মর্ম উদ্ধার করেন। একজন বললেন, এটা তো দেখছি খুবই বাস্তব – রিয়েলি ডকুমেন্টারি! মারভেলাস!

পাশে ছিলেন আরেক পন্ডিত, তিনি বললেন, আরে মশাই কিসের সঙ্গে কাকে সঙজায়িত করলে ছবির উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয় সেটাও জানেন না! (মনে মনে, ‘ভারি পন্ডিত আমার!’) আরে এটা হলো একটা কনসেপ্ট!

হট্টগোল দেখে তখন শিল্পি নিজে এলেন, দেখুন ছবিতে আমরা অ্যাবসট্রাক্ট আর কনক্রিটের মানে এক করে ফেলেছি, চির বৈরি দুটো শব্দকে কাছাকাছি এনেছি, আর ভ্রান্ত উদ্ভাবনার আনন্দে ভেবেছি, কি পান্ডিতুই না জাহির করা গেছে! কিন্তু সব ভ্রান্ত। তবে আপনাদের আলোচনায় বিষয়ের আদি রূপ অত্যন্ত প্রকট। সে জন্য ধন্যবাদ।

আর একজন পন্ডিত গাইগুই করলেন, আচ্ছা আপনিই বলুন।

কিন্তু সে কথা কানে না তুলে শিল্পি বললেন, ছবি আর ছবি নেই, ছবি কোনওকালেই ছবি ছিলো না। সব ভুত হয়ে গেছে – এটা হলো সেই ফ্যান্টম অফ ফটোগ্রাফ, যা ভ্রান্ত পান্ডিতের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে আমাদেরকে আলাদা করে দিয়েছে।

দিধা হলে নাকি জ্ঞানের শাখা বাড়ে, কিন্তু দিধায় ভালোবাসা ও সম্মান লোপ পায়। সেটা বোঝা গেলো।

১১।

(৩০২০১৬/৫/, সকাল ৮ টা , থাইল্যান্ড)

আজ স্মরণকালের শ্রেষ্ঠ স্মরণ করছি। বোধ এমনটা-ই। কিসের জন্য এই মাতম সে জানি না। যার কাছে আমার বিন্দুর মতও শরন নেই, ফুলবালার ফুলমালিকা হাতে যার কাছে বিন্দুর মতও বরন নেই, আছে শুধু ঘৃণা, ক্ষোভ, আর অপমানের ক্ষরন, তার জন্য উতলা হওয়ার অর্থ হলো নিজেকে নিচু করা। নজরুল বলেছিলেন, নিচতার চেয়ে আর পাপ নেই। এ কি তবে সেই নিচুতা? এ কি তবে সেই আদি পাপ? ‘ভেসে যায় যথা আজ প্রিয়তম দূরে’ – কিন্তু যেনো মনে হয় তরি বেয়ে আমার কাছেই আজ সকালে ভিড়েছে সে। ভাবনার এ পাপ খন্ডাবো কেমনে? ‘শুনিতেছি আজো আমি প্রাতে উঠিয়াই, ‘আয় আয়’ কাদিতেছে তেমনি সানাই’। আমার প্রাতের এই বোধের কথা নজরুল কেমন করে জানলেন?

মাতম জানিবে যে দুঃখটা তার,

বুক ফাটা আতর্নাদ তাই তো আমার।

ফলে আমার দুঃখের কারন আমি নিজেই। এই পৃথিবি আমারে লয়ে বিকারহিন। ফলে দুঃখের বোঝা বইতে হবে আমাকেই। সঙ্কটে শরন নেই যার কাছে, আনন্দে অশ্রু নেই যার আমার জন্য, উচ্ছাসের

ধরনে যে নিজে ভাসে অন্যের হালের ভরসায়, তার জন্য তরনি ভাসায়ে কি লাভ? পল্লি কবি জসিম উদ্দিন তার ঘর ভেঙেছিল যে, তার ঘর বেধে দিতেন। আমাদের যে পর করেছে আমি তারে কেন এত আপন ভাবছি আজকে, সেই কারন খুজতে খুজতে যখন হয়রান তখন আমার ‘আমি’ সামনে এলো। ‘আমি’টা অনেক ধাক্কা খেয়ে খেয়ে এতদূর অবধি আসতে পেরেছে বলে আমার সে কি আহলাদ। কিন্তু ‘আমি’টা এসেই বলে, নজরুল কতক শিল্পীদের হাতে ফেসে যাচ্ছেন। এরা নজরুলকে ছাদে ফেলে আটকে রাখতে চায়। তাদের দাবি, নজরুলকে বিকৃত করে ফেলছি নাকি আমরাই! কি সর্বনাশ! আমি বললাম, তারা কারা! আমার ‘আমি’টা আমাকে বলে, তারা নজরুলের সুর নিয়ে গবেষণা করেন, সুরের বৈচিত্রকে আরও বেশি বাঙময় করে তোলার চেষ্টা করেন বলে দাবিওয়ালাদের মেলা আপত্তি। আমি আমার ‘আমি’টাকে শুধু বলি, তুমি ক্ষান্ত হও। নজরুল ক্ষান্ত হবেন না বলেই কবিতায় লিখেছিলেন। ফলে ছাচে আটকে ফেলে যারা ক্ষান্ত নজরুলকে ভালোবাসি দাবি করছে এদের বিরুদ্ধেও নজরুলেরই ‘বিদ্রোহ’ একদিন মহিরুহ হবে।

আমার ‘আমি’টা ক্ষান্ত দেয় তখন।

নজরুলের গান নজরুলের জীবনের মতই বৈচিত্রমন্ডিত হওয়াটাই হলো স্বাভাবিক। অজয় চক্রবর্তি কিম্বা তার ছাত্রছাত্রীদের গাওয়ার স্টাইলটা খুব সামান্য ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি মনে হওয়া ছাড়া নজরুলের যে বিরাট মানের ক্ষতিসাধন তারা করে ফেলেছেন সে রকম কখনই মনে হয়নি আমার। আর মানবেন্দ্র মুখার্জি নজরুলকে যে অনন্য উচ্চতায় তুলে দিয়েছেন সে কথা হিঙসুকরাই শুধু স্বিকার করে না, কারন হিঙসুকরা হিঙসা করে তাদের যোগ্যতার অভাবে, সত্যিকারের নজরুলকে ভালোবাসার অভাবেও। এরা নজরুলকে একটা ছাদে ফেলতে চেয়ে তাকে আবদ্ধ করে রাখতে চায়। কিন্তু ভুলে গেলে চলবেনা যে, নজরুলের বৈচিত্র ও শেকল ভাঙার চরিত্রই নজরুলের আসল ছাদ, খাচার ভেতরে আটকে পড়া বৈরাগ্যসাধনে নজরুলের মুক্তি নেই।

১২।

বাকাচাদ কহিলেন, শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইন্ডরাজ আমাদিগের মিত্র।

কিন্তু ট্রাম্প কার্ডে কষে বাজির খেলায় এগিয়ে যাওয়া ট্রাম্প বলিলেন অন্য কথা, আইসো, এদেরকে খেদাইয়া মঙ্গল গ্রহে পাঠাইয়া দেই, বলো কি না!

বটে! মার্কিন মুলুকের মোল্লা তথা দুনিয়ার ফালতুতম দাদাগিরির পদপ্রাপ্ত হইলে উল্লিখিত বাকাচাদসুলভ শত্রুর কপালে শনি, কিন্তু ট্রাম্পের যোগে যে বৃহস্পতি হয়, এটা বলিতে বড়ো দিধা হইতেছে। এর মুখের দিকে দৃকপাত করিলেই বোঝা যাইবে এ জন্ম হইতেই পেটের পিড়ায় ভুগিতেছে। যদি পারিতাম, মঙ্গলে তশরিফ লইবার পূর্বক উহাকে নেট্রাম মুর কিম্বা অলিয়াম সেপা-এ ভেজানো দুইটা বটিকা গিলাইয়া কহিতাম, হারামজাদা সুখি হ’। সে সুখি হইলো।

ভালোবাসো মানুষ। তোমাকে দশগুন প্রেম দিবো। ঘৃণা করো আমাকে, তোমার কিছুই ছিড়িতে পারিবো না, কিন্তু ঘৃণা করিবো একশগুন। এ আমার প্রেমের রিতি। আমার আমি’কে যখন এই কথা শুনাইতেছিলাম, তখন বিদ্যাসাগর আসিলেন। তিনি আসিলেন এবণ্ড ‘মানুষ’ ভালোবাসিলেন।

বাকাচাদ তখন বাকা হাসি দিয়া কহেন, কে নাকি একজন ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হাজির! লোকে কহিতেছে তিনি নাকি পন্ডিত! যে বিধবা বিবাহ করাইতে চায় সে যদি পন্ডিত, তবে মুখ কে?

হক কথা!

কিন্তু আব্দুর রাজ্জাক সার আসিয়া গন্ডোগোলটা পাকাইলেন। তিনি কহিলেন, শুনেন, মানুষ হিসেবে আফনে বাকাচাদ বিদ্যাসাগরের পায়ের ধুলোরও যোগ্য নন, বুঝলেন নিহি, এমন কি রবিন্দ্রনাথও নন! এই কথা কানে আসিতেই আমার ভেতরে কেমন করিয়া উঠিলো, মনে ভারি বল বোধ হইলো। আমি সাহস করিয়া ‘বাকাচাদ’-এর আ-কার, হুস্ব-ই-কার ইত্যাদির স্থান লইয়া খেলা করিতে লাগিলাম – বাকাচাদ -> বকাচাদ -> বোকাচাদ

না, রাজ্জাক স্যারের সম্মুখে বাকিটা উচ্চারণ করা যাইবে না, যদি কানমলা খাই!

১৮/৬/২০১৬, সকাল ৬ টা ৭ মিনিট, থাইল্যান্ড।

১৩।

আমার চেয়ে সাপ বেশি ভয় পায়, এমন কারও সঙ্গে আজ অবধিও আমার পরিচয় হয়নি। কিন্তু বিস্ময়করভাবে সাপের খোজেই কি না ইদানিঙ রাস্তায় ঘুরছি আমি! এ বিষয়টা এমনই দ্ব্যর্থবোধক যে, সাপে ভয় পাই – এই কথাটা মিথ্যে বলে বোধ হতে পারে। কিন্তু মিথ্যে তো নয়ই বরঙ ভিত্তি এমন এক পর্যায়ে পৌছেছে যে, ‘রজ্জুতে সর্পভ্রম’ কথাটা বইতে পড়েছিলাম ছোটবেলা, এখন বাড়বেলায় প্রতিনিয়ত টের পাচ্ছি অত্যন্ত অসহায়ভাবে। ভিত্তিটা চূড়ান্তরূপ লাভ করেছে। মানসিক সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। রশি, খড়কুটো, রাস্তার বক্রদাগ, অর্থাৎ এ রকম কোনওকিছুকেই এড়াতে পারছি না। সবকিছুকেই তেড়ে আসা মনে হচ্ছে। আতকে ওঠাটা হয়ে যাচ্ছে অবশ্যস্তুবি।

এখন আমার আমি’কে আমি প্রশ্ন করেছি, আমি কি সত্যিই ভয় পাচ্ছি, না কি প্রত্যাশা করছি যে রশিটা, দড়িটা, কুটোটা সাপ হোক? আমি কি আরও বেশি ভয় পেতে চাচ্ছি? সাপ না দেখলেও কেন তবে মনের মধ্যে থাকা সাপেরা তেড়ে-ফুড়ে আসছে? প্রত্যাশার সঙ্গে ঘটনার যোগ সবসময় ব্যাটে-বলে না হলেও আমার প্রত্যাশা কল্পনায় তাকে কি তবে বাস্তব করে তুলতে চাইছে? কি ভয়ঙ্কর বেপার! মৃত ও জিবন্ত সাপের ছবি তুলে বেড়ানোর এক ভয়নাক নেশায় আমাকে পেয়েছে। আমি যেনো আনমনেই সাপ দেখি, সাপের ছবি তুলি, সাপ দর্শনের প্রত্যাশা করি – সোমনাবুলিস্ট যেমন আনমনে ঘুমে ঘুমে হেটে বেড়ায়, আর বলে, ম্যাকবেথ ঘুমকে হত্যা করেছে – তেমনি! মানসিক বিপর্যয় আমাকেও হত্যা করেছে প্রতিদিন।

১৮০৬২০১৬

সকাল ৬ টা ৫৫ মিনিট, থাইল্যান্ড।

১৪।

বিতাড়িত শয়তানে প্ররোচনা থেকে ‘বাচিবার’ জন্য প্রার্থনা করে এসেই খেলো ঘুষ। ইমান তখনকার জন্য ঠুস পরে থাকলো। প্রার্থনার প্রায় শুরুতেই উচ্চারণ করলো ‘প্রভু, সহজ আর সরল পথ দেখাও’। আর এসেই গরল! পয়সা আসে বাকা পথে – টেবিলের তলা দিয়ে। ফলে ‘সহজ ও সরল’ পথের সঙ্গে এর কোনও যুঝ নেই – বাহ রে বেটা বাহ! শুধু বেতনে জিবন ঠান্ডা, জিবনের সুখ নেই এতে আহলাদও নেই। সমাজে নিজের থান্ডার অর্থাৎ কেরামতি দেখাতে চাই আরও পয়সা – মসজিদের ইটের ইতিহাসেও এই পয়সার গন্ধ লেগে

থাকে। প্রার্থনাসভার সভাপতির পদ পয়সার জোরে ভেগে যায় ইমামের ঠোলা থেকে। ইমামও তেমন – হ্যাঁ সার জি সার করলেই পুলসিরাত পার, যাক তবু উপকার হিসেবে কিছু উপরি তো মিলছে! ফলে প্রার্থনাটা ভেক, কপালের কালো বা বাদামি দাগটা মেঝেতে ঘসে ঘসে তৈরি করা কিনা বোঝা যায় না, কিন্তু এটা বোনাস – মানে সহজেই কেউ এরে বেইমান কইতে গেলেও আগে পিছে অনেক ভেবে নিতে হবে। কাজটা সহজ নয়। আর পদবির তকমা যদি অন্যদের তুলনায় আরশের বেশ কাছাকাছি হয়, অর্থাৎ বেশ উচু – তাহলে কিন্তু প্রার্থনার জল পড়ে আপিসের যায়নামাজে, পাতা নড়ে অ-নামে অর্থাৎ অন্য নামে ব্যাঙকের একাউন্টে, বউ-ছাওয়াল-মায়া, মায় চাকরও পর্যন্ত বাদ যায় না। চাকরের পাওয়ার অব অ্যাটর্নি কিন্তু মনিব খুদকো পাস রাখে! বেটা কেস্টা যদি চোরের উপরে বাটপারি করে! তাই এই সাবধানতা।

কর্মস্থলে এবঙ জিবনের অন্য সকল স্তরেও বিবেক ঘুমিয়ে থাকে বেশিরভাগ সময়। বিবেক ক্ষনে ক্ষনে জাগে। এখন আবার জেগেছে। কেন জাগলো? তেনার উত্তর, কেন আবার, প্রার্থনার সময় হয়েছে না?

৩০০৬২০১৬, বেলা ৩ টা ৩ মিনিট, থাইল্যান্ড।

১৫।

মানসিকভাবে যে বিবর্তন হওয়ার কথা ছিলো বাঙালির, সেই ঘটনা ঘটলো না। খুব দুঃখজনকভাবে বাঙালির মন বিবর্তিত হতে গিয়ে বানর থেকে মানুষ না হয়ে অন্য কিছু হয়ে গেছে। আদি সঙ্স্কারের সঙ্গে ভিনদেশি সভ্যতাকে গ্রহন করাতে হয়ত অপরাধ নেই, কিন্তু যখন যা ধরবার তার আগে থেকেই তাকে ধরলে গেলে হাত থেকে তা যেমন ফসকে যায়, পড়ে গিয়ে অনেক বিপদের সম্ভাবনাও থাকে। বাঙালির সম্ভাবনাটা সত্য হয়ে গেলো।

- কেন এ কথা বলছেন? এতো এতো মননশীল সাহিত্যিকের জন্ম হয়েছে এখানে, তাদের কি নেই এতটুকু অবদান?
- হুম আছে, তবে বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই তা কেবল মৌখিক কথা বা স্বিকৃতি, অন্তর সেই পশ্চিমাদের দাস রয়ে গেছে। তাই তাদের দ্বারা লেখনি হয়েছে বিস্তর, কিন্তু বাঙালির মননের পরিবর্তনটা সেই স্বপ্নই রয়ে গেছে।
- কি যে বলো না দাদা!
- বলবোই তো। তোমরা সাধ করে সাহিত্যের সম্রাটের আসনে এমন এক পাকা লোককে বসালে যে সাম্রাজ্যবাদীদের পা চাটতে চাটতে বাঙলাকে, অর্থাৎ বাঙলার মানুষকে তাদের চিন্তা-চেতনাকে ভুলতে বসেছিলেন। যারা পরিবর্তনের সঙ্স্কারের আলো নিয়ে এলেন, তাদেরকেও সম্রাট যাচ্ছেতাই করেছেন। ফলে চেতনার দাসবৃত্তি করা থেকে এখনও বের হতে পারিনি আমরা। পাশ্চাত্য অনুকরণের তিরি ঝোক আমাদের একদিন বাতিল করে দেবে দেখো। সেইদিন দেখতে চাই না। কিন্তু পুরোধাদের অনেকেই সেই ধারাকে শক্ত হাতে সেলাই করে

দিয়ে গেছেন বাঙালির কন্ঠহারের মত। সেখান থেকে ছিড়তে গেলেও গলায় টান পড়ে, রক্ত ঝরে, রাখতে গেলেও কাটার মত বিধে।

- অর্থাৎ লোকাচারের বিধানের মধ্যে অন্যলোকের গল্পকে সিধে দিয়ে বেপারটাকে হাস্যকরভাবে দুঃখজনক করে তোলা হয়েছে?
- হুম, বটে! বিদেশি সুরে দেশি গান কেমন লাগে?
- মন্দ লাগে না তো দেখি! কেন এখানে আবার কি হয়েছে?
- ওই অনুভূতিই হলো গিয়ে আসল কথা। কিন্তু অনুভব করা যাচ্ছে না এই তো। যাবে কেমন করে রেফারেন্স নেই তো কোনও। বিমানে চড়লে মনে হয় না আকাশযানটি থেমে আছে! অর্থাৎ রেফারেন্স এতো বড়ো যে কৌনিক সরনের মান অত্যন্ত ছোটো, ফলে মনে হয় নড়ছে না, জায়গায় দাড়িয়ে আছে। গানের বেলায়ও তাই। এখানে এক কাজ করতে হবে। বিদেশি অর্থাৎ পশ্চিমা সুরে, আমাদের দেশের মত অন্য অনেক দেশই গাইছে। তাদের গান শোনো। দেখো, হাসি পায় কি না। ফিলিপিনো, মালয়, থাই, চায়না, ভিয়েতনামিজ কিম্বা অপরাপর প্রাচ্য দেশের ভাষা দিয়ে পশ্চিমা চণ্ডয়ের সুরে বাধা গান শুনে দেখো হাসতে পারো কি না।
- অর্থাৎ স্বকিয়তায় যা প্রকাশযোগ্য, তাকে বিষমিকৃত করলে বিপদ!
- নিঘঘাত!
- অর্থাৎ নিজের সঙষ্কৃতি পাকাপোক্ত না করে অন্যকে এর মধ্যে টেনে আনা হলো ‘ইউ ইটিঙ নাইফ অ্যান্ড ফর্ক’ – এর মত!
- হুম। উই অল আ(র) ইটিঙ দ্যাট নাইফ অ্যান্ড ফর্ক। নট উইথ নাইফ অ্যান্ড ফর্ক!

১৬।

বে... বে... বেআ বেআ আ আ...

কিন্তু ঠিক বে বে করা নয়, এটা বললে বিলকুল মিছে বলা হয়ে যায়। এটা হলো অনেকটা আঝা... আ আ ... আঝা... আ আ আ... এমন একটা ডাক। এই শব্দটার উপরে যে সুর চড়লো সেই সুরের তোড়েই আমার ঘুমের বারোটা বাজলো। বারোটা অবশ্য অনেক আগেই ফেলে রেখে এসেছি। গভির সেই রাতের কনসেন্স ও সেন্স – এর ঘুমিয়ে যাওয়া দুটোই এখন পাস্ট টেন্স। তখন আমিই শুধু বর্তমান। তবুও নিখাদ চেতনার উর্ধে। সে বেশ ক’ঘন্টা আগের ঘটনা। কিন্তু এখন সেন্স ফিরে এসেছে উপরের শব্দের উপরে বসানো সুরে, অর্থাৎ গানে। এটি একটি বিখ্যাত কান্নার সুর। বাবার প্রতি প্রচুর অনুরক্তি ও টানযুক্ত শিশুরা সাধারণত এই গানটা গেয়ে থাকে – নাকি সুরে, কখনও কখনও গড়িয়ে গড়িয়ে। বিশেষ করে অতি আদরের মেয়েটাকে ফেলে চুপি চুপি বাবা যদি কাজের প্রয়োজনে বাইরে চলে যান, তখন স্ত্রি যেমন করে চিরতরে বা অনেকদিনের জন্য স্বামি দুরে কোথাও চলে যাবার সময় মিনতি করে বলেন, দোহাই আল্লাহ, আমারে ছাড়ি যাইওনা গো, এই কান্নাটা একেবারে সঠিকভাবে সে রকম না হলেও তিন বছরে মেয়েটা কি অতশত বোঝে! সে ভাবে

তার বাবা হয়ত আর কখনই ফিরে আসবে না। তখন নাক-চোখ, হাত- পা সব এক করে গলা দিয়ে কান্না বেরিয়ে আসে – (আ)বেআ আ আ আ আ.....। বাবা কিন্তু বারোটা বাজার আগেই হাত ভরে বাজার থেকে মেয়ের জন্য মিঠাই সন্দেশ নিয়ে হাজির হন। একটুকু মাত্র সময়। তাতেও মেয়ের তর সহ্যে না। কি মন দিয়ে যে আল্লা আমাগো মানুষগো পাঠাইছেন দুনিয়ায়! কিসের জন্য এত মায়া জাগে তা কে জানে!

কিন্তু আমার তখন মায়া করার অবস্থা নেই। ঘুম ভেঙে গিয়ে শরির চড়চড়, মনের অবস্থা বেখ্যাতিত। আমি এখানে ছিচকে অতিথি, কিন্তু ঘুমের নিরিখে দুনিয়ার সবার দরকারটা সমান। এবারের ইদ-উল-ফিতরির সময়টা ঘুরে বেড়ানো দেদার, এমন ছক কষেছিলাম। নিজের পরিবারকে ইদের সময়ে না পেলে ইদের অর্থাৎ আনন্দের আর কিই বা থাকে জিবনে! তাই বলে তো আর বসে বসে শোক করতে পারিনা। ছক কষাটা এই জন্যই। ঘুরে বেড়ানোর ধান্ধাটা অবশ্য আমার জন্য বছরের সব সময়েই একই রকম। অর্থাৎ ফুরসুত পেলেই ছুট! ফলে নিয়তের বিচারে এটা এমন কিছু অভিনব নয়। কিন্তু ভৌগলিকতা অনুসারে বিশেষ অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ। থাইল্যান্ডের নারাথিওয়াত প্রদেশ আর মালেশিয়ার সিমানারেখাকে লক অব কন্ট্রল বলে কি না জানি না, কিন্তু এই প্রদেশে গিয়ে শক খেয়েছি দেদার। রাজ্যটা মুসলিম সঙ্খ্যাগরিষ্ট। কিন্তু গরিষ্ট হলেই শক্তিমত্ত হব, দুনিয়ায় এর বিপক্ষে হাজার হাজার প্রমান জোগাড় করা যাবে। নারাথিওয়াতও সেই রকম। বাঙলাদেশে চালের বেবসা, সোনার বেবসা জমিয়ে করে থাকেন মূলত সনাতন বেবসায়িয়া। সোনা মিয়া শুধুমাত্র পিতৃপ্রদত্ত নাম হিসেবেই রেজিস্টারিতে লিপিবদ্ধ। এখানেও এমন। নব্বই শতাংশের উপরে মুসলিমের বাস। কিন্তু ছড়িটা ঘুরছে তাদের মাথার উপরে। রাস্তা দিয়ে মুসলিমের যাবার সময়ে সৈন্যেরা হাসেন বটে, কিন্তু তাতে মনে হয় অর্থাৎ হাসির সময় চকচক করে ওঠা দাত এবং মুখের জ্যামিতিক আকারের ছাদ অর্থাৎ পেটার্ন-এর অর্থটা এমন – যাও, তবে দয়া করছি, এটা ভুলে যেওনা। সৈন্যের কথা আসছে কেন! কারন এশিয়ান হাইওয়ে দুই – এর দক্ষিণের অংশ তিনটা রাজ্যের ভেতর দিয়ে মালেশিয়া চলে গিয়েছে। রাজ্য তিনটার নাম পাতানি, ইয়ালা এবং নারাথিওয়াত। রাজ্য তিনটা মুসলিম সঙ্খ্যাগরিষ্ট। শতকরা হারে বাঙলাদেশের মতই। এই তিনটি এলাকা নিয়ে অনেক কাল আগে গড়ে উঠেছিলো স্বাধীন পাতানি সালতানাত। আরব ব্যবসায়ি এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলিম অভিযানের মাধ্যমে এদেশে ইসলামের বিস্তার ঘটে। প্রাচীন এই ইসলামি জনপদে এক সময়কার মুক্ত ও স্বাধীন মুসলিমরা আজকে বন্দি হয়ে আছে। রাস্তা দিয়ে যেতে থাকলেই বোঝা যাবে যে, এই এলাকায় এশিয়ান হাইওয়ে নিজেই যেন একটা জেলখানা।

আমার ঘুম ভাঙল কিন্তু ছড়ির কান্না থামলো না। মুসলধারে বৃষ্টির মত শুরু করেছে। মনে আর কেয়ামত তক চলতে থাকবে। কিন্তু আমার যা স্বভাব তাতে করে এই অবস্থাটাকেই কায়েম করতে দেবো, তেমন সম্ভাবনা নেই বলেই হয়ত ভাঙা ও কাচা ঘুমের ঘোরেও ভাবতে থাকি কি করা যায়! এমনিতেই বাচ্চাদের সঙ্গে মশকরা করার সুযোগ এলে আমি আবার নিজের বয়েস ভুলে যাই। গাড়িতে করে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় দেখেছি স্কুদে ফুটবল খেলোয়াড়রা খেলছে। গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়েছি কতদিন তা

হিসেব করিনি। এই তো কাল রাতেও অনেক উচু উচু পর্বতের একেবারে মধ্যখানে গড়ে ওঠা অপূর্ব এই শহরে যখন এলাম এই কাদুনে ছুড়িটার বাসায়, তখনও হোটেল-হোটেল খেলেছি এদের সঙ্গে। এটা একটা বিশেষ ধরনের খেলা। চার থেকে সাত বছরের ছয়-সাতটা গুড়িপাল্লা জটলা পাকিয়েছে এক অভ্যর্থনা কক্ষে। তাদের কাছে রয়েছে অনেক রকমের বাহারি রঙের ক্রোকোরিজ সামগ্রি। বলা বাহুল্য এই সামগ্রিগুলোর সামগ্রিকতা বিষয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। দুনিয়ার হাড় হাভাতে মানুষেরা কলাপাতা কচুপাতায় খাবার তুলে কোনওরকমে খেয়ে ক্ষুধা নিবারন করতে পারলেও ওই কলা-কচুপাতাই হলো ওই সময়কার জন্য ক্রোকোরিজ অর্থাৎ বাসন-কোসন। ধনি লোকদের কথা বাদই দিলাম।

তবে আজকের এই সন্ধ্যায় ছোড়া-ছুড়িরা প্লাস্টিকের বাসন নিয়ে মঞ্চে আবির্ভূত। অর্থাৎ এরা একটা হোটেল খুলেছে এমনই চিত্রনাট্য। ভাবলাম এই নাটকে একটা ‘রোল প্লে’ করলে কেমন হয়! এমনি করেই চলে এসেছে সারা জীবন, আজ তবে কেন তার ব্যত্যয় হবে! কাত হয়ে শুয়ে প্রথমে আমি ওর মুখের দিকে এক নাগাড়ে চেয়ে থাকি, পলকহীন, আর অবাক হবার ভান করি। ও আমার দিকে তাকিয়ে থাকে তার চেয়ে বেশি এক নাগাড়ে, কিন্তু চোখের জলে সোনামনির বাধ তবু ভাঙে না। এবার ওই তাকিয়ে থাকা অবস্থাতেই গুন গুন করে ও যে সুরে কাদছে ওই সুরটাকে নকল করতে থাকি আমি। বাঙলাদেশে গানের সুর নকল করে তারকা খ্যাতি পাওয়া এস্তার গায়কদের চিনি আমি। ফলে নকলের সরাসরি অভিজ্ঞতা না থাকলেও পরোক্ষ ও পারিপার্শ্বিকবোধে বিষয়টা অভিজ্ঞতারও শামিল কিছুটা। তবে নকলে কিন্তু প্রথম চোটেই কাজ হলো! ভিন্নভাষি এই তিন বছরে ছুড়ি বিসমিল্লায় হকচকিয়ে যায় আমার কান্ডে। তারপর আরও বেশি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে! কিছুক্ষনের জন্য কান্না বন্ধ! কারন ওর আশ্চর্য হওয়ার ঘোর কাটছে না! করে কি লোকটা! এ হলো পান্ডব-কৌরবের যুদ্ধের প্রথমটা – তিরন্দাজ দিয়ে পটাপট অগ্রজ সৈন্যদের কতকের জান কবস করার মত।

ফরহাদ ভাই আমাকে বলেছিলেন, এই মেয়ে তোমাকে জালাবে প্রচুর। এই মেয়ে হলেন আমার স্ত্রি। ফরহাদ ভাই হলেন এর বড়োভাই। তিনি আমাকে বললেন যে, তার বোন কিন্তু অনেক কস্টো, সমস্যা, অভিযোগের কথা তোমাকে বলবে ভাই! বড়ো আদরে আহলাদে মানুষ হওয়া ছোটো বোন তো! কিন্তু তোমাকে একটা দাওয়া দিই। সেটা হলো ওর কস্টের কথা যখন তুমি শুনবে, তখন তুমি তোমার নিজের এমন কস্টের একটা কথা ওকে বলো যেটা পাল্লায় ওরটার চেয়ে একটু বেশি থাকে। তখন দেখবে ও তোমাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে! এটা যা কাজ দিয়েছে না আমাকে! মাশাল্লাহ!

এই ছুড়ির ক্ষেত্রেও তেমন কিছু হয়ে গেলো না কি! ও হয়ত ভাবছে, ওর নিজের চেয়ে মনে হয় আমার বেশি কস্টো! তাই ও ক্ষনিকের জন্য হলেও কান্না ইস্তফা দিয়েছে! তিরের আঘাতে ধরাশায়ী শত্রুশিবিরের পতনে পান্ডব উল্লসিত, বে বে করা কান্নার গানের নকল করে ছুড়ির সাময়িক থেমে যাওয়াতে আমার চিত্তও প্রফুল্ল। মানে আমি যতক্ষণ নাকি সুরে ওর কান্নাকে নকল করছিলাম, ও ততক্ষণ থেমে ছিলো। কিন্তু এভাবে কতক্ষণ পারা যায়! কিন্তু থামলেই তো ও আবার *নেস্টে রাউন্ড* শুরু করবে! কিন্তু কাহাতক আমি এভাবে আমার তির চালাবো! একে সবে যৌবনপ্রাপ্ত ঘুমের গুপ্তি নাশ, সমূলে বাশ খাওয়া এমন সৃষ্টিছাড়া বে বে অর্থাৎ আব্বা আব্বা করা চিত্তহরা গান!

চিত্র - বাবা কেন চলে যায় তাকে ফেলে! এই শোকে পরির মত সুন্দর মেয়েটার কি হাল
হয়েছে দেখুন তো!

কিন্তু আমি ক্লান্ত হয়ে থামি। আমাকে থামতে হয়। আমার ক্ষমতারও একটা সীমা আছে! কিন্তু থামতেই, ওই যা বলেছিলাম, আবার আবার মায়ায় উথলে ওঠা গান। আমি আমার মাথা, কান সব এক করে উরি উরি করতে থাকি, বাচাও ধরনি! উপায়হীন। আমাকে আবার ওর সুরে গান ধরে ওকে থামাতে হয়। কিন্তু কাহাতক, বলি কাহাতক! ভাবলাম, ঘুম আর হয়েছে, জেগেই যখন গিয়েছি তখন মিছেমিছি মনে কস্টো পুষে কি লাভ! তার চেয়ে বরঙ ওর সঙ্গে খেলাটাই করা যাক না কেন! বলা বাহুল্য, সুর নিয়ে খেলা। ভালো করে শুনে দেখলাম, ছুড়ি *আ/ঝা/আ/আ/আ* বলে যে টানটা দিচ্ছিলো তা মূদারার সপ্তকের সা থেকে রে ও গা হয়ে মা তে গিয়ে আবার সা তে ফিরছে। কিন্তু আবরোহনে একটা ব্যতিক্রম হলো সে শুদ্ধ গা এর বদলে কোমল গা ছুয়ে যাচ্ছে। এই বয়সেই শুদ্ধ-কোমল বুঝে গিয়েছিস ছুড়ি! মন্দ্র লয়ে কাহারবা তালে স্বরলিপিটা এরকম – আব (সা) বা (রে) আ (গা) আ (গা) আ (মা) আ (কোমল গা) আ (রে) আ (সা) আ (সা) আ (সা) আ (সা)। অর্থাৎ আবরোহনের শেষের সা -টা হলো স্ট্যান্ডিঙ নোট। সত্যি বলছি!

আমি ভেবে দেখলাম ঘন ঘন এই সুর বেজায় *মনোটোনি* শোনাচ্ছে। বৈচিত্র আনা দরকার। ওরে কইলাম, মাগো, এবার রক্ষে কর মা, তুই সঙ্গিতের কলার এত কিছু জানিস যে আমার ঘুমেরও তুই কাচকলা দেখালি মা, এবার ভিন্ন সুরে ধর মা! আমার এই ভিনদেশি ভাষার অনুরোধে ও দেখি আরও বিস্মিত! মানে আমার দাওয়ায় কাজ হচ্ছে! বৈচিত্রের সন্ধান দিতে গিয়ে ওকে প্রথমেই যে টিপটা দিলাম তা হলো, ওকে বলি – বাছা, তুই স্ট্যান্ডিঙ নোটটা তো ভালই শিখে নিয়িছিস, তবে শুধু সা ধরেই বে বে করিস না কেনো! করে দেখ একবার! দেখবি এতে কিন্তু একটা প্রচ্ছন্ন খবরদারিও আছে এমন যে, আঝা, তুমি না বলে এভাবে চলে যাচ্ছ,

ভালো হচ্ছে না কিন্তু! আবার তুই গা থেকে সা তে নেমে নেমেও কেদে চেস্টা করে দেখ মা! এতে সুরের আবেগে এটা বোঝাতে পারবি যে, আঝা, এটা কি হলো! আবার চড়াই উতরাই ভালো লাগলে তুই গা থেকে সা তে এসে আবার গাতে ফিরে গিয়ে দেখ। ওকে আরও বললাম, সোনামনি, প্রথম যে সুরটাতে তুই সঙ্গত করছিস তাতে আছে শুধু মায়া আর দুঃখ। অধিকার খাটানোটাও শিখে নে না কেন এই মওকায়! বৈচিত্রের শিক্ষাও তো কিছু জুটবে তোর! এই বলে আমি ওকে দু একবার লেসনগুলো করেও দেখালাম! কিন্তু ততক্ষণে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। আমি দেখি, কান্নার ফলে নাক ভরে যাওয়া সর্দির ভেতরে ডান হাতের তর্জনি চালিয়ে দিয়ে ও আমার দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। কান্নার সুর আমার কানে আর আসেনি।

বেতঙ, ইয়ালা, থাইল্যান্ড। ০৯০৭২০১৬

আ লেটার টু আন আমোরাস

১৫১১২০১৫

রাত সাড়ে দশটা, থাইল্যান্ড।

ভৈরব,

আজ ক’দিন ধরে খুব মনে পড়ছে তোমার কথা। তোমাকে বিদায় জানিয়ে যখন চলে এলাম, ভেবেছিলাম অনেক দিনের গভির সম্পর্কে ছেদ হবে না, বিচ্ছেদ তো নয়ই। দূরে থাকলেও তোমার অস্তিত্ব ও স্মৃতি সচল থাকবে মনে, তা থেকে বেচে থাকবার রসদ আমি পাবো। তোমাকে ছেড়ে জীবন কাটাবার অন্য উপায়গুলো যখন আমি বেছে নেই, তখনও ভাবি তোমার পরশ না পাই এখন, কিন্তু তুমি ছিলে – এই ভাবনা-ই আমাকে নতুন করে বাচাবে। এই সমাজে যা বললে সতি বোঝায়, তেমন রমনি আমার কোনওকালে প্রয়োজন ছিলো না, কিন্তু তোমার সঙ্গে বসবাসের কারনে রহস্যময় ও একই সঙ্গে দুর্ভোধ্য এক জীবন তুমি আমাকে দিয়েছো। আমার ঘুম ভাঙে, অথবা আমি ঘুমিয়ে যাই, কিন্তু তুমি জেগে থাকো সে আমি জানি। আর আমার জীবনে ঘুম ও জাগরনের মাঝ বরাবর একটি সরলরেখায় তোমার অবস্থান। অর্থাৎ তুমি আমার কে? এই প্রশ্নের এখন আর কোনও উত্তর হয় না। উত্তর জানা যায় না। আমি জানি না মানসিকভাবে প্রচন্ড বোহেমিয়ান এই জীবনের তোমার কাছে কি দাম আছে। কিন্তু তুমি আমার কাছে সতি হয়ে থাকার চেয়ে অনেক উপরে বাস করো। তোমার মন যুগিয়ে চলতে পারিনি সত্য, কিন্তু তোমার কাছে ছুটে গেছি অকাতরে, কি এক অজানা ইর্ষায় আর সব কিছুকে আমি তোমার থেকে দূরে রাখতে চেয়েছি, পাগলামি সত্ত্বেও চেয়েছি। তা সম্ভব নয় জেনেও চেয়েছি।

তোমার নির্জন শরিরে বাসা বেধেছে যেনো বহমান কুমারির মন, তাতে আমার সাধ ও আহলাদ দুটোই তোমার পুরন করতে হতো সে সময়, যখন তোমার পাশে থেকে আমি আমার জীবনকে নতুন আনন্দে ভরিয়ে তুলেছি। মদের পেয়ালা হাতে নিয়ে কামাতুরের চোখ নিয়ে তোমাকে দেখিনি আমি, কিন্তু আজ কেন এক উত্তুঙ্গ নেশায় তোমার প্রতি আমার মনের ভেতরে এমন খেলা চলতে শুরু করলো? কি এক অসিম নেশায় আমার ইচ্ছে করছে ছুটে যাই এন্ফুনই! স্মৃতির পাতা থেকে নেয়া সবটুকুর সঙ্গে আমার একাত্মতাও আজ আমাকে দমাতে পারছে না। এ কি ছেদ? দৃশ্যমান জগতে এই ভাবের কোনও মানে হয় না। এই আবেগের কোনও দাম নেই জানি। কিন্তু আমার মনের গহিনে তোমাকে না পাওয়ার যে বেদনা আমার ভারি করে তুলেছে, তাকে আমি কেমন করে সান্তনা দেই? আমি বাস্তব থেকে নিরাশ নই, কিন্তু আমি তো আছন্নও! আমি আমার আত্ম-এ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি তোমার কথা ভেবে। একটি বহির্মুখি জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া সামাজিক আচারের হই-হল্লা থেকে বের হয়ে যত আমি অসামাজিক হয়ে গেছি, আমি তত যেনো তোমার প্রতি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়েছি। নিন্দুকেরা আমায় কি বলবে জানিনা। নিন্দুকেরা বলতে ছাড়ে না, তাই নিন্দুকের কথায় আমি ভাবিনা। কিন্তু তোমার থেকে দূরে আসার পরিকল্পনার কথা আমাকে বদলে দেয়, তোমার থেকে দূরে সরে আসা আমার সত্ত্বাকে আহত

করে। তাই এখন খুব কস্টো পাচ্ছি। আমার অনুভূতি আমাকে অন্য কোনও এক স্তরে নিয়ে গেছে তোমার কারণে। আমাকে যে সময় তুমি দিয়েছো একান্তে, তার কোনও তুলনা হয় না।

হে ভৈরব, আমার ভেতরে কি যেনো একটা শক্তির খেলা চলছে। এর প্রভাবে আমি সারাদিন যা-ই কিছু ভাবি চোখের সামনে সবুজ গ্রাম, কাচা রাস্তা, ঘাস, চিঙড়ির ঘেরের পাশ দিয়ে জোয়ার-ভাটা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়া খালের পাশে কেওড়া কাছের বিথারের মধ্য দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তা, খালি পায়ে ঘাসের উপরে হাটলে পায়ে লেগে যাওয়া শিশির, এগুলো পেরিয়ে এসে তোমার কথা আজ বড়ো বেশি মনে পড়ছে। এরা আমাকে ডোমিনেট করেছে। তুমি তার চেয়ে বেশি। আজ রুমাল ভাবলে বেড়াল হয়ে যাচ্ছে। আমি কেমনে পাবো তারে – লালন সাই এই গান গেয়ে কাকে খুজতেন? অমূল্য নিধিকে পাওয়ার তাড়না থাকে সাধকের, আমার তাড়না হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের ওই সবুজের প্রান্তর। কিছুতেই ইট দিয়ে বাধা খড়খড়ে আধুনিকতা আমাকে ভাবালু করছে না। অর্থাৎ আমি আধুনিকতার মধ্যে বাস করে যাকে অধরা মনে করি, তা ধরা দেয় আমার মনে। আমার মনেই এদের বসবাস। ফলে আমার দেহ কেমন করে এই ঠুনকো আধুনিকতায় মজে যাবে হে প্রবহমান স্রোতধারা? যা প্রাপ্ত হয় না, তার প্রতি আকর্ষণ দুর্নিবার। তাই তো তোমাকে এতো কাছে ডাকা। কাছে পাবার তির কামনা।

আমি সবার মাঝে থেকেও একা হে ভৈরব। তার কারন আমার আশেপাশের সবাই আধুনিকতার মানে বুঝে গেছে। আমি এখনও এতটুকু শিক্ষাপ্রাপ্ত হইনি। আধুনিকতার নবতর সঙ্কল্পের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়নি, অর্থাৎ তাড়না নেই বলে আমার চিন্তায় এই ইট-পাথরের দেয়াল কখনও প্রভাব বিস্তার করে না। কে যেনো বলেছিলেন, চিনুয়া আচেবে নাকি ইঙরেজিতে ভাবতে পারতেন। আমার কাছে এই মন্তব্য বাড়াবাড়ি মনে হয়েছে। যা হোক এ কথা হয়ত রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছিলো। যিনি বলেছেন তিনি জানেন। মাতৃভাষায় ছাড়া অন্য কারও ভাষায় ভাবা যায় কি না আমার জানা নেই। কিন্তু ভাবনার অলিগলি যে সবুজ আর কাচা মাটি ভেদ করে একটু জাতে উঠতে পারছে না এইটা-ই আশ্চর্যবোধক। ভাবনা যে তোমার জোয়ারের জলে শুশুকের নাচন, আর ভাটায় ডগরা আর চেমো মাছের ছটফটানি থেকে বেরোতে পারছে না, এইটা-ই অবাক করার। এ কি প্রেম? তবু ভালো, মনটা কানা হয়ে ছিলো, এখন চোখ চাইলেও দেখতে পারে না, কিন্তু তৃতীয় নয়নের দরজা খুলে গেছে। শুধুই দেশ দেখে – সবুজ, ভৈরব তুমি, কাচা রাস্তা...

হে ভৈরব, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না তো? সেই জলের আদি নাচন কি আর আছে বাংলাদেশ? এত সবুজ কি আর দেখতে পাওয়া যায় সোনার দেশে? সবুজের দেশ বলেই জেনে আসা মাতৃভূমির সবুজকে কারা যেনো পেদিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। কারা আবার? এই আমরাই তো! আমরাই তোমাকে ও তোমার সহদরার উদর পূর্ণ করেছি বিষে, সবুজ সবুজ করে পুরো দেশকে জাতে তুলেছি শুধু মুখে মুখে। সবুজ করে রাখিনি, রবিঠাকুরের খেদের মত – রেখেছো বাঙালি করে, মানুষ করোনি ... ইত্যাদি দুঃখের কথা শুনিye তোমাকেও আহত করছি জানি। কিন্তু আমার অসহায়ত্বের কথাও তুমি জানো বলেই তোমাকেই বলার মতন সখি করেছি হে ভৈরব।

আমি ভালোবাসি তোমার উপর দিয়ে উত্তর দিকে চলে যাওয়া মেঘ, ভালোবাসি তোমার কোল ছুয়ে থাকা গোলপাতার বন, ভালোবাসি তোমার বুকের উপরে প্রতিচ্ছবি হয়ে জেগে ওঠা সন্দের রূপোলি

চাদ, চাদের সঙ্গে খেলতে থাকা দুস্ট্র টেউয়ে প্রানে জোয়ার এলে তখন আমি শক্তিমত্ত হয়ে, পুনর্বীর আসার তাগিদ অনুভব করে ঘরে ফিরে যেতাম ভালোবাসাটুকু নিয়ে। আমার বাধ না মানা সে ভালোবাসা আমাকে অনুপ্রানিত করেছে আজীবন, তোমাকে পাবার নিবিড় আকাজ্জায় নিভৃত প্রার্থনায় বসেও তোমার অমরত্ব কামনার নিদারুণ সুরে সিক্ত হয়েছি আমি। আমার প্রানের বেদনাসিক্ত এই আকুতি তোমার মহত্ত্বের উজ্জলতায় ভরে থাকুক সব সময়, এই কামনা করে গেছি। গোলপাতার কুন্তলদাম, কেওড়ার ডালের সঙ্গে তোমার সখ্যকে কখনও আমি ইর্ষা করিনি, আমিও যোগ দিয়েছিই সেই আনন্দ নৃত্যে। সে দিন আজ কোথায়! জলের উপরে নুয়ে যাওয়া ডালের সঙ্গে তোমার জোয়ারের যৌবন যখন খেলা করে, তখন কি এক রাগিনির বিচিত্রতম সুর তৈরি হয়, সেই সুরে আমিও মগ্ন চিতে নিজের যে টুকু সুরের আবহ যা পারি তা দিয়ে তোমাকে নিবিড় আলিঙ্গনে আরও কাছে ডাকতাম। আজ সে দিন কোথায়! তোমার উদ্যম শরিরে জলের নৃত্যে আমার মনের অবগাহনের বিচিত্রতার সঙ্গে তুলনা হয় তেমন কিছু তো পাইনি কোনওদিন! আজ সে দিন কোথায়! অন্তশব্দে আজ শুধু আওড়াই – ‘স্বতত হে নদ তুমি পড়ো মোর মনে, স্বতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে।’ আজ অনুভব করি, কি গভীর বেথায় মাইকেল এই কবিতা লিখেছিলেন! অতিব দুঃখে আমায়ও তখন কবিতারা পায়।

তুমিও কি বোঝো না কিছু তার?

তুমিও কি জানো না,

কি বেথায় কেদে কেদে মরে এ প্রান,

কি দশা ভাগ্যলিপিটার?

তুমিও কি অজুত আকিঞ্চনে,

পারো না নিতে আরও ডেকে কাছে

আর কারে পাবো এই ত্রিভুবনে?

তোমার বুকের পরে যে চুমুর দাগ রয়ে গেছে

জলে ধুয়ে আরও যেনো সোনা রঙ

ভোরের রাগের ধনিটারে বেছে বেছে

তোমাকেই করে গেছি শত কামনা,

তাতে জেনো বেড়ে গেছে আরও যাতনা।

তোমায় যে ভুলিবার নহে,

এ পাগলে, ভবঘুরে কহে।

সহস্র যাতনার কেন বিরহ,

এত দূরে কেন আজ কহো মোরে কহো।

এ কবিতা নয়। আমি কবিতা জানি না হে নদ! আমি শুধু চিনি তোমারে। আমার জন্মভূমির কাছাকাছি তোমার প্রায়-মৃত শরিরে আবার জীবন দান করে যেতে পারলেই সে ছিলো আমার সুখ। নইলে বেথা কমে যাবে এমন দাওয়া আর কোথাও নেই। এই দূরত্বের বেদনাও তখন যাবো ভুলে। কিন্তু পাষন্ডের শক্ত ও মোটা দেয়াল ভেদ করে আমার মত নাদান প্রেমিকে তোমার জন্য কিছু করে, কোথায় তার সম্ভাবনা? তোমার চারিদিকে ঘিরে হয়েছে অজস্র হায়েনার দল। তোমার শরিরের রক্ত শুষে নিয়ে নিজেরা পুষ্ট হবে এই তাদের খেয়াল। যা কিছু প্রাকৃতিক, যা কিছু স্বাভাবিক তাকে সে ভাবে দেখতে

এই সব পাষন্ডের দলের অনেক আপত্তি। তাই এরা নির্বিচারে গাছ কাটে, নদীর মুখ বন্ধ করে দেয়, কারখানার ময়লা তোমার শরিরে নিক্ষেপ করে, নদী দখল করে অট্টালিকা বানায়। পৃথিবির যা কিছু সুন্দর, যা কিছু কমনিয়, মমতাময়, তাকে নস্টো করে ভ্রষ্টো স্বার্থের জন্য পৃথিবিকে করে তোলে বাসের অযোগ্য। তুমি এমন একটা অশান্ত, বিরূপ সময়ে এসে পড়েছো হে প্রিয়তম।

ক্ষমা করে দিও আমার অপারগতা।

মেনে নিও পৃথিবির উল্লাস,
জীবন সাজ হবে জানি, যারা নেয় শ্বাস
তারাও জানে তবু কিছুতেই হয়না বিশ্বাস
তারা আলো দেবে এতটুকু এই আধারে,
আমারও কিছু শক্তি নেই
উড়িয়ে দিই জ্বালিয়ে দিই সব বাধারে।

ইতি

তোমার বন্ধু

আ ডেডলি লেটার

রাত ১ টা ২১ মিনিট

২১ মে, ২০১৬

থাইল্যান্ড

টুনি,

রাত বড়ো নির্জন, তার চেয়ে বেশি নির্দয়। কিন্তু না, ঠিক মৃত্যুভয় না। তবে একা ঘরে পচে, গলে মরে পড়ে থাকবো, বেপারটা অন্যদের জন্যও অস্বস্তিকর। এখন কিছু হয়ে গেলে কেউ জানতে পারবে না। দুই-তিনদিন ছুটি আছে। সবাই চলে গেছে বিরাট আকারের এই অট্টালিকা ছেড়ে। ছুটি ফুরোলে, ওদের ছুটির গল্প শুরু হবে, অর্থাৎ এখানে চলে আসবে, আবার বন্ধুত্ব, আবার অফিস, আবার কাজ, আবার গল্প – গালগল্প – ছুটির গল্প। অর্থাৎ সারি সারি পর্বতশৃঙ্গের পাশের ঘন বনের গায়ে এই যে বৃহত দালান, তাতে আমি বলতে পারো একা। আজ কেউ নেই। অন্ধকারে আমার ভিষন ভয়, আমি ভুতে বিশ্বাস করিনি, কিন্তু ভুতের ভয়ে আধারে একা বেরও হতে পারিনি, মানবমনের কেমন এক জটিল রসায়ন এ! তাই আমার ঘরের আলো জ্বেলে রেখেছি আজ। কিন্তু তাতে কি মনের ভেতরের আশঙ্কার

সুরাহা হয়? কিন্তু না, আজ ভুতের ভয়ে আমি এই চিঠি লিখছি এটা ভেবোনা। এটা তোমাকে লেখা আমার প্রথম চিঠি। আজ শেষ চিঠিও যে হবে না এটা, কে বলতে পারে? হতে পারে এটি একটি অসম্পূর্ণ চিঠি! কে জানে! ঘরের মধ্যে পচে গলে মরার চেয়ে কাউকে জানানো ভালো। কাকে জানাবো? কেউ তো নেই! তবুও আমি আজ মানুষ খুজতে বেরিয়েছিলাম এই গভির রাতে। আমি জানি সুপার কম্পিউটার ল্যাবের নিচে একটা রুমে পদার্থবিদ্যার কয়টা ছেলে-মেয়ে রাত জেগে কাজ করতো। আজ তারা আছে কি না কে জানে। তবুও আমি যাই এই আশায় যে, আমার কিছু হয়ে গেলে তোমাদের বা আমার এখানের পরিচিত কাউকে যেনো একটা খবর দিতে পারে। অর্থাৎ সত্যিই আজ যেনো আমার মনে হচ্ছে হতপিণ্ডটা বিশ্বাসঘাতক হবে। নইলে কে আর এমন বৃষ্টিভেজা রাতে মটরসাইকেল নিয়ে একাকি বের হয়! সাধ করেও তো যেতো না আমার মত বোহেমিয়ান আজ রাতে! বারান্দায় দাড়িয়ে আজ রাতে বৃষ্টির পতন দেখা, বৃষ্টির শব্দ কানে নেয়া, চোখ বন্ধ করে বৃষ্টির শব্দকে সপ্তকের সুরের কোথাও বাধা, গুনগুন করা, দু-একটা কবিতার লাইন লিখতে চেষ্টা করা, রবি ঠাকুরের কিম্বা নজরুলের কবিতা আবৃত্তি তো নয় পড়া, দূরের কালো পর্বতশ্রেণির দিকে তাকিয়ে নিজের অসম্ভব ক্ষুদ্রতাকে কল্পনা করা – এই হতো আজকের আমার কাজ। কিন্তু দেখো, বের হতে হচ্ছে!

জীবনে এখনতক অজ্ঞান হইনি, হাসপাতালে ভর্তি হইনি কোনওকালে, বড়ো কোনও রোগ আজও আমাকে গ্রহন করেনি, তাই কি আজ একেবারে প্রথম চোটেই ভবলিলা সাজ হবে আমার? বাচাটা দুরাশা জানি, বেচে থাকাটা ভাগ্যের জানি, কিন্তু কেমন করে বেচে আছি আমরা সবাই, আমরা পৃথিবির মানুষ, বাঙলাদেশের মানুষ, খুলনার মানুষ, বাগেরহাটের মানুষ, ফকিরহাটের মানুষ, সাতশৈয়া - আমার গ্রামের মানুষ, সে জানি না। মানুষের বেচে থাকার অধিকারটা কেড়ে নেয়া হচ্ছে টুনি। গুটিকতক মানুষ নিজেদেরকেই সর্বসর্বা ভাবছে, ত্রাতা ভাবছে। ভূমিকাটা ত্রাতার সন্দেহ নেই, কর্মটা যমের।

যাক গে, তবু বলা যায় না, আজ রাতে ঘটনাটা ঘটে যেতে পারে। এমন তামাশা অসম্ভব নয়। বিড়ি টানলাম না, মদ খেলাম না, কিন্তু এখন যদি হতপিণ্ডটা বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে তা কিন্তু পাস্তুরাইজেশনের মত! তোমাকে শিখিয়েছিলাম সে জিনিসটা কি, মনে পড়ছে? আর খাদ্য-খাবার? হ হা হা। খেয়ে না খেয়েই তো কাটলো জীবন! না, তাতে আমার আফসোস নেই বিন্দুমাত্র। এশিয়া ও আফ্রিকা নামক পৃথিবির কোটি কোটি মানুষের মত খাবারের অভাব আমার ছিলো না। কিন্তু জীবনে তিন-বেলা নিয়ম করে খাবার আমি কয়দিন খেয়েছি বলতে পারো? তিনবেলা খাওয়াটা খুব যে জরুরি, তা কিন্তু নয়। বেচে থাকবার জন্য তো নয়ই। নইলে কেমন করে বাচে বাঙলাদেশের ক্ষুধার্ত মানুষ গুলো, ভারতের ষাট কোটি দরিদ্র মানুষ, আফ্রিকার মিলিয়ন মিলিয়ন হতভাগারা? অতএব কি খেলাম, তা নিয়ে আমার আফসোস নেই। সত্যিই নেই, একেবারেই নেই। আহা, ওই খাবারটা যদি একদিন খেতে পারতাম – এই ধরনের আফসোসও তো কোনওকালে করিনি আমি। হুম, গ্রামের বিল থেকে তোলা কলমি-কচু শাকটা, বাগানের-ক্ষেতের ঘিয়ে শাক – ভাইতো শাকটা, পুকুরের শাপলা, ধনিয়াপাতা দিয়ে হালকা রান্না করা কম ঝাল-তেল-মশলার অতি সাধারণ কোনও তরকারি, সরিষার তেল দিয়ে রান্না অনন্যর হাতের লাউপাতা ও শোলমাছ, আমার ডাল, তোমার লাল শাক-ঢেরস ভাজি, উঠোনের পেপে গাছটা থেকে পাড়া পেপে ভর্তা, আমাদের মাঠে জন্মানো মুসরের ডালের ভর্তা, আর দুটো ভাত খেতে আমার দারুণ ইচ্ছে করে। ইচ্ছেটা কিন্তু বেশিই হয়ে গেলো এখন। একে যদি বিলাস বলো, তবে বলো। কিন্তু আমি কৃষক-শ্রমিকেরা বেচে থাকবার জন্য যেটুকু খাবারের প্রত্যাশা করে, তার

বেশি কি কিছু বলেছি? আহা, সবাই যদি খেতে পারতো দেশে! আমার চেয়ে কেউ মনে হয় বেশি সুখি হতো না। খেতে পায় না কেউ, এটা ভাবতেই পারি না টুনি, চোখ সামলানো, মেজাজ ধরে রাখা কঠিন হয়ে যায়।

আমাকে আসলে একাকিত্বের রোগে পেয়েছে। আমার বন্ধু ছিলো না কেউ। নাহ! আমি একটা জিনিস খুব করে চেয়েছি জীবনে। একজন খাটি বন্ধু, একেবারে জিগার কা দোস্তু। আছে না, মানুষের কত কত ঘুরে বেড়ানো, আড্ডা দেয়া, কফি খাওয়া বন্ধু? না, এ সব আমার দরকার ছিলো না, আজও নেই। চাকফি খাই বছরে এক দুই পেয়ালা, তার জন্য বন্ধুর কি প্রয়োজন? কিন্তু আমি চেয়েছিলাম একজন প্রকৃত অর্থাৎ অকৃত্রিম বন্ধু। সে বন্ধুত্বে প্রগাঢ় অনুভব আছে, প্রতি মুহূর্তের অনুভবে জীবনে সেই বন্ধুত্ব এনে দেবে অনাবিল শান্তি, যার সঙ্গে খুনসুটি আছে, ঝগড়া আছে, বৈরি নেই। যার সঙ্গে বিতর্ক আছে, তর্ক নেই, তাই রাগ নেই। কিন্তু না। বন্ধুত্ব করা আমার হলো না। কেউ আমাকে বন্ধুই ভাবলো না! ‘হ্যালো ফ্রেন্ড’ পেটার্নের ছাদামার্কি বন্ধুত্বে আমার কোনও ইচ্ছে নেই আগেই বলেছি। আমি মাত্র একজন বন্ধুই চেয়েছি। মানুষের সব চাওয়া পূর্ণ হবে এটা কিছুতেই হতে পারে না।

আজ যদি বেচে যাই, তবে বুঝবো যে একা থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। যদি মরে যাই, তবে বুঝবে যে আমার হৃৎপিণ্ডটা বদমাস। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যে হৃদয় থাকে বলে আমরা কল্পনা করি, সেটা অনেকের সঙ্গেই বদমাসি করেছে এই নোঙরা জীবনে বলে সবাই ভাবে। আমিও অনেকটা স্বিকার করি দিধাহিন। কিন্তু আমি একেবারে, মানে পুরোপুরি নস্টো স্বভাবের মানুষ না, এটা জেনো। আমি ভালো, এই দাবি করার মত কোনও ইচ্ছে আমার নেই। কারন আমি জানি আমি তা নই। আমি অতিমাত্রায় ক্ষুদ্র, কিন্তু অতিমাত্রার নিচ নই, আমি হিন, কিন্তু অতিমাত্রায় হিন স্বভাবের নই। আজ এ সব ভাবছি, আর বলতে পারছি, কারন, *আজ রাতে আমার দির্ঘশ্বাস ভেসে যাবে পথের বাতাসে*, যদি সত্যিই ভেসে যাই আজ? একাকিত্বকে কোনওদিন পরোয়া করিনি আমি। আমার প্রেম, আমার গান, আমার কবিতা, আমার ভবঘুরেপনা আমাকে একা থাকতে দিলে তো?

যদি মরি, ক্ষমা করে দিও। তোমাকে বিয়ে করেছিলাম তোমাকে সত্যিকারের সুখি করবো বলেই। সেটা পারিনি সত্য, কিন্তু মন থেকেই চেয়েছিলাম, এটা মিথ্যে নয়। কিন্তু মানুষের সব চাওয়া পূর্ণ হয়? হয় না। তবে বউ ভাগ্য আমার সে’রম। তোমার মত স্ত্রী পাওয়া জগতে সৌভাগ্যের বেপার। সবার এমন জোটেনা। আজ আমি না থাকলে অবশ্য তোমার আজ মেজাজ খারাপ করার কেউ থাকবেনা। তোমার এটুকুতেই আমার যত আপত্তি ছিলো। কিন্তু সুন্দরি মহিলারা একটু মেজাজ করে থাকেন, এটা আমার বোঝা উচিত, আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারিনা। সঙসারের তো নয়ই। আমি কিন্তু সুখি মানুষ! অজুত পরিমাণ দুঃখ থাকলেও সুখটা আমার আছে, সেটা তোমার জন্য হয়ত। কিন্তু প্রেক্ষাপট যখন তোমার, তখন আমার শুধু জানতে ইচ্ছে করে, আমার সঙ্গে ঘর তুমি কেমন করে করলে? সেটা ভেবে বড়ো বিস্ময় আসে মনে। আমার এখন শুধু মনে হয়, তোমার ওই মেজাজটাই হলো আমাদের ঘরের বৈচিত্র্য। ওটা না থাকলেও জীবন ম্যাডমেডে। হুম, আমি সব সময় বৈচিত্র্যের সন্ধান করেছি, সেটা আমার মত করেই, তোমাকেও অবহেলা করেছি বিস্তর।

আমি মরে যাওয়ার অর্থ এই পৃথিবির কিছুই না। পৃথিবী নির্দয় ও বিকারহীন। আমার জন্য আরও সত্য। আমি আসলে কিট টুনি। কিন্তু তবুও কেন জানি মনে হয়, তুমি হয়ত বেশ বিপদে পড়ে যাবে। তোমার উদরের শিশুটির জন্য পৃথিবীতে স্নেহ-মমতার কিছুটা হলেও কমে যাবে, সেটা আর একটা চিন্তাও বটে! তাতে কি? জীবনে অনেক কষ্টটাকে উতরে গেছো তুমি। আমাকে ছাড়াও পারবে, পেরে যাবে। তুমি আসলে খুব দরিদ্র একজন মানুষকে বিয়ে করেছো। চাইলেই পৃথিবীর তাবত সাধ ও আহলাদ শয়ে শয়ে পূর্ণ করতে পারতে তুমি। জীবন সাজাবার সব উপকরণই তোমার হাতে ধরা দিতো। তুমিই হেলা করেছো। তুমি ছাড়াও আঝা আম্মা কিছুটা কস্টে পড়ে যাবেন। হুম, সৃষ্টিকর্তা মহান এবং সুবিচারক বলে এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় যে, জগত সন্তসারের সুব্যবস্থার নিশ্চয়তা তিনিই করে দেবেন। এটা-ই পৃথিবীর নিয়ম। আমি আসলে খুবই ব্যর্থ। ধরো আজ যদি মরি, এর অর্থ হেলা পৃথিবীর প্রতি আমার দায়িত্বের একেবারে কিছুই আমি পালন না করেই বিদেয় হলাম। আমার প্রানের চেয়ে প্রিয় শিক্ষকেরা, আঝা-আম্মা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশি কারও জন্যই আজতক কিছুই করিনি আমি, কিছুই না। ফালতু জীবন আমার। মামুন কাকার জন্য কিছু করা দরকার ছিলো। হুইল-চেয়ারগুলো কি ভালো আছে তার? তাকে গাড়িতে করে মঙলা, ষাটগুন্জ মসজিদ, নদির পাড়, বনের ধারে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেছিলাম। কোথায় আমি, কোথায় আমার গাড়ি! একটা মানুষের পঞ্চাশ বছরের জীবন শুধু বারান্দায় বসে কেটে যাবে, এটা সহ্য করা যায় না। যাক, আম্মা আর তমা তাকে নিয়ে অটো-রিক্সা করে বাগেরহাট শহর, ষাট-গুন্জ মসজিদ, খাঞ্জেলি দিঘি, ঘোড়া দিঘি দেখিয়ে এনেছে বলে কিছুটা স্বস্তি পাচ্ছি। হামিদ ভাই কি করছে? কাজ আছে তার? খেতে পাচ্ছে তো ঠিক মত? চেস্টা তো কম করলো না জীবনে, কিন্তু উঠতেই পারলো না। মোল্লা হামিদের মত আরও কত মানুষের জন্য কত কাজ পড়ে আছে টুনি! করতে পারবো না জানি। অসম্ভব জেনেই প্রতিনিয়ত মরতে থাকি আমি। আমি ভিরুদের মত মরি না টুনি, আমি মরি অসহায়ের মত, প্রতিদিন। কারও জন্য কিছু করতে না পারার আফসোস আমাকে প্রতিদিন হত্যা করে। আমার ও আমাদের অসম্ভবতা সিমা ছাড়িয়ে গেছে। পাতকেরা সব অধিকার কেড়ে নিয়েছে। এখন হামিদ মোল্লাদের মত, মামুন কাকা, রাশেদ কাকাদের মত নির্জীব হয়ে গেছে বাঙলাদেশ। এক সময় রাশেদ কাকার জমির খাবার খেতো গ্রামের মানুষ, আর এখন? হাহাহা, পৃথিবীটাকে আমরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছি দেখেছো? বলতে পারো কেন এমন হয়?

বিড়ালগুলোর জন্য কাদবে না। কেন ভাবো যে তুমি আর আমি যে ভালোবাসা দিয়েছিলাম ওদের, অন্য সবাই তাই দেবে? আম্মা যত্ন করেছেন সেটা বিশ্বাস ক'রো। কিন্তু যুভি, কিটি, তুতু (রাহুল), লিলা, খেলা, বেলা তো আমাদের! আমরা ওদের পাবো টুনি, নিশ্চয় আবার দেখা হবে ওদের সঙ্গে অন্য কোনও জীবনে, অন্য কোনওখানে। ওরা দেখো আমাদের সঙ্গেই থাকবে সেদিন। কিটির পেশাবের সঙ্গে রক্ত যাওয়া বন্ধ হবে না টুনি। চারতলার বাসা থেকে পড়ে ওর মেরুদন্ডের হাড় চিরতরে ভেঙে গেছে যে! খেয়াল করে দেখবে যে ওটা কিডনির ওইদিকটাতেই। এমন সুন্দরি বিড়াল কোনওদিন দেখিনি আমি,

হয়ত তুমিও। মন খারাপের কিছু নেই, কিন্তু তবুও আমার চোখের বাধ আজও কেন ভাঙে যাচ্ছে আমি জানি না। কিন্তু তোমাকে তো শক্ত হতে হবে! আজ যুভি নেই, তুতু পরপারে, কিটি মৃত্যুর অপেক্ষা করছে, তাতে কি? জীবনের সঙ্গে দুঃখকে সম্বন্ধ করেছে, সে দুঃখ যদি পাও, তবে তার জন্য অভিযোগ কেন? আমার কুকুরটার কথা তোমার মনে নেই? অন্য আর এক বাড়ি থেকে এসেছিলো সেই কুকুর। সে বাড়ি তুমি চেনো, তুমি তাদের সব জানো। বিশেষ করে রুমাকে তুমি খুব ভালো করে চেনো। অদেখা, অথচ তার প্রতি তোমার এক ধরনের সম্মানমিশ্রিত মমত্ববোধ আমার কাছে তোমার সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুন। এ কুকুর তার। সে ছাড়াও ঘর ভরা এক ঝাক সুন্দর মনের মানুষের বাস সেখানে। না, স্বভাবতই তাই সেখানে আদর-যত্নের কোনও কমতি ছিলো না। কিন্তু তবুও কেন এসেছিলো সেটা অনেক বড়ো রকমের রহস্য। সেই বাড়ির ‘সম্রাট’ নামের কুকুর দেড়-দুই মাইল ঠেঙিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে হয়ে গেলো ‘লিও’। কিন্তু কেন এলো সে? এর উত্তর কে দেবে? কিন্তু লিওকে দেখো একদিন রাস্তার মুখ-বিবেকহীন একজন গাড়ি চালক চাপা দিয়ে দিলো! কি করবে তুমি? আমাদের কিস্যু করার নেই। অতএব তোমার বাচ্চাদের জন্য দুঃখ করো’না।

আমার লেখা কেউ পড়ে না, এটা নিয়ে আমার দুঃখ কিম্বা আফসোস কোনওটা-ই নেই। আমি লেখক নই, কবি নই। আমি লিখি আমার নিজের জন্য প্রথমত। কিন্তু দেশ অপ-লেখকে ভরে গেছে টুনি। নোঙরামি ছাড়া সে সব লেখায় আর কিছুই পাওয়া যায় না। তাদের মধ্যেও তো অনেকে কত নাম করে! ফলে দুঃখ কিসের? নস্টামি করে নাম করার মত রুচি এখনও হয়নি। আজ যদি আমার কিছু হয়ে যায়, কেউ যদি আমার লেখা পড়ে তো পড়ুক। না পড়লেও ক্ষতি নেই। আমি মহান লেখকদের দলভুক্ত নই। সে যোগ্যতার বিন্দুমাত্রও আমার নেই। আমি অনেক সময় এ কথাটা বলেছি, আবারও বলছি, মহত্ব নামের যদি কোনও ঘর থাকে, সে ঘরের চৌকাঠ তো ছার, আমি হলাম, সেই ঘরে সামনের উঠোন পেরিয়ে মেঠো পথ বেয়ে যাওয়া বহুদূরের এক নর্দমা কিম্বা ডোবার মধ্যে জন্ম নেয়া একটা কচু গাছের ভেঙে পড়া নিচের পচা দুর্গন্ধযুক্ত ডাটি। মহত্বের ঘরের সুবাস আমি কেমন করে পাবো? কিন্তু বইগুলো পড়ে থাকবে আমার গ্রামের ঘরের তাকে। ধুলো পড়ুক, জমে যাক। এরা আশেপাশের আরও কিছু বইয়ের দ্বান তো পাবে! তলপুয়, রবিন্দ্রনাথ, নজরুল, মুজতবা আলি, যাযাবরসহ অনেক মহান লেখকদের বইয়ের সান্নিধ্য যদি পায় আমার বই, এটা কত ভালো হবে ভেবে দেখো! তবুও স্মরণসভার মত ভন্ডামি যেনো আমাকে নিয়ে না হয়। লোকে অবশ্য এত বোকা নয়, আর আমি তো অতি অবশ্যই ততখানি গুরুত্বপূর্ণ নই কিছুতেই, তবুও কথাটা বলে রাখছি তোমাকে।

যদি মরি আজ রাতে, তাতে আমার যতখানি সুবিধা, তোমার ততখানি অসুবিধা। আব্বা-আম্মা, তোমাদের দোয়ায় পার হয়ে যাবো আশা করি। মহান সৃষ্টিকর্তার রাহমান, রহিম, গাফফার নামগুলোর প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব বেশি। কিন্তু তোমাকে আল্লাহ সম্ভবত পোড়াতে চান এই পৃথিবিতে, এটা ভাববো। অর্থাৎ মুক্তি তোমার জন্যও। তবে এটা বিশ্বাস ক’রো

যে, জীবন তোমার জন্য যতখানি সহনীয়, খোদা তার চেয়ে বেশি ভার দেবেন না। সুতরাং ভাবনা কি? শুধু একটা বিষয়েই বড়ো কষ্টে হচ্ছে যে, তোমাদের জন্য কিছুই রেখে যেতে পারলাম না অন্ধকারের মত এক গাদা দুঃখ ছাড়া। আচ্ছা আমি কি সত্যিই আজ মরে যাচ্ছি? জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে থাকা পর্দার এপাশ অপাশ করা যায় না, একবারই আসা, একবারই যাওয়া, মায়াবি সেই পর্দাটা আজ দুলছে কি? জীবনকে সঞ্জ্ঞা দিয়ে একটা ফ্রেমে বাধা যায় না। তুমি যতই বুঝতে চাইবে, জীবন ততই ধোয়ার মত, কুয়াশার মত, মরিচিকার মত।

আমি তোমাকে নিয়ে তেমন কিছু লিখিনি। নর-নারির প্রেম বিষয়ক লেখাটা আসলে আমার জায়গা নয় টুনি। আমি প্রেমে পড়ি, প্রেম করি, কিন্তু বানিয়ে বানিয়ে নর-নারির রগরগে প্রেমের উদ্ভট ঘটনা আমি আওড়াই না, অমন গল্প আমি লিখি না, লিখতে চাইনি বলেই লিখিনি, লিখিনা। কিন্তু বিরাট এক হৃদের পাড়ে বসে একটা ছড়া লিখেছিলাম তোমাকে উদ্দেশ্য করেই। ছড়াটা পড়ে নিও –

একটুখানি থাকতে যদি মাতৃকামন দূর ঠেলে
অনেক কিছুই দেখতে পেতে এই পৃথিবির সুর খেলে।
বন্ধ ঘরের অন্ধ দুয়ার আতুর যখন চাই তোমার
হৃদয় আমার আতর ছেপে কাদতে থাকে জল ঢেলে।

আমার গন্ডির আয়তন কম। এর মধ্যেই আমাকে অনেক লোকে ঘৃণা করে, অল্প লোকে ভালোবাসে। আর যারা ভালোবাসে তারা দস্তুর মত বাসে, ঘৃণাটাও ওই রকম, অত্যন্ত হিনভাবে। কিন্তু সবাই যার যার মত করেই ভালোবাসে। পৃথিবিতে কত রকমের ভালোবাসা হয়! কিন্তু তবুও একে মেনে নেয়া কষ্টে, মেনে না নিলেও কষ্টে, মেনে নিতে পারলে দুঃখ লাঘব। তুমি অনেক কিছু মেনে নাওনি, সে তোমার দোষে নয়, তুমি জটিলতামুক্ত সঙ্গত একটা জীবন, ঘর ও সঙ্গসার চেয়েছো বলেই, অর্থাৎ সেটা তোমার গুণে। কিন্তু অনেকের মধ্যে তিনি হলেন আলাদা। তার বলার, কিম্বা ভাববার ধরনও তাই আলাদা। আমার প্রতি তার অনুরাগটাও অন্য রকম। আমি জানি এটাও মানতে পারা কষ্টে। তুমি মেনে নিয়েছো, তুমি মেনে নাওনি। অর্থাৎ তোমার ভেতরেই এ নিয়ে চলেছিলো ভাঙা-গড়ার খেলা। তাতে তোমার অনেক কষ্টে পোহাতে হয়েছে। কিন্তু জীবন মানুষকে যেখানে টেনে নিয়ে যায়, সেখান থেকে বের হতে পারা যায়, কিন্তু থেকে যায় ভুল ও তার ইতিহাস। দুঃখ তাই অনিবার্য।

কিন্তু তারও আছে সিমাহিন অসহায়ত্ব। সে অসহায়ত্ব আমাকে কষ্টে দেয় না, আমি বরঙ বিব্রত হই, অসোয়াস্তিতে ভুগি। অর্থের প্রাচুর্য তার আছে, কিন্তু সে অর্থের লোভ আমি করিনি। তার অর্থের কানাকড়ি মাঝেমধ্যে প্রত্যাশা করেছি অন্যদের জন্য, যেমন একটা হুইল চেয়ার, কিম্বা কিছু কম্বল ইত্যাদির জন্য, অর্থাৎ কিছু সম্বলহীন মানুষের জন্য আমার কিছু প্রার্থনা ছিলো তার কাছে। তার সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়াটা আমার চোখ এড়ায়নি, আমি কষ্টে পেয়েছি, তার চেয়ে বেশি আমি বিব্রত হয়েছি। বিব্রত হওয়াটা কি তার জন্যও নয়? কি জানি! তিনি হয়ত ভেবেছেন আমি বুঝিনি কিছু। অথবা তিনিও আমার বুঝতে পারাটা বুঝে থাকবেন। কিন্তু সবার শেষে আমি তার সিমাবদ্ধতাকেই মেনে নিয়েছি। আর তার উপর থেকে সব বিরাগ আমার মুছে গেছে। তার অসহায়ত্বের ধরন অন্য রকম। তিনি মুক্ত, কিন্তু শক্ত

করে বাধা। তিনি উড়তে জানেন, খুব ওড়েন আকাশে, পৃথিবির সারা প্রান্তে তার বাধ্যগত উড়ে যাওয়া, আর বন্দি হয়েই। আমি পারস্য দেশের মহান কবি ও সাধক শেখ সা'দি সিরাজি (রহ) এর গুলিস্তার একটি বয়াত অনুবাদ করেছিলাম এই ভাবে, যখন অনুবাদ করেছি, তখন আমার তার কথা মনে হয়েছে।

বন্দি হলো খাচার ভেতর একটি কাক আর বুলবুলি
আর কি পাবে বাসতে ভালো কুসুম বনের ফুলগুলি!
ভাগ্যহত গানের পাখির রুদ্ধশ্বাস মরছে প্রায়,
কাকের ঘরের সহবাসে কান্নাকাটি, হাসতে দায়।

জড়িয়ে আছে যে বাধা, সে বাধা ছাড়াবার ক্ষমতা তার নেই। তাই তাকে আমি ভুল বুঝি না। আমার সঙ্গে পুরোটা সময় তুমি থাকলে হয়ত এটা তোমারও অনুভবের সঙ্গি হতো। তোমার সঙ্গে তার কোনও বিরোধ নেই। বিরোধ করার মত ব্যক্তিত্বের তুমি নও। তোমার অন্তরের সৌন্দর্য আমার জানা। কিন্তু তবুও সব কিছুর সুরাহা ছিলো শুধু তোমার হাতেই। টুনি, মানুষে মানুষে আদি প্রেম আমাকে বিস্মিত করে। স্বার্থশূন্য ওই প্রেম আজকের পৃথিবিতে দুস্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে যদিও, তবুও সময়ে অসময়ে যা পাবার কথা ছিলো, তা যদি মুহূর্তের জন্যেও পেয়ে যাই, মনে হয় আমি হয়ত আজ রাতের পরে আর থাকবো না, কিন্তু মনে হয় এ পৃথিবি টিকবে। বেচে যাবে মানুষগুলো। সমস্ত কিছুই নস্টোদের হাতে জিম্মি হয়ে থাকবে না। বরষায় পাক ধুয়ে যায়, গুটিকতক মানুষের ভালোবাসায় দুস্টেরা ধুয়ে যাবে। যৌনতাকে লোকে, বিশেষ করে জ্ঞানপাপি লেখকেরা আদিরস, আদি প্রেম বলে। মিথ্যে বলে। আদিপ্রেমটা মানবিক, মানসিক। ওটার নাম হলো মায়া-মমতা। জন্মেই আদম-হাওয়া মিলিত হয়েছিলেন, এটা হতে পারে না। জন্মেই কেউ সন্ন্যাসি হয় না। হয় বলো?

এখানে খাবার বিক্রেতা মুহম্মদ সুলতানের জিপগাড়িতে করে বহুদূরের পথ চলার সময়ে আমার শুধু এই কথা-ই মনে হয়েছিলো যে, কিসের জন্য আমাকে এরা এতো মায়া করছে, এদের তো কোনও লাভালাভের প্রশ্ন নেই! পরে ভেবেছি, এ হলো মানুষে মানুষে, জিবে-জিবে মায়া মমতা। বাধা ছাড়াবার ক্ষমতা আমাদের কারও নেই, কিন্তু মমতা করতে পারলে সঙসারে টিকে থাকা সহজ হয়। হুম, এ ক্ষেত্রে সবাই তো ভাবে যে সঙসার তো ভাঙবে! কিন্তু কেন?

আমাকে হয়ত তুমি অবসেজড বলবে। দেখো আমি সত্যিই এতোটা অবসেজড হয়ে আছি যে আজ ঘরে ঢোকার সময় ঘরকে সালাম দিয়েছি – আসসালামু'য়ালাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর। একি আমার অবসেশন! নাকি সত্যিটা আজ ঘটে যাবে! এমন তো আগে কখনও হয়নি! আজ যদি নাও হয়, হয়ত সেদিন খুব বেশি দূরে নয় যে, আমি দেখবো আমার মধ্যে আমার 'আমি'টা নেই! 'আমি'টা দূর আকাশ থেকে সালাম দিচ্ছে আমাকে, এই ঘরে – হে কবর, তোমাকে সালাম! বড়ো ভয়ঙ্কর বেপার।

সে'রম কিছু ঘটে গেলে তিনদিন সময়টা শরির পচন-গলনের পক্ষে অনেক পরিমান যথেষ্ট। আমার জিভন ছুটি নেবে, সবার ছুটি ফুরোবে, সবাই ফিরে আসবে, হয়ত আমার খোজ পড়বে, মোবাইল ফোনটা বাজবে, নিরন্তর মোবাইলের শব্দটা কেউ শুনবে, দরজা বন্ধ, পুলিশ, দম বন্ধ করা দুর্গন্ধ...

ইতি

তুতুর মৃত্যু

ঘটনা কিছু দিন আগেই ঘটেছিলো। কিন্তু দূরে থেকে তার কিছু আচ করা সম্ভব হয় না। ফেরেশতা বা জিন গোছের কিছু হলে হয়তো টের পেতাম। চোখ বন্ধ করেই কিম্বা উর্ধ্বাকাশ হতে পৃথিবির দিকে তাকিয়েই সব খবর জেনে নিতাম। আফসোস! ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মানুষের দলের আমি এমন একজন যে, নাকের উপরের, চোখের একেবারে গায়ের ভুগোল ও ইতিহাসও আমার অজানা। আয়নায় যা দেখি তাও তো পার্শ্ব-পরিবর্তনের ধোকা। কিন্তু এই মানুষেরাই আবার গর্ব করে বলতে পারে যে তারা মহান। অসিম ক্ষমতাধর মানুষ। আমি তুচ্ছ হতে তুচ্ছতার মানুষের দঙ্গল ছাড়া আর কিছু দেখিনি। কিন্তু মিথ্যে অহমবোধে ভোগা অমানুষের অসুস্থতা দেখি প্রতিনিয়ত। এইসব পন্ডিতম্যান্য মানুষের মধ্যে ভালোবাসার প্রকৃতি অত্যন্ত নিম্নমানের। ভালোবাসা বলতে এরা নাচা-গানা, ভোজন-পান আর রাত-বিরেতে বিছানাসঙ্গকে জ্ঞান করে থাকে। আবেগের একটা বৈশ্বিক দিক আছে। সেটা ছড়িয়ে দেয়ার জিনিস। ওইটের মধ্যে আছে প্রকৃত ভালোবাসা। তুতুর সঙ্গে আমার সে রকম ভালোবাসার সম্বন্ধ। এর সঙ্গে মিশে আছে অনন্ত আবেগ। এতে নেই কোনও স্বার্থপরতা আর আত্মদন্দের নিস্টুরতা।

সম্পর্কে সে আমার কেউ না। তার বর্তমান নামটা আমাদের দেওয়া। প্রকৃত নাম জানি না। অর্থাৎ বিশ্বদরবারে কি নামে তার রেজিস্ট্রি খোলা, সে সম্পর্কে আমি কিম্বা আমরা ন-ওয়াকিবহাল। তুতুকে দেখে আমরা শুধু মুগ্ধ হোতাম। আমাদের ঘরে তার ছিলো অবাধ অধিকার। তুতু যখন ছোটো ছিলো তখনও সে এটা ওটা ভাঙতো, যখন বড়ো হলো তখনও তার এই ভাঙা বন্ধ হয়নি। কিন্তু তাতে আমাদের ভালোবাসা কমে যায়নি। আমরা ভাবতাম বড়ো হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি হয়নি হয়ত। আরও একটু বড়ো হোক না! কিন্তু তুতু বড়ো হতে পারলো না। দুই মাস আগে বাচ্চা দিয়েছিলো সে, অল্প বয়সে গর্ভধারণ। কতই বা হবে তার বয়েস?

আমার স্ত্রি আমাকে মাঝেমাঝেই জিজ্ঞেস করেন, ভালো আছে তো আমার বাচ্চারা? আমার তুতু, যুভি! ওরা সবাই ভালো আছে তো?

বাপ-মা না জানা ও নাম পরিচয়হীন এই অনাথাকে রাস্তা হতে তুলিয়া এনেছিলেন আমার স্ত্রি। অনাথার নাম রাহুল হয় কি করে সেটা একটা প্রশ্ন বটে। তাই তার এই প্রথম নাম পালটে তুত রাখি। জায়নামাজে বসে আমার স্ত্রি এখন তুতুর জন্য কাদছেন। এ ছাড়া আর কিছু করার নেই। সে পরপারে। তুতুকে পেয়ে আমাদের জীবনে যে একটা নতুনত্ব এসেছিলো সেইটাকে আর নতুন করে বলার কিছু নেই। আমরা সুখের মর্ম উপলব্ধি করেছিলাম একে দিয়ে। ফলে তার না থাকাটায় স্ত্রির কান্নাটা অবধারিত। আর আমার কথা! কান্না আমার জন্য নয়। তুতুর মৃত্যু হয় আমার স্ত্রি যে দিন বিমানে করে আমার কাছে আসবেন সে দিন। তুতুকে সঙ্গে আনা সম্ভব নয় তাই দূরে আমাদের গ্রামে তাকে রেখে এসেছিলাম আব্বা-আম্মার কাছে – ইচ্ছে যে, গ্রামের আলো বাতাসে ভালো থাকবে সে। ফলে স্ত্রির বিমান যখন আকাশে তখন আমাদের পৃথিবিতে কি ঘটে যাচ্ছে, সে কথা আমার স্ত্রি জানতে পারেননি। চিঠির যুগ

হলে জানতে আরও দেরি হতো। চিঠিতে বলা হতো – তোমাকে একটা খবর দেয়ার ছিলো... ইত্যাদি। সে চিঠি আসতে আসতে তুতুর মৃত্যুসঙ্বাদটা কি মিইয়ে যেতো না? জানি না। বাড়ি থেকে এ খবর দিতে চায়নি কেউ। কারন, ওই আবেগের প্রশ্ন দূরত্বের বৈষম্যকে মানেনা। মৃতের মুখ দর্শনে আবেগ যত গভির থেকে উথলে ওঠে, দূরত্বের ক্ষেত্রে তা মাপদন্ডের অনেক নিচে অবস্থান করলেও কিছুতেই তা তুচ্ছ নয়। অন্তত স্ত্রির কান্না দেখে সেটা আচ করতে পারছি।

পাচশ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে তুত এসেছিলো বাচতে। দুধের বাচ্চাগুলোকে কোলের মধ্যে করে নিয়ে পাচশ মাইল পথ পাড়ি দিলো সে। শহরে কোথায় রেখে যেতাম ওকে? কি খেতো আর বাচ্চাগুলোকেই কি খাওয়াতো সে? আদর দিয়ে দিয়ে আমার স্ত্রি ওকে আর ওর ভাই-বোন বন্ধুদের এমন বানিয়েছিলো যে, বাইরের পৃথিবির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলার ক্ষমতা ওর হয়েছিলো কি না তা আজ আর বলতে পারি না। আমরা সেই চেষ্টা করিনি। একবার না বলে বাইরে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিলো সে। তখন আমরা খুজে খুজে হয়রান হয়ে যখন তাকে পেলাম, তখন তার আকুতি আর আমাদেরকে ডাকাডাকি করার পেটার্নে বুঝে গিয়েছিলাম – ওরে, তোর দ্বারা ঘরে থাকা ছাড়া আর কিস্যু হবে না! তাই তো আমরা যখন বিদেশে যাবার জন্য ঘর ছাড়লাম, ওদেরকে নতুন একটি ঘর দেবার জন্য পাচশ মাইল পথ পাড়ি দিলাম – অর্থাৎ নিজের গ্রামে বাবা-মায়ের কাছে রেখে এলাম। কিন্তু জিবন যে এমন গোজামিলপূর্ণ একটা বিধান জানতাম না। এখন বুঝতে পারছি। বাচাতে গিয়ে নিজের হাতেই মনে হয় ওকে মেরে ফেললাম আমি। জিবনকে স্বাভাবিকভাবে চলতে দিতে হয়। নইলে ওই গোজামিল কথাটা বারবার চলে আসে। জিবনে যা স্বাভাবিক তা-ই সুন্দর – বন্যেরা বনে সুন্দর।

এখন প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, তুতুর ভাইবোনেরা কিম্বা বন্ধুরা, যারাও আমাদের আশ্রিত, তারা কেমন আছে? ভালো আছে তো? তুতুর বাচ্চা দুটো? দুধের বাচ্চা দুটো ভালো আছে তো? মা-কে ছাড়া ওরা ভালো আছে তো? আর তুতু? য়ামার ও আমাদের তুতু? কেমন আছে ও?

দূরে পরবাসে বসে তুতুর জন্য দুঃখ করা যেতে পারে, খাওয়া-দাওয়া ভোলা যেতে পারে – ভালোবাসা বলে কথা! কিন্তু তাতে নিজের ক্ষতি করা ছাড়া আর কিছু লাভ হয় না। ‘সব জেনে বুঝেও যে কেন কাদো!’ আমার এই কথায়ও কোনও কাজ হয় না। টুনি, অর্থাৎ আমার স্ত্রি কাদতে থাকে। রাহুলের শোকে টুনির কান্না থামাতে পারি না আমি। তখন আমি তাকে সান্তনা দেই – যখন জন্মতে যাবে, খোদার কাছ থেকে ওকে চেয়ে নিও, এবার হলো তো!

না, হয় না। ভালোবাসা ও বন্ধন এমন জিনিস, কোনও অজুহাত, উপহার কিম্বা সান্তনায় প্রিয় বস্তু হারাবার বেদনা উপশম হয় না। অবশেষে টুনি নিজেই একটা উপায় বের করে দুঃখ ভুলবার। আমাকে বলে, আমার মনে হয় তুতুকে ওরা তাড়িয়ে দিয়েছে। তুতু তাই হয়ত অন্য কোথাও চলে গেছে। আনমনেই সে বলতে থাকে, যাক গে! হয়ত বেচেই আছে অন্য কোথাও। বেচে থাকলেই হলো। আমি শুনতে পাই তার বিড়বিড়ানি। আমিও যোগ দেই তার সঙ্গে – ঠিকই বলেছ, তুতু হয়ত বেচেই আছে। তাহলে তো হলো। তোমার সঙ্গে দেখা না হলে কস্টো তো একটু হবেই, কিন্তু তোমার তুতু তো বেচে আছে! সেই বা কম কি!

বেচে আছে তো আমার তুতু?

সত্যি বেচে আছে?

না, অভিনয়টা আমার দ্বারা হয় না। আমি কিছুতেই কল্পনা করতে পারছি না যে তুতু বেচে আছে। অর্থাৎ সান্তনা পাওয়া আমার কাজ নয়। আমাকে কেউই সান্তনা দিতে পারে না। বস্তু ও ভাবের মাঝামাঝি আমার অবস্থান। তুতুকে আমি ছুতে চাই, ওর নরম গালে হাত দিয়ে আদর করতে চাই, ঘুমোলে ওর বেরিয়ে যাওয়া জিহ্বাটার উপরে টোকা দিতে চাই, এবণ্ড আরও অনেক কিছু। কিন্তু ভারি হয়ে থাকার বুকুর উপর থেকে পাথর আমার কিছুতেই সরে না। যুভি বেচে আছে, ভাঙা ঠ্যাঙ নিয়ে কিটিও আছে বেচে। এই বা কম কিসে? সত্যি বেচে আছে তো? হুম, যুভি হারিয়ে গেছে। শুনেছি আদর পেলে বিড়াল বাড়ি থেকে চলে যায় না। তাহলে যুভি কেন চলে গেলো?

আর আমার কিটি? আমার চারতলার বাসা থেকে মাটিতে পড়ে কিটি কোনওমতে যখন বেচে ছিলো, তখন আমরা ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। হাসপাতালে ও বেচে যায়, কিন্তু কোনওমতে বাচা থেকে আর বেরোতে পারেনি। মেরুদন্ডের হাড় ভেঙে যাওয়াতে ভেতরে কি একটা মারাত্মক সমস্যা হয়ে গেলো ওর। বাচ্চা ধারণ করে, কিন্তু মিসকারিজ হয়ে যায়। কিটি মা হতে পারবে না। কিন্তু কিটি বাচবে কি না সেটা একটা বিরাট আশঙ্কা। যখন শেষ খবর পেয়েছি, কিটির পেশাব নাকি রক্তের মত লাল! সে হয়ত এখন ঘরে বসি করছে, আমার বইয়ের তাকেই কখনও আমার গন্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছে, রাতে বইয়ের পরে ঘুমিয়ে পড়ছে কখনও, সেই বইয়ের পরেই রক্তমাখা পেশাব করছে, সকাল হলে বাগানে গিয়ে গাছ-গাছড়া শুকে ওর নিজের জন্য ওসুখ বের করতে চেষ্টা করছে। এর অর্থ হলো, ও যে কোনও মূল্যে বাচতে চাইছে – স্মৃতি নিয়ে, অসুখ নিয়ে, ভাঙা শরির নিয়ে।

হায় আমার সন্তানেরা! হায়!

না, আমি মাতম করিনা, কিন্তু আমার সন্তানেরা দুধে ভাতে ছিলো। আমি ইশ্বর পাটনি নই। আমি প্রার্থনা করিনি, বরঙ আমি আমার সন্তানদের দুধে ভাতে রেখেছিলাম। আজ তাদের এই হিন অবস্থা, এই মৃত্যু, এই ঠিকানাহীনতা – এটা সহ্য করা খুব কঠিন।

কিন্তু কঠিনেরে ভালো না বাসতে পারলে নিজের বেচে থাকাটা দায় হয়ে যাবে। তাই ভুলে থাকতে চাই। কবে সেটা সম্ভব তা জানি না। তবে চাই।

যুভি, কিটি, তুতু তাই বেচে রইলো আমার স্মৃতিতে। এই-ই আমার একমাত্র সান্তনা। টুনির কথা জানি না। অথবা জানি। কিন্তু বলবো না।

দ্যাট হুইচ ক্যান হ্যাপেন শ্যাল হ্যাপেন

(১২১০২০১৫, রাত ৩ টা)

তখন পানি তেষ্টা পেলো। ঘরে খুঁজে দেখলাম ট্যাপের পানি ছাড়া ‘পটেবল’ অর্থাৎ ‘পট’-এ রাখা বিশুদ্ধ পানীয় জল নেই। পানির ‘পট’ নিয়ে তাহলে উপায় করতে এখন আমাকে বাইরে যেতে হবে।

কয়েন দিতে পানি কিনতে হবে। তেষ্টায় গলা ফেটে যাচ্ছিলো। চাবি হাতে নিলাম। নিলামই তো! নিয়েছিলাম তো? যখন দরজা টান দিলাম তখন কিছু মনে হয়নি, কারন মনে হওয়ার মত কারন ঘটতে আর কিছু সময় বাকি। খটাস করে দরজা লেগে যায়। ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে যায়, আমি বাইরে দাড়িয়ে। দেখি আমার হাতে চাবি নেই, অতিরিক্ত তালাটাকে চাবি মনে করে বেরিয়ে এসে দরজা লাগিয়ে দিয়েছি! তখন রাত দুটো।

আমি বাইরে, চাবি ভেতরে। এখানে আমার পরিচিত কেউ নেই...

বাড়িওয়ালা এখানে আসেন কালেভদ্রে, বহুদূর হতে। আমি বহুদূর হতে অলক্ষুনে কুকুরের কান্নার শব্দ শুনতে পাই... রাত্রি বড়ো নির্জন।

আমাকে আশ্রয় দেয় এখানে কেউ নেই। অতএব আজ রাতের ভবিষ্যত আমার মোটামুটি জানা।

আসলে রবিন্দ্রনাথই যত নষ্টের গোড়া। উনি বললেন, ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে...

ফলে চাবিকে তালা কিম্বা তালাকে চাবি করতে নিয়ম করলেন একজন, আর বাইরে রাত কাটাতে হয় অন্যজনকে।

(১৬১০২০১৫, রাত ৩ টা ২৩ মিনিট)

স্বপ্ন হলো সত্যি। আসলে কি তাই? আমি স্বপ্নে বিশ্বাস করি। অর্থাৎ বিশ্বাস করি যে স্বপ্ন দেখবো। স্বপ্ন দেখতে আমার ভালো লাগে। ভিষন ভালো লাগে। তবে স্বপ্নের মধ্যে প্রচুর সত্য মিথ্যের উপাদান থাকে। ফলে বিশ্বাস করতে গেলে কাকে খুয়ে কাকে নিতে হবে সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমার ঘাড়ে, ঠিক ঘাড়ে নয়, বলতে হবে ঘটে, সিদ্ধান্ত নেবার জন্য কৌশলপত্রে যা লেখা আছে তা শুধু ভুলটাকে বেছে নেয়। ফলে স্বপ্ন থেকে বাছতে গেলে ভুল হবে সেটা হলফ করে বলা যায়।

আজ সকালে স্বপ্ন দেখছিলাম। আজ শুক্রবার। জুম্মার দিন, সাপ্তাহিক ইদের দিন। বিশ কিলোমিটার ঠেঙানোর কস্টো সার্থক হয়ে যায় যখন নামাজে আসা মানুষগুলোকে দেখি। অবশ্য বিশ কিলোমিটারের যাত্রাকে ঠেঙানো বলাটা অন্যায়। যাত্রায় ক্লান্তি কম আমার। ফলে উপভোগটা আমার কাছে প্রকট হয়ে ওঠে। বরঙ বলতে হবে বিশ কিলোমিটারের যাত্রা বাড়লে আরও ভালো হতো। ত্রিশ, চল্লিশ, কিম্বা আরও....!

সকালে ঘুম একটু ভেঙেছে আমার। তখন মনে পড়লো, ওহ হো, আজ তো যেতে হবে মসজিদে। ফারুক ফোন করার কথা। সে নিশ্চয় ফোন করবে সময়মত। ফারুক আমাকে তার মটরসাইকেলে করে মসজিদে নিয়ে যায়। যা হোক এ সব ভেবে ভেবে আবার কখন ঘুমিয়ে গেছি জানি না। ঘুমের কোনও আগা-মাথা আছে নাকি ছাই! তখন স্বপ্ন দেখছি – মটরসাইকেলে ফারুক এসে গেছে। অর্থাৎ মসজিদে যাওয়া হচ্ছে।

- ওহ হো! ফারুক, আজ তুমি খুব আগে যে! এখনও তো বারোটা বাজেনি!
- হুম, কিন্তু এই পথেই একটা কাজ ছিলো ভাবলাম ঘুরে যাই।
- ভালো করেছ, তবে আর গিয়ে কাজ নেই। বাইরে যে রোদ্দুর, আবার বাসায় যাবে, তারপর আসবে, মাত্র তো এক ঘন্টার বেপার। তুমি বরঙ এখানে বিশ্রাম করো, আমি একটু আসছি।

ফারুক থাকতে গাইগুই করে। কিন্তু বাইরের দিকে তাকিয়ে আর যেতেও মন চায় না তার। থেকে যায়। মেডিসিন্যাল প্লান্ট নিয়ে পড়াশোনা ওর। আমি বলি, তুমি এমন কিছু ওষুধ উদ্ভাবন করো যাতে গরিবেরা ওষুধ কিনতে পারে কম পয়সায়।

আমি বাইরে যাবার আগে টেলিভিশন অন করে দেই। দেখি একটা ছবি হচ্ছে, বাঙলা ছবি। উত্তম কুমার যুদ্ধের প্লট করছেন। তখন আমার মনে হয় ছবিটার নাম সম্ভবত সব্যসাচি। শরতচন্দ্রের ‘পথের দাবি’ উপন্যাসকে এই নাম দিয়ে সিনেমা বানানো হয়েছিল। সব্যসাচি ‘পথের দাবি’র প্রধান চরিত্র। সে যা হোক। ফারুক আমাকে তখন সিনেমা নিয়ে প্রশ্ন করে, এটা বুঝি তোমাদের ভাষার ছবি?

- ছবি মানে! একেবারে আলবত! এই নায়ককে চেনো তুমি? ইনি হলেন মহানায়ক। উত্তম কুমার এর নাম।

■ কিন্তু আমি কিছু বুঝি না যে!

- তুমি বোঝোনা, এটা তোমার দুর্ভাগ্য, বাঙলা ছবি আর উত্তম কুমার কি, এটা না বোঝা খুবই দুঃখজনক। এতো বড়ো ভাষা, এতো পুরোনো ভাষা, অথচ তোমরা এর সম্পর্কে বে-খবর! দুনিয়ায় ভাষার জন্য জান দিতে পারে মানুষ, এমন সৃষ্টিছাড়া খবর শুনেছো বাবার জন্মে? শোনোনি তো, তাই। নইলে জানতে বাঙলা ভাষাটা কি! যা হোক।

সালা-কালো ছবি। রঙিন হলেও কোনও লাভ হতো না। স্বপ্নের টেলিভিশনটা অনেক পুরোনো বক্স টিভি! অতিথের সঙ্গে বর্তমানের সঙ্যোগ ঘটায় স্বপ্ন। নইলে আজ শুক্রবারের ঘটনা ঘটছে, তার সঙ্গে পুরাকালের পুরোনো এই টিভি জুড়ে থাকে কেন? কাঠের ঘরের চেহারাও মনে হচ্ছে আদিকালের। আমার বাপের জন্মেও এই ধরনের ঘর কোনওকালে ছিলো না। মালয় দেশের কাঠ দিয়ে বানানো। অর্থাৎ আমি কোথায় আছি সেটাও জানি না। এমন সময় হড়হড় শব্দে আমি জেগে উঠি। মোবাইলটা বেজেছে। আমার স্বপ্ন ওই অবধি-ই। ফারুকের ফোন। সে আমাকে জানায়, আজ সে খুবই দুঃখিত। তার থিসিসের কাজ পড়ে আছে। আজ মসজিদে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

(১৮১০২০১৫, বেলা ১২ টা ৪৯ মিনিট, চিয়াং মাই, থাইল্যান্ড)

প্রায়-ফুল পেন্টটা মেঝেতে পড়েছিলো। আমিই ফেলে রেখেছিলাম। তখন রাত। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে মেঝের দিকে তাকাতেই আমার অন্তরাঝা কেপে ওঠে। ভুতের ভয়ে যে হার্ট ফেল হয়নি সেই-ই বাচোয়া। প্রায়-ফুলপেন্টটা এমনভাবে মেঝেতে পড়ে আছে মনে হচ্ছে যেনো উপুড় হয়ে কোনও মানুষ শুয়ে আছে। বা দিকের পা-টা একটু ভাজ করা। স্পিন বোলারদের হাত যতটুকু ভাজ হওয়া আইনসঙ্গত, তার চেয়ে বেশি হবে না। ঘুমের ঘোরে আমার মনে হতে থাকে, শরিরের উপরের অঙশ গেলো কই? আমি তখন মনে হয় কমোডের পরেই আবার ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। স্বপ্ন দেখি, আমাদের ধড়ের মৃত্যু হয়েছে। আমাদের বলতে আমাদের জাতির। মেঝের পরে শুয়ে থাকা প্রায়-ফুলপেন্টটাকে আমার কেবল মনে হতে থাকে দেশের ক্রিস্ট শরিরের নিম্নাঙ্গ। ইদানিঙ আমার একটা সমস্যা হয়েছে। মানসিক সমস্যা। আমি ভাবতে গেলেই দেশের কথা মনে আসে। এমনতে ভাবনার ভাষাকে কখনও পালটানো যায়না। অর্থাৎ কোনও মানুষ তার মাতৃভাষায় ছাড়া ভাবতে পারে না। কিন্তু ভাবনায় যদি কোনও স্থানের

প্রসঙ্গ আসে তবে তাও যে শুধু মাতৃভূমিই হবে এটা বড্ড বাড়াবাড়ি। আমার এখন এই বাড়াবাড়ির রোগে ধরেছে। আমি পর্বত শিখরে বেড়াতে যাবো, আমার চোখে ভাসে বান্দরবানের অতুলনীয় শিখরসারির রহস্যময়তা, আমি সমুদ্রে যাবো, মস্তিস্কে তখন খেলা করে কুয়াকাটা, কটকা, কিস্বা কল্পবাজারের ঢেউয়ের ছন্দপতন, বন মানে আমার কাছে সুন্দরবন। আমার পায়ের কাছে এসে সেই নোনা জল, পর্বতশিখর, শ্বাস-মুলেরা ভালোবাসার আবেদন জানায়। অর্থাৎ ভালোবাসাটা স্বপ্নেও দ্বিপাক্ষিক। আমি এখন যে সবুজের পর সবুজ ভূমি দেখে দেখে মুগ্ধ হয়েছি, এখনও হচ্ছি, কিন্তু আমার মনে পড়ে বাংলাদেশের সবুজের কথা। এই সময় আমার মন কিন্তু আমার সঙ্গেই তর্ক জুড়ে দেয়।

মন আমাকে বলছে, দেখো আদিখ্যেতা! সবুজ! পাছো কোথায়?

আমি অবাক হয়ে বলি, কেন, বাংলাদেশে? সবুজের দেশ যে আমার!

মন আমার চেয়ে বেশি অবাক হয়, বলে, তুমি সব কিছুতেই এতো বেখবর! দেশে সবুজ কি রেখেছে সোনার ছেলেরা?

আমি বলি, মানে?

■ মানে আর কি, জন্মের আগের আর এখনকার পরিসংখ্যান ঘেটে দেখো, তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে।

আমি তখন ভাবি, আমার মন কি তবে বিদ্রোহ করছে? বাংলাদেশের বিরুদ্ধে? অর্থাৎ আমার মধ্যেই বাস করছে দুইটি সত্তা? একজন বাংলাদেশকে প্রানের চেয়ে ভালোবেসে যাচ্ছে, অবশ্য অন্তরে, ভালোবাসার প্রকাশ ও কাজ বলতে যা বোঝায় তার কিস্যুটি করা হয়নি এখনও। আর একজন দেশের জন্মের আগের বাংলাদেশের সবুজের পক্ষে কথা বলছে? কথা বে-ঠিক বলেও উড়িয়ে দিতে পারছি না।

মন তখন আমার ভাবনার বিষয় বুঝতে পারে, বলে, আরে বে-ঠিক কি! সর্বৈব সঠিক। তোমরা দেশের যে অবস্থা করে রেখেছো, তা হচ্ছে তোমার ওই বাথরুমের মেঝেতে পড়ে থাকা প্রায়-ফুলপেন্টটা। অবশ্য ‘জেনিটাল’টা ওই ভাগেই পড়েছে। মৃতপ্রায় দেশ, কিন্তু সন্তান উতপাদনে কার্পন্যহীন। লজ্জা হয় না তোমাদের?

আমাদের লজ্জা নেই, এটা ঘটতো।

ঘটেছে।

(১৯১০২০১৫, রাত ১১ টা, চিয়াং মাই, থাইল্যান্ড)

চিন্তা-ভাবনা সবকিছু ওলোট-পালোট হয়ে যাচ্ছে। আমি বা আমরা প্রতিদিন এত বেশি করে পরিবর্তিত হচ্ছি কেন? আমার নতুন পথের সন্ধান পাবার জন্য মুখিয়ে থাকা ছোট্ট এই জীবন শুধু খুজছে, শুধু খুজছে। কিন্তু না। একটা বিষয় শুধু নিশ্চিত হওয়া ছাড়া আর কোনও কিছুতেই আমি নিজেকে সুস্থির রাখতে পারছি না। উপর থেকে পৃথিবির যে একজন কলকাঠিটা নাড়াচ্ছেন, এটার বেপারে আমার কোনও রকম সন্দেহ নেই। আমি আল্লাহতে গভীরভাবে বিশ্বাসি। কিন্তু এটুকু ত পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। আমি কোন পথে গেলে আমার নিজেকে পাওয়া ও বোঝাটা সম্পন্ন হবে, সেটার বেপারে

সন্দেহটা বাড়ছে তো বাড়ছেই। আমি কোনও কিছুতেই ধ্যান দিতে পারছি না বলে আমার এই বাড়তে থাকা কস্টের ভাগিদার আমি নিজেই। আমি কারো সঙ্গে আমাকে শেয়ার করতে পারিনা। কারন আমার এই আজগুবি চিন্তার মধ্যে আনন্দের কোনও রকম খোরাক নেই কারোও জন্য। ফলে আমার নিজের মধ্যেই চলছে ভাঙা গড়ার খেলা। প্রতিদিন।

আমার কাছে এই জীবনটা ভাওতাবাজি মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে ক'জন মানুষের খেলার শিকার হয়ে আছি। আর রাজনীতি যেহেতু সামাজিক জীবনযাত্রার অংশ, তাই আমি নিজেকে এর থেকে কখনও দূরে রাখিনি। না, কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করা আমার হয়ে ওঠেনি, যদিও রাজনীতিকে আমি খুব সুস্বভাবের পর্যবেক্ষণ করি, সেটা একেবারে নিজের মত করে। আর এর থেকে আমার মধ্যে জন্ম নিয়েছে ঘৃণা। এই সমাজের প্রতিটি ভাওতাবাজ মানুষের জন্য আমার মধ্যে তৈরি হয়েছে ঘৃণা। ঘৃণা এই সমাজকে পরিবর্তন করে দেবে না, কিন্তু আমার মনের মধ্যে তৈরি হতে থাকা এই অনুভূতি থেকে আমি বুঝতে পারছি, সমাজের পরিবর্তনটা খুব জরুরি হয়ে পড়েছে। নস্টো, ও ভন্ডদের মাঝে যে মিথ্যে ও ফাকির সমাজ তৈরি হয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষের জন্য কোনও সুষ্ঠু বিধান নেই। যা আছে, তা কেবল মুখে। আমি এই নস্টামিটা থেকে মুক্ত হতে চাই, অন্যকে মুক্ত করতে চাই। তাই আমার মধ্যে জন্ম হয় বিচ্ছিন্ন চিন্তার।

তবে রাজনীতিবিদদের নস্টামির চেয়ে চেতনাবাজ বুদ্ধিজীবীদের ভন্ডামিটা আমাকে বেশি পিড়া দেয়। আমি কোনও হোমরা-চোমরা গোছের কেউ নই। বরঙ মহত্ব নামে যদি কোনও বাড়ি থেকে থাকে, তবে সেই বাড়ির চৌকাঠ পেরোনো দূরে থাকুক, সে বাড়ির উঠোনেও আমার জায়গা নেই। সে বাড়ির গন্ধ সামান্য নাকে আসে, সে অতি সামান্য, অর্থাৎ অতি দূরে কোনও এক কচু গাছের নিচে হলো আমার স্থান। কিন্তু সেই নিচুকুলে থেকেও আমার নিজস্ব চিন্তার স্বাধীনতা আছে বলেই এত সাহস করে বলতে পারছি সব কথা। বুদ্ধিজীবীদের অ-আ-ক-খ'টা আবার পড়ে আসা দরকার। যে ভ্রমের মধ্যে তারা রাখেন আমাদেরকে, তা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারলে দেশের ষোলোকলা পূর্ণ হতে আর কতদিন। কিন্তু দেখুন তারা বলছেন, দেশের ষোলোকলা পূর্ণ করবেন উন্নয়ন দিয়ে। এটা রাজনীতিবিদদেরও কথা। রাজনীতিবিদদের মিথ্যে বলতে হয়। নইলে ভোট কাড়া সম্ভব হয়না গন্ডমুখ ভোটারদের কাছ থেকে। কিন্তু 'শিক্ষিত', 'পরিশীলিত' বুদ্ধিজীবীরা কেন এতো ধাপ্পা দেন আমাদেরকে?

লতিফ সার বলেন, ধাপ্পা তাদেরকে দিতে হয়। কারন তারাও মানুষ। পেটের সঙ্কলন করতে তাদেরকেও নিতি বর্জন করতে হয়।

কিন্তু নিতির সঙ্গে পেটের সম্পর্ক কম সার, আমি যোগ করি।

■ সে ঠিক। কিন্তু ওটা শুধুমাত্র বইয়ের ভাষা।

আমি এই কথার সঙ্গে দ্বিমত হই। আমি বলি, মহাপুরুষেরা কিন্তু পথ দেখিয়ে গেছেন!

■ কিন্তু মহাপুরুষেরা সে পথ করে দেখিয়েছেন?

- এ কথা এখন সে যুগে আর একবার না জন্মে বলার উপায় নেই, আমি কলি যুগের।

■ তাহলে যা তা বলো'না।

আমি মাথা নিচু করে বলি, আচ্ছা সার।

(০৮০১২০১৬, সকাল ১০ টা ২৩ মিনিট, ব্যাঙকক, থাইল্যান্ড)

কিন্তু বিচারের বানি নিরবে নিভূতে কাদে। বিচারপতি, তোমার বিচার করবে যারা... সলিল চৌধুরি বিচার চাইলেন। কিন্তু দেশের পামর মানুষেরা তাতে তাল দিলো না, তাল দিলো ‘মুন্নি বাদনাম ছয়ি’তে। ফলে বিচার হবে কার? সলিল চৌধুরির বিচার হবে। হওয়া উচিত। উনি কেন চাইলেন বিচার? উহার বিচার কর।

আমি তখন হরমোনের ক্ষরন থেকে বাচবার জন্য রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে পড়ি। একা গাড়িতে যাচ্ছি। অর্থাৎ যে যুগেই বাস করি না কেন, আমি যে অতিতেই পড়ে আছি সে বিষয়ে নিশ্চিত বোধ করছি।

তখন আমার দাদির কথা মনে পড়ে। দাদি ছোটবেলায় কোলের মধ্যে নিয়ে গল্প করতেন – এক বুড়ি হুকা খাতি খাতি বাজারে চলিলো, তিন পুলিশ আইসে তারে ধাবড়ো কষিলো, কোলে ছিলো ছেলে-মেয়ে কাইন্দে উঠিলো...

অর্থাৎ পুরাকালে হুকা খাওয়া নিষেধ ছিলো। একালে সিগারেটে নিষেধ আছে, তবে দারুণ বেবসায়িক বুজরুকিতে। নো স্মোকিং জোন আছে বটে। কিন্তু সিগারেটের মোড়কের গতর সঙবিধিবদ্ধ সতর্কিকরন দ্বারা সিদ্ধ। এতেই কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব শেষ। সিগারেট থেকে মূল্য সঙযোজন কর আসে প্রচুর। ফলে সরকার একে রুখতে পারে বলে নাটক করতে পারে, বন্ধ করে দিতে পারে না। এ ছাড়া আরও হরেক রকমের সমস্যা আছে।

একা গাড়ি চলতে লাগলো। আমার বিড়ালের বাচ্চা ক’টা আমার সঙ্গেই। খাচার মধ্যে বন্দি। আমার নিজের বাচ্চা মনে করেই বন্দি করেছি, যদি হারিয়ে যায়! তখন একজন এলেন। বললেন, তুমি কেমন বাপ হে! বাচ্চাগুলো যদি তোমারই হবে তবে বন্দি করে রাখলে তার কি প্রমান হয়?

আমি বলি, কি প্রমান হয়?

উত্তর আসে, তুমি বড়ো মায়া-দয়াহীন।

আমার তখন গাধার গল্পটা মনে পড়ে। বাপ আর ছেলের সঙ্গে থাকা গাধাটা নিয়ে পথিকের প্রহসনের সেই গল্প মনে করে আমি বুঝতে পারি, এ হচ্ছে শঠ। আমাকে ঠকাতে এসেছে।

কিন্তু পথিক আমাকে কি ঠকাবে, আমি নিজেই যে ঠকে বসে আছি।

আমি দেখছি বাচ্চাগুলো খাচার ফাক গলে বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু মৃত।

আমার এতো স্বাস্থ্যবান বাচ্চারা কেমন করে এতো কৃশকায় হয়ে গেলো? একেবারে বাংলাদেশের কৃষকদের মত কৃশকায়। না খেতে পেয়ে কৃষকের যে দশা, সুদের টাকার দেনদরবারে জিবন শেষ।

আমার বাচ্চাগুলোও খেতে না পায়ে স্বাস্থ্যহীন, হাড়জিরজিরে হয়ে গেছে। ফলে খাচা থেকে বের হয়ে যাওয়া সহজ হয়েছে তাদের জন্য।

খাচা থেকে বের হওয়ার এই একটাই উপায়। মৃত্যুবরন করা। এর বাইরে আর কোনও উপায় নেই। আটকে থাকতে হবে। যদি অন্য কোথাও চলে যেতে পারি, সেই চেষ্টা করতে হবে। এখানে হয়ত চলবে না।

■ এ দেশ সব হারা, কিন্তু সব পেয়েছিটা কোথায় বলতে পারো?

- এমনকি রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরও পরবর্তিতে আর একটা জন্ম হলে যেনো এ দেশে না জন্মান সে প্রার্থনা করেছিলেন।
- কিন্তু সে দেশটা কোথায়?
- তা জানি না, তবে দেশের মানুষগুলো কেমন করে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে গুটিকতক মেরুদণ্ডহীন পশুদের কাছে - এ আর কতকাল দেখে যেতে হবে?

(২৯০২২০১৫, বিকেল ৫ টা ২০ মিনিট, পাফায়ম, থাইল্যান্ড)

দাবা খেলায় হেরে গিয়ে পশ্চিমের ভদ্র ছেলেটি আমাকে গালিগালাজ শুরু করলো। খেলার মধ্যেই সে এমনিতেই উত্থিত করছিলো আমাকে। হেরে সেটার মাত্রা বেড়ে এমন অবস্থায় পৌছলো যে শুরু করলো ‘মাদারফাকার’ শব্দটা দিয়ে। আমার একটা বদ অভ্যেস হলো কেউ আমার উপরে ক্ষেপে গেলে আমি প্রথমত নম্র সুরে কথা বলি। বর্তমানে যে যুগ পড়েছে তাতে মিনমিন করলে ঘাড়ে চেপে বসে সবাই। এর আগেও একবার এইরকম ঘটনা ঘটেছিলো। যত আমাকে গালমন্দ করছে, আমি ততই নিমিলিত হয়ে যাচ্ছি, যেনো মাটিতে মিশে যাচ্ছি। আমার মাথা ঠান্ডা ছিলো, অর্থাৎ কি ঘটছে সব কিছুই আমি অনুভব করতে পারছি। কিন্তু রেগে যারা যান তাদের ক্ষেত্রে ঘটনাটা উলটো ঘটে, তারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। ছেলেটি আমাকে এর পরে বলে, ইউ ডার্ট ব্লাক মুসলিম!

হুম, এবার আমি কিন্তু বলার জায়গা খুঁজে পেয়েছি!

বললাম, আরে হ্যা, তুমি ঠিক ধরেছো, মুসলিমের জোরটা মনে, তোমার মুখে আর হাতে। তোমাদের এদিন হাতে জোর এটা জানতাম, মানে পৃথিবিময় দেখতেই তো পাচ্ছি। কিন্তু মুখে যে এমন জোর, এটা আজ জানলাম।

ও উলটো পালটা কথা বলতে বলতে সিমা-পরিসিমা হারিয়ে ফেলেছে। বললাম, বয়! যাও, বাড়ি যাও। খেলাটা এন্টারটেইনমেন্ট, কিন্তু একে যুদ্ধ বানিয়ে ফেলেছো তুমি। তোমার মত আমিও বলতে পারি, মানে এই শব্দগুলো আমার ভালো জানা আছে। কিন্তু বলে মুখ নোঙরা করিনা। তুমি বরঙ ডাক্তার দেখাও।

কথা এখানে শেষ। কিন্তু অতি সহজে মা-বাপ তুলে গালি আমরাও দেই। এ দেশে হাজার হাজার ছোটোখাটো ঝগড়া বাধে প্রতিদিন। সেখানে গেলেই দৃশ্যটা পরিস্কার হয়। কিন্তু কোনও অপরাধ না করেও গালি খাবার মানেরটা কি? পরে ভাবলাম। পশ্চিমা দেশগুলোতে (সব দেশও না, সব মানুষও না, কিন্তু অবশ্যই প্রকট হারে) মা-বাপের ঠিক-ঠিকানা কমই আছে মুসলিম দেশের তুলনায়। মুসলিমরা, এমনকি পশ্চিমেও সাধারণভাবে পরিবার প্রথা মেনে চলে। অন্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রতিচ্যে বিষয়টা অনেক লিবারেল। ফলে এ রকম কালচারে বড়ো হয়ে এমনি এমনিই কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার মত করে হলেও মা-বাপ তুলে যাচ্ছেতাই করা তাদের জন্য ডালভাত। আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রকটভাবে পশ্চিমের কেতা ও

সাম্রাজ্যবাদিতার তুমুল বিরোধি বলেই এমন করে বলছি সেটা ভাবার কোনও কারন নেই। মক্কায়ে ও গাধা থাকে, পশ্চিমেও বদমায়েস শক্তিমত্ত পাপি থাকবে। আমার অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধে। আমার বিদ্রোহ তাদের বিরুদ্ধে।

(২৯০২২০১৫, রাত ১১ টা ৫১ মিনিট) এর আগে একবার আমেরিকা থেকে কেউ একজন আমাকে বলেছিলো, আরে, ব্লাডি এশিয়ান নিগার, তুই গুগলে কি করিস? তোর এখানে কি?

তা বটে! আমি এখানে কি করি! গুগল বানিয়েছে আমেরিকা, হক তো ওদেরই। আমার মত নিগারের পক্ষে প্রযুক্তির স্পর্ধা করা সত্যিই ওদের জন্য আপত্তি। কিন্তু গরুর স্তনের দুধ পেতে হলে চাটি তো খেতেই হবে। খাচ্ছি।

(০১০৩২০১৬, সঙখলা, থাইল্যান্ড)

তার নাম দিলাম ‘খিনজির’। তাকে কোনও দিন দেখিনি, কোনওদিন দেখবো এমন সম্ভাবনাও নেই, কোনওরকম পরিচয়ও নেই। তার আসলেই কোনও পিতৃপরিচয় আছে কি না সে বিষয়েও আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তার আসল নামটা পালটে দিলাম। ‘খিনজির’ আরবি শব্দ, এর অর্থ হয় শুকর। পবিত্র কুরআন শরিফে এই শব্দ আছে ভেবে কেউ যদি এই নাম রাখতে যান তবে তা নিতান্তই বোকামি। কিন্তু আমি আমার মত প্রকাশে সত ও সাহসি বলেই মনে করি, ওই ছেলে এই নামের যোগ্য। শুকরকে যতই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা হোক না কেন, ও জন্মগতভাবেই নোঙরা। বড়ো বড়ো ট্রেলারে করে সাদা বা গোলাপি রঙের শুকরকে কসাইখানায় নিয়ে যেতে দেখেছি। কিন্তু যাওয়ার পথে বৈজ্ঞানিকভাবে পরিস্কৃত এই জন্তুটি যে পরিমান গন্ধ রেখে গেছে পথিকের জন্য, তা বাংলাদেশের কাওরাদের নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত অপরিচ্ছন্নতার চূড়ান্তরূপের শুকরদের চেয়ে বেশ কম, কিন্তু তা নাককে বিরাট মাপে বিকৃত না করে পারেনি। আমার দেয়া খিনজির নামের এই ছেলেটিও সেই রকম। একে যতই ভালো কথা বলা হোক না কেন, সে তার মুখ এবঙ মনকে নোঙরা বানিয়ে রেখেছে, সেখান থেকে ফেরার যেনো আর উপায় নেই। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে হেদায়েত দেন। দুয়া করি, একেও দিন।

খিনজিরের সঙ্গে সঙস্পৃষ্ঠ হওয়ার ঘটনাটা আমার ব্যক্তিগত জীবনের কিছু ঘটনার অনুসঙ্গ। কিন্তু বড়ো অসহায়ভাবে, বড়ো অনভিপ্রেত হয়ে। আমি সত্যি করেই গল্পটা বলতে বসেছি। ফলে মিথ্যের আশ্রয় নেবার প্রশ্ন ওঠে না। বিষয়টা আমার আজমুকালের স্বভাবঘটিত, প্রেমবিষয়ক পত্র সম্পর্কিত। মানুষ যখন প্রেমে পড়ে তখন তার কাছে অন্য সব কিছু তুচ্ছ, সে শুধু জানে ‘আমি তারে ভালোবাসি অস্তি-মাঙসসহ’। প্রেমপত্রে যা লেখা থাকে, তারা যারা লিখেছেন ও পড়েছেন তারা শুধু নন, যারা না লিখেছেন তারাও জানেন - গালভরা কথা। অর্থাৎ বেশিরভাগই মনগড়া মিথ্যে কথা, মন ভুলানো কথা। সত্যের সঙ্গে মিথ্যের মন্দরস না মিশালে কি প্রেম জমে? কিন্তু যার জন্য লেখা, অস্তি-মাঙসের দেখা পাবার আগেই উনি গত হয়েছেন জীবন থেকে। অর্থাৎ আমার জীবন থেকে। জীবনে তিনি অনেক কিছুই পেয়ে গেছেন এর মধ্যে, কিন্তু গত হলেই যেমন গতরের দেখা পাওয়া যায় না নিতান্ত দুর্ভাগ্য ছাড়া, তবে অতিতের অনেক প্রসঙ্গ যায় থেকে।

স্মৃতি থাকে, বেথা-বেদনা, কিছু সুখ – তাও থাকে। আরও কত কিছু থাকে! তারও মেলা কিছু থেকে গিয়েছিলো আমার কাছে। চিঠি, কন্ঠ, ছবি আরও কতকিছু! এগুলো নশ্বর জিনিস, না থাকলেও পারতো, কিন্তু থেকে গিয়েছিলো। রেখে দিয়েছিলাম। সম্ভবত বদঅভ্যেসের কারনে। এ অভ্যেসই কাল হলো।

তাকে ফিরে পাবার তাড়না ছিলো মনে। আশাও ছিল। আসা-যাওয়ার পথটা প্রেমের পথ, এখানে দুরাশার একমুখি পথ নেই, এখানে থাকে সম্ভাবনার সূর্যোদয়, যদি মেঘ না ছাপে তো পাবো দেখা। অথবা পরের দিন। আশা মরে যায় নাকি? কিন্তু যা যায়, তা যদি একেবারেই যায় তবে কথা ছিলো না। কিন্তু একেবারে ধুয়ে মুছে না গেলে মন ভোগে আবার ফিরে পাবার প্রত্যাশায়। যার সব হারায়, ক্ষিন্তর আশা তার বেচে থাকার অবলম্বন।

এর মধ্যে আমি একটা ভুল করে ফেলি। এ কাজ করাটা জঘন্য হয়েছিলো আমার জন্য। আমার মন জানে, আমি যা করতাম না কোনওদিন, তা আমি মুখ দিয়ে বের করে ফেলেছিলাম। বাস, আর যায় কোথায়! থুথু গাল থেকে বের হয়ে গেছে, আর ভেতরে নেয়া যাবে না। আমি কোনওভাবে কোনওদিন তাকে বলে বসি, তার মান সম্মান নিয়ে টানা হেচড়া করবো। সাবুদ তো হয়্য মেরে পাস! এই কথা বলে একাকি আমার সেকি হাসি, নিজের সঙ্গেই দুস্টামি আর খুনসুটিতে মেতে উঠি আমি।

কি নস্টো আমি! আমি জানি, যা আমি করবো না, কিন্তু তবুও সে কথা বলে আমি জানি আমি নিজেকে যেমন ছোটো করেছি, তেমন আমি জানি, আমি কখনই কারও মান সম্মান নিয়ে খেলা করিনি, আর এ ক্ষেত্রে তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু আগেই তো বলেছি থুতু মুখ থেকে বেরিয়ে গেলে তাকে আর গালে ফেরত নেয়া যায় না। যা বলা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। এই ‘হয়ে গেছে’ বলেই তিনি খিনজিরকে ভাড়া করলেন। মানুষ কত নিচ আর জঘন্য প্রকৃতির অমানুষ হলে এমন বিশি ভাষায় কথা বলতে পারে, তার কিছুমাত্র লিখেও প্রকাশ করার সাধ্য আমার নেই বলেই লিখতে পারলাম না। কিন্তু আমার মন জানে সেই রাতে ওই পশুর চেয়ে অধম ও নিকৃষ্ট অসভ্য জানোয়ারের মুখের ভাষার কি সব ঘৃণ্য শব্দ আমাকে হত্যা করেছিলো বার বার। আজও আমি ভুলি না। যে মারটা খায় সে ভোলেনো কখনও। যে মারে, ভুলে যাওয়া তার কাজ। যে অন্যায়ভাবে মারে, তার আরও। আজ ভাবি ও লজ্জা পাই, এমন নস্টো প্রকৃতির মানুষের সঙ্গে যার পরিচয় ও ওঠাবসা, তাকে কেন যে সময় নস্টো করে চিঠিগুলো লিখতে গিয়েছিলাম! ঘেন্নায় মরে যাই, ছ্যা!

অতিত ভালো ছিলো। তখন আমার বয়েস সবে নয়-দশ। যাকে কোলে তুলে নিয়েছিলাম পরম আদরে, তার বয়েস তিন-চার। ওই বয়সে তার গায়ের লেগে থাকা মাতৃদুগ্ধবোধ স্বর্গীয় সুঘ্রানটা-ই ছিলো সত্য। কিন্তু সেদিনই যে লেখা হয়ে যাবে ভবিষ্যতের আসছে দিনের আবেগঘন সম্পর্কের ইতিহাস, কে তা জানতো! তখন আমরা কুস্টিয়া শহরে থাকতাম। তার বাবা একদিন আমাদের বাসায় বেড়াতে এলেন। তিনি আমাদের সব সময়কার সুহৃদ ছিলেন। সেটা শুধু মুখে মুখে হলেও ছিলেন। অন্তরের বেপারে বেখবর। তিনি ফিরে আসার সময় গ্রামের বাড়ি আসার জন্য আমি গো ধরি। অতএব, তার সঙ্গে গ্রামের বাড়ির পথ ধরি। খুলনা আসতে আসতে রাত। গ্রামে পৌছতে পৌছতে আরও রাত। অতএব, সেই রাত তার বাড়িতে কাটে আমার। আমি দশ, সে চার। কে জানতো ভবিষ্যত?

হায়, যায় দিন ভালো। কিন্তু যে দিন এলো আমার নস্টো-ভ্রস্টো ভুলে ভরা জীবনে, তা আমাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে প্রতিদিন, এবঙ এমন কি আজও। যুগ যেতে সময় লাগে না, কিন্তু ঘা-টা এখনও দগদগে। আর স্মৃতি?

‘যা হারিয়ে যায় তা আগলে বসে রইবো কত আর,

আর পারিনা রাত জাগতে হে নাথ...’।

মুশড়ে ওঠা অতিত ফিরে আসেনা, ফিরে আসে ঘটন-অঘটনের প্রায়াক্ষকার অন্ধকুপের জিবনাচরন।

আর প্রেম?

নৈতিকতা

মানুষের সুকুমার বৃত্তির সাম্প্রতিকতা দিয়ে উন্নত সমাজ ব্যবস্থার দিকে এগিয়ে যাবো, এমন কথা যখন বলা হচ্ছে চার-দেয়ালের মধ্যখানে বসে, দেশের নৈতিকতার তখন প্রায় চরমভাবে টালমাটাল অবস্থা। নতুন যুগ, নতুন আবেদন, নতুন করে সব কিছু সাজাবার প্রয়াসে সবাই যখন অতিব্যস্ত, তখন এর মধ্যে নতুন করে কিছু বুদ্ধিপাপিদের জন্ম হয়ে গেলো। তারা নতুন করে নৈতিকতার জন্ম দিয়েছে। এরা স্বার্থপরতাকে হালাল ভাবে, হিঙসা, কুতসা ও অহঙ্কারকে মনে করে নিজের জ্ঞানকে ফলাবার উপায়, রুখে দাড়ানো মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে এরা হাসে, ভাবে, কি বোকা! কিন্তু দেশ তাতে মজে গেলো, বেশ ভালোভাবেই মজে গেলো। মজা পেয়ে গেছে দেশের মানুষ কিসের যে আশ্বাদনে! আমি ঘুমে ঘুমে এই মজে যাওয়া দেখছিলাম। তারপর এলো শাহনুর – আমাদের শাহনুর আলম। এই ছেলে প্রতিজ্ঞা করেছিলো সে কোথাও গেলে মার্কিন মুলুকেই যাবে। ওখানেই জ্ঞান-গম্মির সবকিছু পড়ে আছে, খুটে নিতে হবে। কিন্তু তার চেয়ে টাকা বড়ো। শাহনুরের এক বন্ধু টেক্সাসের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাট অঙ্কের ফান্ড পেয়ে ডক্টরেট করছে। টাকার অঙ্কটা সে আমাকে বলে, বলে তার পেশোল এবঙ প্রচুর রোমযুক্ত হাত উচু করে, মুখে তার আরও রাজ্যের বিস্ময়, সে বলে – উরিইইই টাকা! শাহনুর নিজের কাছে তার কথা রেখেছে। সে আমেরিকা গিয়েছে পড়তে। অনেক টাকা হোক ওর। কিন্তু ভোগের পেয়ালা শুধু নিজের কাছেই উপচে না পড়ে, সে প্রার্থনাও করি আমি। আমার ঘুমের মধ্যে এই ছেলে এলো এবার। আমাকে বললো, ধনতন্ত্রটা কিন্তু টিকেই গেলো সার, দুই-আড়াইশো বছর তো কম না!

অর্থাৎ বছরের পরে বছর গেলো, দেশ যে এতে মজে গেছে সে বেপারে আমিও নিঃসন্দেহ হই! ভাবি, রাজনৈতিক মতাদর্শের এতো ফারাকের মধ্যে বাস করছি যে, ধনতন্ত্রের খবিশরা এই সুবিধা নিয়ে আরও অনেক সুবিধাবাদি চাড়াল, চামার, দাস তৈরি করেছে। কিন্তু পরে আমার ভাবনা হয় যে, প্লেট টেকটোনিকের ফাক গলে বেরিয়ে আসা ম্যাগমাগুলোর পর্বত সৃষ্টি করার আগের উত্তপ্ত অবস্থাটা যদি সত্য হয়, তবে রাজনীতির এই ফাক গলছে না কেন? কেন বেরিয়ে আসছে না দ্রোহের লাভারা? আমার ‘আমি’টা তখন আমাকে বলে, বিপ্লবের আদর্শ গেছে দলে! গলে যাবে কেমন করে আর?

সাম্রাজ্যবাদিতা আর এর বিরোধিপক্ষের মধ্যে নৈতিক অবস্থানের কোনও স্থান নেই, দুটোই নৈতিকতাশূন্য হয়ে গেছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে রুখে দাড়াবার নৈতিক বল যেমন নেই কারও, তেমন রয়েছে শক্তির অসমতা – এ অসমতা বিপুল। ক্রুসেডিয়মানসের মার্কিনি যুদ্ধগুলোর বিপক্ষে ধর্মের পতাকা হাতে যারা দাড়াচ্ছে, তাদের পক্ষ নেবার আমার অন্যতম প্রধান কারনটা হলো যুদ্ধের নামে নির্বিচারে সাধারণ নারি-শিশু-বৃদ্ধকে হত্যা করা। আমি বরাবরই মজলুমের পক্ষে, হোক সে ভিয়েতনামের বৌদ্ধ, কিম্বা আফগানিস্তানের পশতুন, ফিলিস্তিন-ইরাক-লিবিয়া-ইউরোপা স্বজাতি, আফ্রিকার তাবত অত্যাচারিত মানুষেরা, অথবা আমেরিকা কিম্বা ওশেনিয়ার আদিবাসি। তা ছাড়া মার্কিনি যুদ্ধগুলোর অজুহাতগুলোও যেমন অন্যায় ও মিথ্যে, তেমনি বিপক্ষের ধর্মযোদ্ধারা যে নৈতিক প্রশ্নে সঠিক নয় তাই ঠিক এই পক্ষই যে এক সময় মনে ও মনে আমারই পক্ষ হয়ে উঠেছে সেটা দাবি করি না। তবে আধুনিক ক্রুসেডার রাষ্ট্রের চরম বিপক্ষে আমি সেটা প্রকাশে দিচ্ছি, এবং তার কারনটাও আমি স্পষ্ট করেছি। এরা আজীবন হত্যাকারি। এদেরকে ভালোবাসার প্রশ্নই ওঠেনা, সমর্থন তো না-ই। এরা দুনিয়াজুড়ে মিলিয়ন মিলিয়ন নিরীহ মানুষ হত্যা করতে করতে হাত পাকিয়েছে – আদিবাসি রেড ইন্ডিয়ান, দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসি, এশিয়ার দক্ষিণের মহাদেশের অ্যাবোরিজিন, ভিয়েতনাম, এবং আরও আরও অনেক দেশে অনেক জাতিতে। আর এখন ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া, লেবানন, পাকিস্তান। পাকিস্তানের নাম উচ্চারণ করে আরও একবার রাজাকার হয়ে যাই কি না কে জানে!

জওহরলাল দাশ ছিলেন আমার সহকর্মী। বয়সে তিনি পনেরো-কুড়ি বছরের বড়ো হবেন। কিন্তু সহকর্মী হিসেবে জুনিয়র। কিন্তু ইনিই কেমন করে যেনো সব কান্ডের চুড়ামনি হয়ে উঠলেন। আমার আমি’টা আমাকে তখন বলে, যোগ্যতা, বুঝলে মিয়া, এরে কয় যোগ্যতা! সেই অসম্ভব যোগ্যতা ও শক্তির বলে ইনিই আমাকে প্রথম ‘রাজাকার’ বলেছিলেন। আমার একমাত্র দোষ, আমি এক সময়ে কষে কম্যুনিজম করে পরে জামাতে ইসলামি নামের একটি রাজনৈতিক দলকে শুধু সমর্থন করেন, মিস্টার দাশেরও সিনিয়র এমন একজন মানুষ, ও সহকর্মী আব্দুল লতিফ সারকে আমার প্রায়-বন্ধু বানিয়েছিলাম। দাশ এখন স্বর্গবাসি। স্বর্গেই থাকুন, সেই প্রার্থনা করি। বখে যাওয়া পন্ডিত ডক্তর হুমায়ুন আজাদ সার বলে গেছেন, যে একবার রাজাকার, সে নাকি চিরকাল রাজাকার, মাগার একবার যে মুক্তিযোদ্ধা, সে চিরকাল মুক্তিযোদ্ধা নাও থাকতে পারে! কি কথা মাইরি!

ওরে আমি কি হনু রে! আর সস্তা বুলি ও সঙলাপের রাজা কিম্বা রাজপুত্র ডক্তর হুমায়ুন আহমেদ সার অত্যন্ত আদর করে করে আমাদের বুলি শেখালেন তোতা পাখি দিয়ে, ‘তুই রাজাকার!’ দাশ আমাকে ‘তুই রাজাকার’ বললেন। দাশ অপায়ে ঘি ঢেলেছেন কি না সে সময়ই বলে দেবে, কিন্তু মিস্টার দাশ, আপনি জেনে রাখুন, আপনি আমাকে যতই খেতাব দান করেন না কেন, তাতে আজাদ স্যারের বানি যদি আমার জন্য ক্লেয়ামতের পরেও অটুট থাকে, পাকিস্তানি গান কিন্তু আমি ছাড়ছি না! মেহেদি হাসান, গুলাম আলি, আমানত আলি খানদের গান শোনা, আর একটু একটু গুনগুন করা ছাড়তে হলে আমাকে আরও রোগাগ্রস্ত হতে হবে, আমাকে ভুলে যেতে হবে সুর, ভুলে যেতে হবে সৃতি। এমন কি, আপনাকেও! আপনাকে ভোলা যম্ভব নয়। আপনি আমাকে বখে যাওয়া পন্ডিতের অমোচনীয় বচনের চিরসাক্ষি করে রেখে গিয়েছেন মিস্টার দাশ!

আচ্ছা যা হোক। আমি তখন নিজেকে প্রশ্ন করেছি, মানুষ কেন নিরীহ মানুষকে হত্যা করে? আসলে নৈতিকতা যখন পাশ কেটে চলে যায় জীবন থেকে, তখন হত্যায় মানুষ কিম্বা পিপড়া –এই বোধ আর গুরুত্বপূর্ণ থাকে না। এমন কি ভারতবর্ষের যে সনাতন-মুসলিম বিভেদ, তাও ওই সাম্রাজ্যবাদি শক্তির চূড়ান্ত চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই না। এরা খেয়ে পরে এক সঙ্গে সুখেই ছিলো। এক ধর্ম আরেক ধর্মের চলার পথে বাধা হতে পারে না। বাধা হয় রাজনীতি। সাম্রাজ্যবাদিতার কুটনিতি আমাদেরকে আলাদা করে দিয়েছে, সাতচল্লিশ – এর জন্ম হয়েছে, দেশ ভেঙে দিয়েছে, শান্তি নষ্টো করে দিয়েছে। আর এর পরে আমরা বেশ জুত করেই আমাদের নিজেদেরকেও নষ্টো করে দিয়েছি। সেটার কারন আমরা নিজেরাই। যাপিত জীবনে আমাদের অভ্যাসের সঙ্গে নষ্টামিকে যতটা স্থান দিয়েছি নৈতিকতাকে ততটা দূরে ঠেলে দিয়েছি। নৈতিকতার সঙ্গে মানুষের দূরত্ব বাড়ছে, তাই বেড়ে চলেছে পরার্থপরতার সঙ্গেও দূরত্ব। আর তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই কাছে চলে আসতে পারছে সহিষ্ণুতা। বিবর্তনবাদীদের দাবি যে, পৃথিবিতে খাবারসহ বাচবার অন্যান্য মাল-সামান্য অপ্রতুলতা আছে, তাই টিকে থাকবার জন্য মারামারি, খুনোখুনি হয়। কিন্তু আসলে খাবারের ওজন না করেই একটা কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে খাবার বা সম্পদ ‘ডিস্ট্রিবিউশন’ এর অভাব খাবারের অভাবের চেয়ে বেশি এই দুনিয়ায়। অর্থাৎ নৈতিক কিছু শক্তিশালি মানুষেরা যদি টিকে থাকার সঙগ্রামে জয়ি হয়ে যায় তবে মানব সমাজের যে টেনেট, অর্থাৎ যে ফিচারের উপরে সমাজ প্রতিষ্ঠিত, তার সঙ্গে এর ফারাক অনেক বেশি। নৈতিকতা বিষয়ে ব্যক্তির নিজস্ব এক্সিওম থাকতে পারে। কিন্তু সমাজে বাস করতে হলে সামষ্টিক এক্সিওমের শরনাপন্ন হতে হয়, নইলে সমাজ টেকে না। একটি সমাজে নৈতিকভাবেও যার যার নিজস্ব এক্সিওমে চললে সেই সমাজ ধঙস হবেই। আমাদের এই আধুনিক সমাজে স্নেহ, মায়া, দরদ, ভালোবাসা, সহমর্মিতা কমে যাওয়ার কারন হলো এই ইনডিভিজুয়ালিজম। ব্যক্তি তার নিজস্ব নৈতিকতার সঙজ্ঞা তৈরি করে চলতে পারে না যা একটি সমাজকে বিভ্রান্ত করে। হুম, তার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে নিজস্ব এক্সিওম থাকা অন্যায্য কিছু নয়। সমাজকে অশান্ত না করে তুললেই হলো। সামাজিক ডকট্রাইনের সঙ্গে একাত্ম হতে না পারলে সামাজিক প্রানিরা আর সামাজিক থাকে না, তথাকথিত একই সমাজে বাস করেও তারা হয়ে পড়ে দূরের।

একটি দেশ, বা একটি সমাজে অথবা এমন কি একটি অঞ্চলে নৈতিকতার কিছু পেরাডাইম থাকে। এটা হলো ওই বিশেষ এলাকার জন্য আদর্শ। একে নরম্যাল ডিস্ট্রিবিউশন দিয়ে বেখ্যা করা যায়। একটা সমাজে কিন্তু অলিখিতভাবেই কিছু নিয়ম থাকে যাকে আদর্শ বলা যায়। আদর্শটাকে মিন-ভ্যাল্যু বা গড় ধরলে এই মধ্যমান থেকে সমাজভেদে বেশ ক্রটি-বিচ্যুতি লক্ষ করা যাবে। মদ খাওয়াকে কেউই ভালো বলছে না। কিন্তু ইউরোপিয় বা আমেরিকেন সমাজে মদপান বিষয়ে নৈতিক অবস্থানটা খেয়াল করলে এটা পরিষ্কার হবে। আবার মুসলিম সমাজে মদ্য বিষয়ক নৈতিক বিচ্যুতি কম, অর্থাৎ মদ না খাওয়া যদি হয় নৈতিকতার একটা দৃষ্টান্ত, তবে মুসলিম সমাজের অবস্থান, এমন কি উপমহাদেশের অনেক স্থানও ক্ষেত্রবিশেষে গড় মানের খুব কাছাকাছি। এর অর্থ একই বিষয়ের নৈতিক পেরাডাইমটা সমাজ বা অঞ্চলভেদে ভিন্ন হয়। আর পরম আদর্শের সমাজভেদে যা ভিন্ন হয় তা-ই মানুষ নিজের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছে। নৈতিকতা যখন সমাজভেদে ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, তাই আসলে এর নির্দিষ্ট করে কোনও

সঙজ্ঞা হয় না। কিন্তু নৈতিকতা যেহেতু ভালো- মন্দের সঙ্গে অঙাঙিভাবে জড়িয়ে আছে, তাই এর একটা বৈশ্বিক রূপও কল্পনা করা যেতে পারে। যেমন কাউকে খুন করা। পৃথিবিজুড়েই অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করাটা অনৈতিক, মিথ্যে বলা সারা পৃথিবির সবখানেই অনৈতিক, ভালো আচরন করা সবখানেই প্রশংসনীয়। এভাবে নৈতিকতার একটা পরম মান কিন্তু আমরা বের করে নিতে পারি। হুম, ধর্ম নৈতিক শিক্ষার বেপারে সবার চেয়ে অগ্রনি ভূমিকা পালন করে। যারা ধর্ম মানেনা, তারাও এমন অনেক অনেক কাজ করে থাকে যাতে ধর্মের সমর্থন আছে। যেমন অধার্মিক মানুষেরাই কেবল মিথ্যেবাদি হন, ধার্মিকেরা মাত্রই সত্যবাদি, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। ধর্ম বলছে, মিথ্যে বলো না। অতএব একজন সত্যবাদি অধার্মিক কিন্তু প্রকারান্তরে ধর্মের পেরাডাইমকে একটা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মানছে। এই আধুনিককালে ভালো কাজ বা মন্দ কাজের একটা সুনির্দিষ্ট পেটার্ন তৈরি হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো কে করে দিলো এ পেটার্ন? আমরা দেখি যে প্রত্যেকটা ধর্ম কিন্তু ভালো এবং মন্দ কাজের বিষয়ে প্রচুর কথা বলেছে। কাজেই আজকে উড়ে এসে জুড়ে বসে একজন যদি বলে বসে, হুম, মানব সমাজের এই নৈতিক অবস্থানের পেছনে ধর্মের কোনও ভূমিকা নেই, মূলত ধর্মই একটা অবান্তর বিষয়, তাহলে তাকে প্রশ্ন করা যায় যে, ভালো মন্দের কাজের বেপারে পরামর্শ দেবার ক্ষেত্রে ধর্মের চেয়ে সুসঙগঠিত প্রতিষ্ঠান আর কি আছে? অধিকাঙশ ক্ষেত্রে তারা এড়িয়ে যাবে, আর বড়োজোর তারা এ বিষয়ে উত্তর করবে, সে ধর্ম মানুষের তৈরি। তারা আরও যা বলতে পারে - এ হলো মানব বিবর্তনের ফসল।

এদের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। এরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে বিভক্তি তৈরি করে সামাজিক প্রানি হিসেবে টিকে থাকতে চায়, তাই নৈতিকতা বিষয়ে অন্য প্রসঙ্গ টানলে মঙ্গল। ধর্ম যেহেতু মানব সমাজের সঙ্গেই সম্পর্কিত, তাই ধর্মের বিধি-বিধানগুলোই কিন্তু নৈতিকতার সুত্র অর্থাৎ প্লাটফর্মরূপে আবির্ভূত হয়েছে অনেক কাল আগে থেকেই। ধর্মের সাধারণ নৈতিকতা-ই আসলে নরম্যাল ডিস্ট্রিবিউশনের ওই গড় মান। আমরা কেউ এটা মেনে চলি, অর্থাৎ গড় রেখার উপরে অবস্থান করি, আর কেউ কেউ এ থেকে অল্প কেউ বেশি বিচ্যুত হই। আর এভাবেই তৈরি করি নৈতিকতার বেল কার্ড। বিচ্যুতির অর্থ সমাজে অরাজকতা। যে সমাজে যত বেশি মারামারি, হানাহানি, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, মিথ্যে, খুন চলতে থাকে, সে সমাজের বেল কার্ডের বিস্তৃতি তত বেশি, অর্থাৎ গড় মান থেকে অনৈতিক কর্মকান্ড অনেক বেশি দুরত্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। আমরা এখন সেই রকম বেশি বিস্তৃতি পাওয়া বেল কার্ডের একটা সময়ে বাস করছি।

পশ্চিমা নৈতিকতায় কোমর থেকে আধ হাত মাপের কিম্বা তার চেয়েও খাটো কাপড় জায়েজ। যদি প্রশ্ন করেন, কে জায়েজ করলো, তবে তারা বলবে, কেন আমরাই? আমরা আধুনিক তাই এটা হলো এর প্রমান। আর এতে বিস্তার সুবিধাও আছে। আবার যদি তাদেরকে বলা হয় যে, এটা- ই যে খাটি, অর্থাৎ আসল, তার বেপারে তোমরা এত নিঃসন্দেহ কেমন করে হলে? তোমাদের পূর্বসুরিরা তো গা ঢাকা দিতো, অর্থাৎ সারা গা ঢেকে রাখার জন্য লম্বা কাপড় পরতো। অর্থাৎ যুগ বদলে গেছে বলে বদলে যেতে হবে নৈতিকতাকেও? এই ভারতেও উত্তম- সুচিত্রার যুগে মা- মাসিরা ঘোমটা দিতেন,

যার তার সামনে আসতে তাদের সে কি কুণ্ঠা! আর এখন সিনেমায় ওরা কাপড় পুরোটা খুলে দিতে পারলেই বাচে। ক'য়ুগের বেবধানেই এত পরিবর্তন হয়ে যেতে হবে? আপসে কেউ কাপড় খুলতে চাচ্ছে, তুমি না তাকালেই হলো, যার যার কাজ তাকে করতে দাও বাপু, আর মহিলারা ঘর থেকে দেদার বের হয়ে গেছে, এটা ওদের স্বাধীনতা, এটা-ই মানবাধিকার, হ্যানত্যান, ব্লা ব্লা ব্লা – ব্যক্তিস্বাধীনতার নাম করে এ সব কথা বলে যারা নস্টামিকে উসকে দিতে চাইছে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধটা প্রয়োজন এই জন্যই যে সমাজকে বিশৃঙ্খলা থেকে বাচানোর চেষ্টা আমাদেরই করতে হবে। চার দেয়ালের মধ্যে কাউকে বন্দি করে রাখার আমি নিজেও বিরুদ্ধে, কিন্তু এর একটা সুসহ পেটার্ন থাকতে হবে। যেমন থাকতে হবে পুরুষদের ক্ষেত্রেও। তাবত দুনিয়ার মধ্যে আমেরিকাতে ধর্মের পরিমাণ এতো বেশি, সে যে এতো বেশি, তার কারন প্রথমত মদ, এবঙ খোলামেলা ব্যক্তিস্বাধীনতাও তার অন্যতম কারন। এরা এতই আধুনিক যে, বছরে কুল্লে এক লাখের মত ধর্মের শুধু রেকর্ডই হয় থানায়, রেকর্ড হয়না যে কত সে আল্লা মালুম। আর এর মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য পরিমানের রেকর্ড হলো একই পরিবারের মধ্যে। অর্থাৎ আধুনিক সমাজের দাবিদার যারা, তাদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ সভ্যের মাতলামিতে মা-মেয়ে, বাপ-ছেলের বিচার চলে না।

সমুখে সমুদ্র দেখলেও মানুষ তাকায়, এমন কি বাদর দেখলেও। ফলে বেশভূষায় কষা নগ্ন কাউকে দেখলে যে রক্ত-মাঙশের মানুষের মন বিচলিত হবে না, বুকে হাত রেখে এই কথা কেউই বলতে পারবে না। মেটাফোর দিয়ে একটা কবিতা লিখেছিলাম, যার উদ্দেশ্য ছিলো আধ্যাত্মিকতা। কিন্তু এখন শুধু শাব্দিক অর্থ করেই এই কবিতাটা পড়তে হবে, তাহলে বুঝতে পারবো যে সাধারণ মানুষের পক্ষে নিজের প্রবৃত্তিকে দমন করা খুব সহজ কথা নয়। নিজেকে জলাঞ্জলির সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবার উপকরনগুলো সামনে এলে তো আর কথাই নেই। হুম, নৈতিকতা-অনৈতিকতা প্রশ্নে এ শুধু একটি মাত্র দিক। আমরা হাজার হাজার মিথ্যে কথা বলে সমাজকে অসহ করে তুলি, ষড়যন্ত্র করে মানুষে মানুষে শত্রুতা বাড়াই, হিঙসা-বিদ্বেষের আগুনে সমাজকে দাবালনের অভিশাপ উপহার দিই, কয়েক'শ টাকার জন্য মানুষ খুন করি, তার খবর কে রাখে! আচ্ছা চের হয়েছে, কবিতা পড়ি আগে -

অর্থহিনে নর্তকি নয় মন্দরসে বিষের ক্ষয়,

শর্তবিনে মর্ত ছাড়ে মত্ত আশিক অজুত শ'য়।

ফোটটা দেখি ঠোটটা চেখে সাকির হাতের মদ্য 'পর

ইমানদারে খুলছে টুপি পুরত ঠাকুর বেশ্যালয়।

এহেন কর্মকে নির্দিধায় লোকে বলবে যে, খুব খারাপ হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের পক্ষে বাড়াবাড়ি যে কোনও কিছুকেই নৈতিকতার মানদন্ডে প্রশ্নের সম্মুখিন করে তুলবে। আমাদের চিন্তা ও বোধ যুগে যুগে যে জিনের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হচ্ছে, বিবর্তনের আলোকে যাকে বলা হয় 'আরো উন্নত', তাহলে এই যদি হয় উন্নততর হওয়ার দৃষ্টান্ত, তবে এ কথা নিশ্চয় বলা যায় যে মানসিক ও মানবিক অবস্থানের উন্নয়নের নামে এখন যা দেখছি সেটা কিছুতেই জৈবিক বিবর্তনের ফল নয়, এ হলো সামাজিক অভিজ্ঞতার প্রাপ্তি। একটি সমাজ কেমন করে ধিরে ধিরে অনৈতিকতার অন্ধকারে তলিয়ে যায় তা আমরা পৃথিবির দিকে তাকালেই বুঝতে পারি। সুনিতি ও দুর্নিতির ধারণাও মানুষকে আলাদা করে দিয়েছে নৈতিকতার প্রশ্নে। কেউ কেউ বলে থাকবে যে, মানুষ সে সুনিতির কিম্বা দুর্নিতির আশ্রয় গ্রহণ করুক না কেন, সে তা করেছে টিকে থাকবার জন্য। অর্থাৎ তার বিচারে টিকে থাকবার জন্য দুর্নিতি কোনও

অপরাধ নয়। যেমন বিবর্তনবাদি সুবিধাবাদিরা বলে থাকে, একজন ক্ষুধায় কষ্টে পড়ে, এবড় মারা যাচ্ছে, আর অনেকের কাছে বাহুল্য খাবার থাকলেও তা হতে অন্যকে দিচ্ছে না। অর্থাৎ যে ক্ষুধায় মারা গেলো যে প্রাকৃতিক নির্বাচনের নিয়মে ‘ফিট’ নয়! অত্যাধুনিক বিবর্তনবাদি সমাজে তাই দয়া-মায়া, সহযোগিতা, সহমর্মিতা শব্দগুলোর আলাদা করে কোনও অর্থ নেই। তাদের কোনও প্রকার দায়বোধ নেই, তাদের মধ্যে যা আছে, বা বড়োজোর যা থাকতে পারে তার নাম তারা দিয়েছে ‘মাইন্ডলেস অলট্রাইজম’। তারা যুক্তি দিয়েই নিজেদের দায় শোধ করে। কিন্তু মানুষ ও পশুর মধ্যে যে ঔচিত্যবোধের পার্থক্য থাকে বা থাকা উচিত, তাকে অনুভব না করতে পারলে কি আর নৈতিকমানসম্পন্ন হওয়া যায়? এটা ঠিক যে পশুদের মধ্যেও কিছু গুণাগুণ রয়েছে যা নৈতিক মানদণ্ডের সঙ্গে খাপ খায়। কিছু প্রাণি যেমন কুকুর, ডলফিন, হাতি বা ঘোড়াকে তাদের মনিবের কিম্বা অন্য কারও প্রাণ বাচাতে দেখে গিয়েছে। এটা পশুর নৈতিকতার চরম উদাহরণ। কিন্তু মানুষের সমাজের সঙ্গে পশুদের সমাজের অনেক বেবধান আছে বলে মানুষকে এহেন কাজ করতে হয় প্রতিনিয়ত, কোনও উদাহরণ সৃষ্টির জন্য নয়। কিন্তু কি দেখতে পাচ্ছি চারিদিকে তাকিয়ে?

গান্ধিজি বলেছিলেন, ‘নিতিভ্রষ্টো বা নিতিহীন শাসক হল অন্যতম পাপি’। শুধু শাসকের দোষ দিলেই কিম্বা শাসক তার দোষ শুধরে নিলেই রাষ্ট্র আদর্শ অবস্থানে চলে আসবে এ কথা বলার কোনও উপায় নেই। হুম, তবে একজন আদর্শবান শাসক চাইলে পরিবর্তনটা আনতে পারেন। সততা, বিবেক, চিন্তা, বুদ্ধি ও ন্যায়পরায়নতা যেহেতু নৈতিকতার উত্স, রাষ্ট্র তার এই গুণকে প্রজার মধ্যে ‘ইনজেক্ট’ করতে পারে। চিন্তা ও কর্মের প্রভাবকে প্রবিস্ট করা যায়, এবড় এভাবেই মানুষ মানুষে সদগুণ এমন কি অবশ্যই অসদগুণও বিস্তার লাভ করে। ফলে রাষ্ট্র একটি জাতির মানবিক উন্নয়নের কাজ করতে পারে বহুলভাবে। আর নৈতিকতার ধারণা হওয়া উচিত সার্বজনীন যাতে করে সুনিতি ও সদাচারনের একটা বৈশ্বিক এককত্বকেই আমরা নৈতিকতা বলে চিনে নিতে পারি, সমাজ ও রাষ্ট্রে ভেদ হিসেবে নয়। ভিন্ন ভিন্ন সমাজের বেসিক টেনেটের কথা অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন।

৩১০৫২০১৬, বেলা ১২ টা ৫০ মিনিট, পাথালুঙ, থাইল্যান্ড।

সাত – এর সাত সতেরো

(২৩ ডিসেম্বর ২০১৫, ভোর ৪ টা ৪৫ মিনিট, সিয়ামদেশ)

বাইশে ডিসেম্বর। এ দিনের দিবাভাগ বছরের অন্য যে কোনও দিনের তুলনায় ক্ষুদ্রতম। সেই হিসেবে রাতটি কিন্তু দীর্ঘতম। অর্থাৎ দিন ছোটো, রাত বড়ো – এই হলো মোদাকথা। কিন্তু এর ঠিক তিনদিন পরে যেই পচিশে ডিসেম্বর এলো – সেই অমনি দিনটা কেমন করে বড়োদিন হয়ে গেলো? একুশে জুনকে পেছনে ফেলে দিলো না কি পচিশে ডিসেম্বর? না, তা নয়। কিন্তু কেমন করে নামটা ‘বড়োদিন’ হলো সেটা এখনও উদ্ধার করতে পারিনি। ক্রিসমাসকে বাঙলায়

অনেক জায়গায় খ্রিস্টমাস লেখা দেখেছি। তাতে অসুবিধা নেই। অসুবিধা হওয়ারও কোনও কারন নেই। পচিশে ডিসেম্বরের নাম যেমন বড়োদিন, ভাগ্যেও কিন্তু লক্ষির নির্ঘন্ট! পচিশ লিখতে যে ২ ও ৫ লাগে, তাকে যোগ করলে পাওয়া যায় ৭ - অর্থাৎ লাকি সেভেন। ক্রিসমাস খ্রিস্টান সম্প্রদায় বড়ো আড়ম্বরে উদযাপন করে। লাকি না হওয়ার কোনও কারন নেই।

সঙখ্যার এ হিসেবকে আপাততঃ মেনে নিলে ১৬ ডিসেম্বরও লাকি। তা তো বটেই! ১ আর ৬ যোগ করেই দেখুন না। অর্থাৎ লাকি সেভেন। বিজয়ও পেয়েছি এই দিনে।

রামলোচন আমাকে বলেন, তাহলে ৭ মার্চ তো একেবারে ৭ এর মধ্যে সিধে আছে! এর ক্ষেত্রে কি হবে?

- কি আর হবে? স্বাধীনতার ভিত্তি স্থাপনে দিনটির কথা নিশ্চয় আপনার মনে আছে।

■ তা আছে।

তারপর এলো ২১ শে ফেব্রুয়ারি। ২ এর সঙ্গে ১ যোগ করে যোগফল দিয়ে সঙখ্যাটিকে ভাগ করলে সাত পাওয়া যায়। অর্থাৎ এক্ষেত্রেও লাকি সেভেন! বলে কি!

- কিন্তু অঙ্গে রূপ শুধু দেখেছি, এখনও বলকানি বাকি।

তখন রামলোচন যোগ করে, বায়ান্নের কথা কইবেন তো। সে বুঝবার পারছি।

আমি বলি, তা তো বটেই, গেলো না কিছু প্রান, কিন্তু ভাষা তো পেয়েছি! লাকি হবে না মানে! পাচে দুইয়ে একেবারে সাক্ষাত সাত!

এতক্ষণে অরিন্দম চুপ ছিলো। এবার বিষাদে কহিলো, ও ভাই, এতো গেজিও না। তাহলে ১৪ ডিসেম্বরের মানে কি হয় বুঝিয়ে দাও।

বলা বাহুল্য যে ১৪ এর মধ্যে সাত ঘুমিয়ে আছে, ৭ গুনন ২। এই দিন দেশের মেধাবি মানুষেরাও চিরতরে ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন – ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো। অর্থাৎ পূর্ব গগনে সূর্য ওঠার কেবল ২ দিন বাকি, তার আগে ১৪ কে ২ ভাগ করে দিলো। দেশও ভাগ হয়ে গেলো সাতও পেলাম আবার, কিন্তু দেশ কি হারালো? এ ক্ষেত্রে কিন্তু খাটলো না সাত এই ‘লাকি’ মোজেজা।

তখন আর একজন তেড়ে উঠলো, বললো, এবার বলুন, কি হয় মানে ২৫ শে মার্চের?

আরে তাই তো! আমার তখন হতভম্ব হওয়া কেবল বাকি, হতবুদ্ধি হয়ে গেছি প্রায়।

কিন্তু তখন খোদায় সাহায্য করলেন কি না জানি না, অর্থাৎ সেলফ ডিফেন্সের জন্য মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো, ২৫ মার্চ আর চৌদ্দ ডিসেম্বর পাকিস্তানিদের জন্য ‘লাকি’ নম্বর নয় কি!

সেই থেকে আমি রাজাকার।

আমার ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৬ ডিসেম্বর, ১৪, ২৫ অর্থাৎ গাটে যা ছিলো, সব বৃথা হয়ে গেলো। সাত নিয়ে রঙ্গ করতে গিয়ে যে তকমা পেয়েছি তা আর ঘুচবার লয়! মনে পড়ে গেলো ডক্তর হুমায়ুন আজাদ সার (উনি প্রথাবিরোধি, কিন্তু উদ্ধৃত ধরনের পন্ডিত ছিলেন) - এর এক অমর উক্তি। তিনি বললেন, একজন রাজাকার চিরকালই রাজাকার, কিন্তু একজন মুক্তিযোদ্ধা চিরকাল মুক্তিযোদ্ধা নয়!

বাপস! উক্তি বটে!

আমার দাদার একটা মুদ্রাদোষ ছিলো। ভালো কিছু হলেই বা শুনলেই তিনি বলতেন, বাহ রে বেটা বা! রাজাকার তকমা নিয়ে আমি তড়পাই, আর বলি, বাহ রে পন্ডিত বাহ! কি শিখাইয়া গেইলে গা পন্ডিত!

মজলিসে পন্ডিত রামচরন উপস্থিত ছিলেন। আমাকে তিনি প্রশ্ন করেন, তাহলে ৪৭ এর সাতের বেপারে তোমার মতামত কি?

আমি বলি, ৪৭ আমার জন্য দুঃসহ যন্ত্রনার। বিষয়টা ভাঙনের। আমি জুড়তে পছন্দ করি, তাই ৪৭ এর আগে বাস করি।

এই কথা বলার পরে মনে মনে চমকে গেলাম, ভাবলাম এবার নিশ্চয় কেউ দালাল খেতাব দিয়ে দেবে! আমি অপেক্ষা করতে থাকি। নাহ, কাউকে কিছু বলতে দেখা গেলো না।

পন্ডিত রামচরন ৪৭ নিয়ে আর তেমন কিছু মন্তব্য করলেন না, শুধু বললেন, দেখো পাকিস্তান যে হলো তা কিন্তু বাঙালি মুসলমানদের ভোটাই। বর্তমান পাকিস্তানের কতজনই বা এ ভাগের পক্ষে ছিলো, বড়োজোর বিশ ভাগ!

৪৭ যে কেন এত কস্টের এবার মনে হয় বুঝেছেন আপনি। বাঙালি মুসলমানেরা পাকিস্তান চাইলো, কিন্তু হুজুগে না পড়ে যদি সত্যিকারে বিচার করে দেখতো, তবে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়? পাকিস্তানে মেহেদি হাসান, গুলাম আলি আর ওয়াসিম আকরাম এর মত দু-একজন ছাড়া আর কি আছে কইতে পারেন?

তা বলেছো বটে! রামচরন দেখি একটু খুশি।

বুঝতে পারছি না তাকে খুশি থাকতে দেবো, না একটু খোচাবো। কিন্তু না, তাকে খুচিয়ে আমার কি লাভ হবে ভেবে মনে মনে বলি, ২ তারিখে মাঠে নেমেছিলে মশাই, তারপর মাত্র চৌদ্দ দিন। কিন্তু কৃতজ্ঞে গদগদ হই পুরো নয়মাসের, অর্থাৎ কিনা ষোলো আনা। অবশ্য যুদ্ধের নয় মাসে আশ্রয় জুটেছিলো অনেক মানুষের, সে কথা ভুলিনি। বরঙ কৃতজ্ঞ হই। অল্পদাশঙ্কর একটা অদ্ভুত আশা করেছিলেন – আয়ারল্যান্ড হতে ছাড়পত্র ছাড়াই ইংল্যান্ড এসে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে অনেক মানুষ। ইনি আশা করেছিলেন স্বাধীন হলে বাংলাদেশ থেকেও বিনা ছাড়পত্রে ভারতে গিয়ে কাজ করতে পারবো আমরা! চমক জাগানিয়া বটে!

বললুম, দেখুন ১৪ আগস্ট ৪৭ পাকিস্তানকে কিস্যুই দেয়নি। অর্থাৎ ১৪ এর মধ্যে সাত-এর অস্তিত্ব আছে বৈকি, কিন্তু তাতে অগতি। ভারতের কথাও যদি বলি, দেশটা স্বাধীন হলো ১৫/০৮/৪৭ এ। সঙ্খ্যার অঙ্কগুলো যোগ করুন তো?

রামচরন দেরি করেন না। চোখ বন্ধ করে বলেন ২৫। তার মানে সাত!

- আচ্ছা বলুন তো এই সাত ভারতকেই বা কি দিয়েছে? দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি দরিদ্র লোকের বাস ভারতে। ষাট কোটি লোকে সকাল হলে বাইরে ‘ইয়ে’ করে। শুধু ফেস পাওডার লাগিয়ে বলিউড, আর উপরের সারির ক’জন ধনি, আর ক্রিকেট দেখিয়ে আসলে কি কোনও লাভ হইছে ওই সাধারণ মানুষদের?

দেখা গেলো সাত বাংলাদেশ, ভারত বা পাকিস্তান কাউকেই তিষ্ঠাতে দেয়নি। দেবে, সে সম্ভাবনাও দেখি না।

পন্ডিড রামচরন কেমন করে পন্ডিড হলেন, আর কোথাকার পন্ডিড অর্থাৎ কোন ঘরানার তার কিসুই জানি না। কিন্তু ধারণা করতে পারি যে, রামের চরনের স্পর্শ পেলে তিনি যদি প্রসন্ন হন তবে পান্ডিত্য দান করলেও করতে পারেন। রামের আবার সৌভাগ্যের শেষ নেই। রামের কপাল একেবারে খোলা। র (২৭ নং বেঞ্জনবর্ণ) আর ম (২৫ নং) এর বেলায় অঙ্কগুলোর যোগফল $(২+৭+২+৫)$ হলো গিয়ে ১৬, সেখান থেকে ৭ পাওয়া যায়। আবার $২৭ + ২৫ = ৫২ \Rightarrow ২ + ৫ = ৭!$

একে রামে কি আর তাহলে রক্ষা হয়? আর তখন সুগ্রীব যদি দোসর হয় তবে কি ঘটে আন্দাজ করা শক্ত নয়। অর্থাৎ কচুকাটা চলে। এমনই এক কচুকাটা চলেছিলো এ দেশেও – ৭১ এ।

কিন্তু কচুকাটা হলেও বিপরিতে হিত হলো আমাদেরই। অর্থাৎ স্বাধীনতা। যাক না ত্রিশ লক্ষের জান চুলোয়! দেশ তো পেয়েছি! অর্থাৎ ২১, ১৪, ১৬, ৫২, ২৫ আর ৭ – এই সঙ্খ্যাগুলোর মধ্যে যে ‘লাকি’ ৭ লুকোনো আছে তা শুধু বছর বছর কপালে পটি বেধে আমাদের শহিদ মিনারেই নিয়ে গেলো। সেখানে পদদলিত হওয়া ফুল, আর অডিটোরিয়ামের সভা-সেমিনার ছাড়া লাকি সেভেন থেকে কি পেয়েছি আমরা?

কোটি কোটি ক্ষুধার্তের মুখে খাবার তুলে দেয়া যেতো ফালতু সভা আর মিনারে চড়ানো ফুলের দামে। একাত্তরের অনেক গুলো সাত তখন সত্যিই মূল্য পেতো।

আর সাত সতেরো নয়, এখন শুধু সাতকে নিয়েই গল্পটা বাড়বে। লাকি নম্বর বলে কথা! আমাদের লাকির কথা-ই ধরুন। সে কি কম লাকি? লাকি শব্দটার মধ্যে দুর্বলভাবে হলেও সাতের অস্তিত্ব আছে। ল (২৩ নং) এবঙ ক (১ নং) কে বিচার করি আসুন। $২ * ৩ + ১ = ৭!$ একটু দুর্বল আর কি। কিন্তু গনজাগরন মঞ্চের লাকি দেখতে যতই দুর্বল হোক না কেন, আর রাজনিতির চন্ড বাবাজিরা যতই তাকে পেদিয়ে ঘুষু দেখাতে চাক না কেনো, লাকির রুদ্র কন্ঠ কিন্তু তত জোরেই শোনা গেলো। অর্থাৎ নতুন একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধারা ৭ এর বর প্রাপ্ত। নতুন একাত্তরের মধ্যে ৭ থাকলেও ১ এর জন্য কিছু লাক তো মিস করেছেই।

অমনি মঞ্চের কর্মি তেতে উঠলো। কেন, আমি ইচ্ছেমত গুন করে যোগ করে সাত বানাতে পারেন, আমরা পারিনা? দেখুন না ৭১ এর ৭ এর সঙ্গে ১ গুন করে, সাতই তো পাচ্ছি! আরে তাই তো! মাথা আছে ছেলেটার।

তারপরও সে ছাড়বার পাত্র নয়। মওকা পেলে কেউ কি আর ছেড়ে কথা কয়? সে যোগ করে, তাছাড়া সঙ্খ্যাটা তো সাত-এর দশকেই পড়েছে!

আরে গাধা, সাত এর দশক হয় না, বল সত্তরের দশক।

ওই হলো আর কি। সত্তরের মধ্যেও তো সাত আছে!

‘ওই হলো আর কি’ করেই তো আন্দোলনটা চালাচ্ছ বাবা! বটে বটে! চালিয়ে যাও।

এবার আর লাকি নয়, এখন LUCKY কে বিচার করবো।

L = ১২ নং আঙুরেজি বর্ন

U = ২১ নং

C = ৩ নং

K = ১১ নং

Y = ২৫ নং

অঙ্কগুলো যোগ করলে ১৮ পাই। $১৮ - ১ = ৭$ ।

অর্থাৎ গড (GOD) LUCKY কে-ই লাকি বানিয়ে দিয়েছেন। আর তিনি নিজেও বিচরন করছেন সাত- এ (GOD এর G ৭ নং আঙুরেজি বর্ন)

তখন শুরু হলো উতপাত। এক শ্রেনির ধার্মিকেরা প্রশ্ন তুলে বললো, এ বড়ো অবিচার। আমাদেরকে খুব খাটো করা হচ্ছে কিন্তু! খ্রিস্টানরা সাতকে লাকি নাম্বার বানিয়ে ১৩ কে বানিয়ে দিয়েছে আনলাকি!

কেন, কেন? ১৩ তে আবার কি ঘটলো?

তাদের যুক্তি, ১৩ সঙ্খ্যায় তাদের প্রোফেট মুহম্মদ (স) এর নামের প্রথম অক্ষর M এর অবস্থান। অর্থাৎ বিষয়টা UNLUCKY হয়ে গেলো যে! রক্তপাত হয় কি না হয় এই নিয়ে সেটা এখন দেখার বিষয়।

সে যা হোক, আসুন UNLUCKY এর সাঙ্খ্যমান বিচার করি এবার।

U = ২১

N = ১৪

L = ১২

U = ২১

C = ৩

K = ১১

Y = ২৫

সঙ্খ্যার অঙ্কগুলো যোগ করুন, দেখুন কি পান। তেমন কিছু নয়, তবে ২৬ পাওয়া যায়। হলো তো! ২৬ এর মধ্যে ১৩ আছে!

এবার তারা আরও তেতে উঠলো, কি সর্বনাশ! এত বড়ো চক্রান্ত!

কিন্তু হায়, হে ধার্মিকেরা, তোমরা বলতে পারলে না যে, ALLAH শব্দের A হলো নাম্বার ওয়ান! তারপর কেউ এও বলতে পারলো না, আয় ভাই ১ আর ৭ নিয়ে আমরা সবাই মিলে মিশে থাকি। আত্মবিশ্বাস ও বিশ্বাস দুই-ই খুইয়ে এখন অন্যের দোষ দিয়ে কি লাভ? কার এতো সময় আছে?

মুসলমানের আত্মবিশ্বাস নিয়ে একটা গল্প মনে পড়লো। আমি আমার খুব এক প্রিয়ভাজন চাচাতো ভাই এর কাছ থেকে শুনেছি এ গল্প।

এক ইমানদারকে ছোট্ট একটি সুচের পেছনের ছিদ্র দেখিয়ে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহ এই ছিদ্র দিয়ে গলে যেতে পারবেন?

ইমানদার চোখ তিস্ত করে সুচের ছিদ্রের দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে ভাবতে থাকেন। ভাবনা শেষ হলে, মাথা এ দিক ওদিক দুলিয়ে বলেন, না আ আ, তা কেমনে হইবে? তিনি বিশ্বজগতের মালিক, কাদির, তারপক্ষে ওইহান দিয়া যাওন... ! না না না, কি যে কয়েন না!

একই প্রশ্ন করা হলো এক গবেট পাগলকে। তার উত্তর, উনি তাও পারেন।

এখন আমার প্রশ্ন হলো, বেহেশতবাসি কে?

(ইমানদারে সত্যিই জানে আল্লাহ মহান, কিন্তু তার বিশ্বাস এতো নড়বড়ে, টলমল যে, যাকে সে ‘কাদির’ বলতে পারে, তার পক্ষে যে সব কিছুই সম্ভব, এই বিশ্বাস সে অন্তরে পোষন করতে পারেনি, অর্থাৎ এই শিক্ষা তার নেই।)

কথা হচ্ছিলো বড়োদিন নিয়ে। দুনিয়ায় দরিদ্র খ্রিস্টানের সঙ্খ্যা নেহাত কম। অন্তত দরিদ্র মুসলিমদের সঙ্খ্যার তুলনায়। কিন্তু বড়োদিন এলে খ্রিস্টান দুনিয়ায় ত্যাগের দরজা খুলে যায় – Sal e Sal e Sal e!!! যাও দোকানে, আর ইচ্ছেমত কেনো। আর ইচ্ছেমত উতসবে মেতে ওঠো। কেপিটালিজমে এইটুকুই হলো গিয়ে সাম্য। সবার একসঙ্গে সুন্দর করে বাচা, বা বাচতে চাওয়া। একটি দিনের জন্যে হলেও। তাহলে ২৫ ডিসেম্বর কেন লাকি হবে না? হতেই হবে।

এবার আসুন ঈদ শব্দের বিচার করি।

ঈ = ৪

দ = ১৮

অঙ্কগুলো আপনিই যোগ করুন। কি পেলেন?

উহু! এ দেখছি ১৩!

ইদের আগে বাজারের কথা লিখে শেষ করা যাবে না। দিন বা ধর্মের রজ্জুকে ধরতে বলা হলো পবিত্র গ্রন্থে - *ওয়া’ তাসিমু বি হাবলিল্লাহি জামিয়া*। কেউ কেউ সুযোগ পেয়ে প্রশ্ন করবে, আরে ভাই দিনের কি কোনও রজ্জু থাকে না কি? কিন্তু ধর্ম পালনকারীদের মধ্য থেকে যারা *ধম্মের ষাড়* হয় তারা মোটেও জানেনা যে, এই রজ্জুর অনেকগুলো নামের একটি নাম হলো ইউনিটি - একতা। আমরা মুসলিমরা একটি দিনের জন্যও সাম্যের সঙ্গে বাচতে শিখিনি। চোখ বন্ধ করে

একবার দরিদ্র মুসলিমের ইদের কথা স্মরণ করুন। আপনি দেখতে পাবেন কেমন করে
হতভাগ্য ১৩ মুসলিমদের আঠেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে।

//ঈদ শব্দটি ইদ না লিখে নিজের কোলে ঝোল টেনেছি। তা অন্ধ মিলায়ে দিতি হলি এরাম কন্তি হয়!!!!//